নিবন্ধনিচয়

ও

ভাষণাবলী

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

মহালয়া প্রকাশনী

৭০৩, লেক টাউন, কলিকাতা-৫৫

PIN—700055

প্রথম প্রকাশ
শ্রীশ্রীঝুলন পূর্ণিমা
২২শে শ্রাবণ ১৩৭৭,
বুধবার
৮ই আগষ্ট

প্রকাশক
শ্রীহীরালাল ধর
২৯ সি, যুগীপাড়া লেন
কলিকাতা-৬
(ফোন—৩৫-৮১০৩)

প্রাপ্তিস্থান
দাসগুপ্ত এণ্ড কোং
কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন :— ৩৪-৩৮৭৫

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
নিউ শঙ্কর প্রিন্টার্স
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬
(ফোন :—৫৫-৪১৪৩)

মূল্য—কুড়ি টাকা মাত্র

উৎসর্গ

বঙ্গের অন্তঃপুর সংস্কৃতির
স্নিগ্ধোজ্জ্বল রসবর্ণাঢ্য সারস্বত প্রতিভা
অম্বুজোপমা
শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর করকমলে
ও
স্বর্গত সুহৃদ্বর কালিদাস গুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশে
অর্পিত হইল।

নিবেদন

গ্রন্থভুক্ত নিবন্ধগুলির অধিকাংশই সমসাময়িক সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাষণগুলি ও নিবন্ধের বিষয়বস্তুগুলি বিভিন্ন সাহিত্য সভায়, সত্যেন্দ্র সাহিত্য সত্রে, বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের মেদিনীপুর, শিলিগুড়ি, কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, রামচন্দ্রপুর, পুরুলিয়া, রাজহাটী, আন্দামান প্রভৃতি স্থানে উপস্থিতমত সাময়িক, মাসিক বা বার্ষিক অধিবেশনে, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের জামসেদপুর শাখায়, রবিবাসরে, সাহিত্য তীর্থে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (মেদিনীপুর শাখায়), কবি পরিষদের তমলুক প্রভৃতি অধিবেশনে ও কলিকাতা সাহিত্যিকা প্রভৃতি অন্যান্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে ভাষণ হিসাবে পঠিত বা প্রদত্ত হয়েছে।

ইহাদের বিষয়বস্তু শিরোনামেই উল্লিখিত হয়েছে।

ভাষণের তারিখ কতকগুলি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে কতক-গুলি হয় নাই, - সন্ধানের সময় অভাবে।

যশোর শিলাইদহ, আন্দামান, খড়্গপুর, কুচবিহার লক্ষ্ণৌ, বার্ণপুর, ব্যারাকপুর, বালি, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, কলানবগ্রাম, (বর্ধমান), ডানকুনি, মেমারি, চন্দননগর, হাওড়া, গরলগাছা, বিরাটী, গোবরডাঙা, দামুন্যা, শান্তিপুর, কল্যাণী, সিউড়ি, দক্ষিণেশ্বর, রহড়া, আদ্যাপীঠ, শ্রীগুরু সঙ্ঘ, নগেন্দ্র মঠ, মহামিলন মঠ, তারামঠ প্রভৃতি এবং ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট, রিপন কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, রামমোহন লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, প্রতাপ মেমোরিয়াল ও নেতাজী হল বিভিন্ন Lodge ও Rotary Club প্রভৃতি স্থানের ভাষণগুলি ইহাতে সংকলন করা সম্ভব হইল না। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় বিষয়গুলি মুদ্রণে কালানুক্রমিক পারম্পর্য বা কোন সুনির্বাচিত সন্নিবেশ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

স্নেহাস্পদ ডাঃ শ্রীমান্ কিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত ও শ্রীমান্ সুশান্ত কুমার পাল প্রুফ সংশোধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করা সত্ত্বেও বর্ণাশুদ্ধি কিছু রহিয়া গেল। তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিনীত

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কবিতার ধর্ম ও মর্ম	১
বঙ্গীয় কবি পরিষদের তমলুক অধিবেশন	১৫
স্বাধীনতায় অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ	২৪
বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন রামচন্দ্রপুর অধিবেশন	৪২
বর্তমান সঙ্কটে সাহিত্যিকের দায়িত্ব	৫২
নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন জামসেদপুর শাখায় মূল সভাপতির ভাষণ	৬০
সমাজের পটভূমিতে বিদ্যাসাগর, গুরুদাস ও আশুতোষ	৭০
ভারতের সংস্কৃতি	৭৪
ঘরের কথা	৯১
প্রেমের স্বরূপ ও রূপ	১০৬
কবিতিলক অক্ষয় বড়াল	১২৪
মানব জমি	১৩৭
শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণে শাস্ত্র এবং যুক্তি	১৪১
দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত	১৫৬
এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্মিলন	১৬২
সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা	১৮১
উভয়লিঙ্গ নির্বাণ	১৯৩
বেদান্তের বৈষ্ণব ভাষ্য এবং শাক্ত বৈষ্ণব ভাবধারার সমন্বয় (রাজহাটী ভাষণ)	২০৯
কবি করুণানিধান	২২৪
সাহিত্যে আপদ্ধর্ম ও লেখকের দায়িত্ব	২৩৪
শিক্ষার সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ	২৪২
গীতায় গৃহধর্ম ও ভক্তিসাধনা	২৪৫
আদর্শ ভক্তের মহিমা	২৪৯
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	২৫৪
রবীন্দ্রপ্রতিভার দিগ্‌দর্শন	২৬০
কান্তকবি রজনীকান্ত সেন	২৮১
“বন্দে মাতরম্” ও বঙ্কিমচন্দ্র	২৯৫
রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের ক্রমবিকাশ	৩০৩
বৈষ্ণব ভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথ	৩১৪
মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ	৩৪০
মহাকবি উইলিয়াম সেক্সপীয়ার	৩৪২
বিগত ২৫ বৎসরে সামাজিক বিবর্তন	৩৫৩
নটরাজ শিশিরকুমার	৩৬৬

কবিতার ধর্ম ও মর্ম

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান বাতাবরণে কেউ কেউ বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা প্রকাশ করছেন। বলছেন এটা বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ। ভাবাবেগপূর্ণ সুকুমার কাব্যসাহিত্যের যুগ নাকি শেষ হয়ে গেছে। উত্তরে আমরা বলি সৎকাব্যের যুগ চিরদিন আছে এবং থাকবে।

সৎকাব্যের সার্থকতা—সাহিত্য-রসিকেরা চিরদিন বলে আসছেন—

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ॥

এই কাব্যরসাস্বাদ এবং সজ্জনসঙ্গম সাহিত্যের বৈঠকে একই কালে এবং একই ক্ষেত্রে সম্ভব এবং সার্থক হয়। মনীষীরা বলেন—

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্॥

ইহকাল পরকালে যা কিছু স্পৃহণীয়, দুঃখলাঘব ও সুখবৃদ্ধির জন্য যে মানসিক সমতা ও শান্তি প্রয়োজনীয়, তা' অবশ্যই সৎকাব্যের সেবাদ্বারা লাভ করা যায়। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ কবি কোলরিজের স্বীকারোক্তি অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন :—

Poetry has been to me its exceeding great reward. It has soothed my afflictions—it has endeared my solitude and it has given me the habit of wishing to discover the good and the beautiful in all that meets and surrounds me."

অর্থাৎ আমার কবিতা আমার নিজের কাছেই যেন এক পরম পারিতোষিকের মত হয়েছে। সে আমার দুঃখের ক্ষতে প্রলেপ দিয়েছে,—আমার নিঃসঙ্গ অবকাশকে প্রিয় করেছে এবং আমাকে এক নূতন অভ্যাস দান করেছে যার ফলে, আমার পারিপার্শ্বিক সব কিছুর মধ্যে, শুদ্ধ শুচি এবং সুন্দরকে অনুসন্ধান করবার জন্য আমার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তি জন্মেছে।

কুকবিত্ব :—অক্ষম পাচকেরা ধয়া-পোড়া-নুনে জরা'—ব্যঞ্জন পাক ক'রে যেমন যজ্ঞ নষ্ট করেন, এবং ক্ষুৎ-পিপাসাতুর অতিথিগণের অন্তর বাহির এককালে বিষিয়ে তোলেন, অসৎকাব্যস্রষ্টা অক্ষম কুকবিগণও তেমনি কাব্যরসপিপাসুদের অন্তর বিষিয়ে তোলেন এবং কাব্যসাহিত্যের প্রতি একান্ত অনাস্থা ও বিরক্তি উৎপাদন করেন। তাই আচার্য ভামহ বলেন :—

নাকবিত্বমধর্মায় ব্যাধয়ে দণ্ডনায় বা।
কুকবিত্বং পুনর্লোকে মৃতিমাহুর্মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ কবিত্ব না থাকলে অপরাধ নেই, কিন্তু কুকুবিত্ব মৃত্যুর মতই ভয়াবহ!

সমন্বয়ের যুগ—প্রকৃতপক্ষে এ যুগ সমন্বয়ের যুগ। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প এবং তৌর্যত্রিক বিদ্যা প্রভৃতি যাতে সত্য-শিব-সুন্দরের স্বাদ এবং সন্ধান আছে, তাই এ যুগের অনুশীলন এবং গবেষণার যোগ্য বিষয়।

মধ্যপন্থা—একান্ত ভাবালুতাময় আবেগ, কৃত্রিম যন্ত্রোদ্গীর্ণ কবিতার গতানুগতিকতা, কিম্বা নিতান্ত শুষ্ক নঞর্থক নেতিবিচার দ্বারা কবিরা এযুগে জনপ্রিয় হতে পারবেন না। তাই মধ্যপন্থা অনুসরণ করা এবং বর্তমান যুগের সুখদুঃখের সংবেদনাকে রুচিকর রূপ দান ক'রে পাঠকের চিত্তে রসসঞ্চার করাই হবে সুখকর এবং শুভঙ্কর। কবিপ্রতিভা সুলভ নয়, তাই প্রাচীনেরা বলেন—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥

কবির যশ ও জনপ্রিয়তায় লুব্ধ হয়ে অথচ তাঁর দুর্লভ প্রতিভার অধিকারে বঞ্চিত হয়ে, ঢালহীন তলোয়ারবিহীন একশ্রেণীর নিধিরাম সর্দার, সাহিত্যের রণক্ষেত্রে সখের সিপাহীরূপে অবতীর্ণ হয়ে Don Quixote-এর মত হাস্যকর ভূমিকায় অভিনয় কচ্ছেন। ভাব ভাষা এবং প্রেরণাহীন রঙবেরঙের রচনা প্রকাশ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাব্যসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে যা প্রদর্শিত হচ্ছে তা কবিতা নয় কাব্যের সঙ্!

কাব্যের উপাদান—কাব্যের বিষয়বস্তু অসীম অনন্ত। জীবনে এবং জগতে যা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর কায়মনোবাক্যের বিষয় তা সবই কবিতার উপাদান হতে পারে। এমন কোন শাস্ত্র, শিক্ষা, বিদ্যা বা কলা নেই যা

কাব্যের বিষয়ীভূত হতে না পারে। তাই কবির উপর ন্যস্ত যে ভার তাকে 'মহাভার' বলা হয়েছে :—

> ন তচ্ছাস্ত্রং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন তৎকলা।
> জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহোভারো মহান্ কবেঃ ॥

কাব্যের শরীর ও আত্মা :—'তস্য শব্দার্থৌ শরীরম্',—শব্দ এবং অর্থ কাব্যের শরীর এবং 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'— রসাত্মক বাক্যই কাব্যের প্রাণ। ছন্দ ভাষা অলঙ্কার বা নানাবিধ আঙ্গিকের যদি কিছু অল্পতা বা অভাব থাকে, তাহলেও তা কবিতা হতে পারে, শুধু ততটুকু থাকলেই যথেষ্ট হবে,—যার দ্বারা পাঠকের মনে রসের আস্বাদ দেওয়া যায়, অন্তরে মোহসৃষ্টি করা যায়।

কবিতায় 'ভাব' বস্তুকে 'অবিনাভাব' (sine qua non) সম্বন্ধে আবদ্ধ করা হয়েছে। ভাবের ঘরে ফাঁকি থাকা চলবে না। কাব্যসম্পদের বহু অভাব সত্ত্বেও কবিতা কাব্যসংজ্ঞা লাভ করতে পারে—যদি থাকে তার 'ভাব হতে রূপে'—যাওয়া আসা করবার মত রসের রসদ, ভাবের সম্পদ এবং কল্পনার গতিবেগবৈভব। আলঙ্কারিক বলেন :—

> ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন রসো ভাববর্জিতঃ
> পরস্পরকৃতাসিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ ॥

কাব্যের দোষ গুণ—খুব সাধারণ কথায় বলা যায় "রসাপকর্ষতা হি দোষাঃ" অর্থাৎ কাব্যের রসগ্রহণে যা বিঘ্ন ঘটায় তাই দোষ। রসের চমৎকারিত্বই কাব্যের গুণ। "রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।" রসের চমৎকারিত্বই সহৃদয় পাঠকের চিত্তে আনন্দসঞ্চার করে।

তিক্ততা কটুতা তুচ্ছতা বর্বরতা বাগাড়ম্বরপূর্ণতা অশ্লীলতা সৎকাব্যে যথাসম্ভব বর্জনীয়। কারণ "জঘন্য-গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ"।

আধুনিক কাব্যে রুচিবিকার—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"কাব্যের একটা গুণ যে কবির রচনাশক্তি পাঠকের মনকে টেনে এনে লেখকের সঙ্গে একাত্ম করে দেয়, তাকে তদ্ভাবে ভাবিত করে তোলে। আধুনিক কবিতা এ দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে।" উপাদেয় বিষয়বস্তুকেও হেয় রূপে বর্ণনা করা বর্ত্তমান যুগের রুচিবিকারের পরিচয় বহন কচ্ছে।

কাব্যের প্রসাদ গুণ - কবির কাব্য সকলের অন্তরে প্রবেশ করবার জন্য। "বোবায় কয় কালায় শোনে, অন্যে কি তার মর্ম জানে?" কবিতা এরূপ হেঁয়ালি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—"কান থেকে প্রাণে পৌঁছবার সহজ রাস্তাটা খোঁজাই কবিতার সব চেয়ে বড় সাধনা। সেই সাধনা যদি নিজের লক্ষ্য ভুলে সম্পূর্ণ উল্টো রাস্তাতেই চলে, বোঝাতে যাওয়ার চেয়ে না-বোঝানই যদি তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, পাঠকের মনে প্রবেশের পথ না হয়ে ভাষা যদি নিষেধের পাঁচিল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, তাহলে কবিতার কোন সার্থকতাই আছে কিনা সন্দেহ।"

"অতীতের অনুকরণ ও তাই যেমন নিন্দনীয় আধুনিকতার নামে যে কোন হুজুগের ঢেউই তেমনি প্রগতির সামিল নয়।"

"নূতনত্বের নামে যে কোন বাতুলতাই এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণ নয়।"

"সব কিছুর মতই সাহিত্যেও হুজুগের ঢেউ আসে। আমাদের কাব্যে বিদেশ থেকে সেই ঢেউ কিছু কাল আগে এসেছিল। যা সত্যকার সাহিত্য তা সর্বকালীন সর্বজনীন। সাময়িক বিকার বিশৃঙ্খলা সবদেশের সাহিত্যেই মাঝে মাঝে দেখা দেয়। বিদেশের সুস্থ প্রেরণাকে বাদ দিয়ে বিকারের ছোঁয়াচ টুকুই যখন গ্রহণ করি, তখন সেটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

(আমেদাবাদে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কাব্যশাখায় সভাপতির প্রদত্ত অভিভাষণ—'সংহতি'—১৩৬৪ পৃঃ ৫২৮ দ্রষ্টব্য)

কাব্যসাহিত্যের সার্বভৌমতাঃ—কাব্য সাহিত্য অন্তরকে প্রসারিত করে, মনের উন্নতি বিধান করে এবং জাতীয়তাবাদের পরিধি তথা ভৌগোলিক চতুঃসীমা কিছুই স্বীকার করে না।

সাহিত্য সকল দেশের, সকল জাতির মধ্যে প্রীতির রাখী বন্ধন করে। রসপিপাসু নর নারীর মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের দ্বারা আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন করে, তাই কবিগুরু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।" সাহিত্য নিষ্প্রাকার এবং নিষ্প্রত্যূহ—বিভিন্ন দেশের সামাজিক গোঁড়ামির অচলায়তনকে সচলায়তন এবং অবাধগমন করে তোলে। "নিরঙ্কুশা হি কবয়:" "এবং মনোরথানামগতির্নি বিদ্যতে"—তাই কবিগণ সর্বত্র অবাধে বিচরণ করে থাকেন—এবং বলেন 'সব ঠাঁই মোর ঘরে আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া, ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয় তারে আমি লব চিনিয়া,—সমগ্রবিশ্বে

কবিগুরুর শতবার্ষিক এবং সেক্সপীয়রের তিনশত বার্ষিক স্মরণমহোৎসবই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

অনুভূতি—অনুমিতি ও অনুকৃতি ঃ—যা আমরা নিজেরা অনুভব করি তাই আমাদের অনুভূতি। যে সমস্ত ভাব আমরা অপরের মাধ্যমে সাংবাদিকের সংবাদে, অভিনেতার অভিনয়ে অথবা সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টির প্রসাদরূপে পাই, তাই হয় আমাদের অনুমিতি। কোন বাস্তব ঘটনা বা পূর্ব-সূরীদের সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি বা শিল্পকলা দেখে বা শুনে আমরা তার যে অনুকরণ করি তাই অনুকৃতি। শিল্পের মধ্যে অনুকরণ প্রায়ই কিছু না কিছু থাকে, কারণ মূলতঃ শিল্পমাত্রই প্রকৃতির অনুকরণ। যাকে আমরা প্রশংসা করি ভালবাসি যার দ্বারা আমরা মুগ্ধ হই তার সুর ছন্দ ভাষা শৈলী এমনকি পরিচ্ছদ এবং প্রসাধনপারিপাট্যও আমরা অনেক সময় জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে অনুকরণ করি। ইহা একদিকে যেমন স্রষ্টার শক্তিমত্তার পরিচয় অন্যদিকে আমাদের ভক্তিমত্তা ও অনুকরণপ্রিয়তার নিদর্শন।

কবির সৃজনী-প্রতিভা ঃ—আলঙ্কারিকেরা কবিকে স্রষ্টা বা প্রজাপতি বলেছেন। তাঁর প্রতিভার কল্পনাশক্তি (imagination) কে 'নবনবোন্মেষশালিনী' বলেছেন। এই প্রতিভা দ্বিবিধা,—কারয়িত্রী এবং ভাবয়িত্রী। কারয়িত্রী প্রতিভা সৃজনী শক্তি দান করে এবং তা তাঁর স্বকীয় কাব্যসৃষ্টিতে প্রেরণা দান করে।

ভাবয়িত্রী প্রতিভা সহৃদয় পাঠকপাঠিকাকে তদ্ভাবে ভাবিত করে।

পাঠকের হৃদয়ে কবি তাঁর নিজস্ব ভাব প্রতিভাসিত করেন বলেই এই শক্তিকে 'প্রতিভা' বলা হয়। ধ্বনির উত্তরে যেমন প্রতিধ্বনি হয় তেমনি ভাবের উত্তরে পাঠকের অন্তরে এক প্রতিফলিত বা প্রতিধ্বনিত ভাব সঞ্চারিত হয় (echo phenomenon)

কবি ইচ্ছাময়, তিনি ইচ্ছামাত্রে নূতন কল্পনাজগৎ বা ভাবজগৎ সৃষ্টি করে নেন। আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে বলেছেন :—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।

যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে॥ অর্থাৎ অপার কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র স্রষ্টা। তাঁর যেমন অভিরুচি তাঁর কাব্যজগৎ ঠিক সেই মতই পরিবর্তিত হয়।

সেক্সপীয়রের ভাষায় :—

"As imagination bodies forth,
The forms of things unknown,—the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name."

কবি ঈক্ষণমাত্রেই 'সব পেয়েছির দেশ' বা 'নাই কোথাও এর দেশ' সৃষ্টি করেন,—অন্ধকারের মধ্যে যক্ষপুরীর জালাবরণে স্বর্ণলিপ্সা ও অর্থগৃধ্নুতার মূর্তিমান প্রতীকরূপে 'রাজা'কে মঞ্চস্থ করেন। কবির সপ্রতিভ কল্পনাই তাঁর আলাদীনের প্রদীপ। শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ের অনুধ্যানে, বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে, তাকে একটু ঘর্ষণ করলেই নূতন নূতন জগৎ সৃষ্টি হয়।

প্রতিভা বা প্রজ্ঞাই কবির তৃতীয় চক্ষু, সরস্বতী কণ্ঠাভরণের টীকায় রত্নেশ্বর বলেন—

রসানুগুণশব্দার্থচিন্তাস্তিমিতচেতসঃ
ক্ষণং স্বরূপস্পর্শোত্থা প্রজ্ঞৈব প্রতিভা কবেঃ।
সা হি চক্ষুর্ভগবতস্তৃতীয়মিতি গীয়তে
যেন সাক্ষাৎ করোত্যেষ ভাবাংস্ত্রৈকাল্যবর্তিনঃ॥

রসসম্পৃটিত শব্দার্থের চিন্তায় নিহিতচিত্ত কবির অন্তরে বস্তুস্বরূপের স্পর্শজাত যে বিশেষ চেতনা বা প্রজ্ঞার বিকাশ হয় তাহাই কবিপ্রতিভা,—ইহা যেন শিবের তৃতীয় নেত্র বা অর্জুনের দিব্যচক্ষু। ইহার সাহায্যেই তিনি ত্রিকালবর্তী ভাব সমূহ ঋষির মত প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

তাই Apolloর মুখে Shelley বলতে পেরেছেন :—"I am the eye with which the universe beholds itself and knows itself divine."

দর্শনের ঋষি এবং সাহিত্যের কবি উভয়েই—সত্য-শিব-সুন্দরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধে বাঁধা। ঋষি বলেছেন 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—কবি গেয়েছেন, 'আনন্দলোকে দুয়ার খুলেছে আকাশ পুলকময়। জয় ভূলোকের জয় দ্যুলোকের জয় আলোকের জয়'।—'আনন্দলোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজো সত্যসুন্দর'। 'আলোয় আলোময় করে হে এলে আলোর আলো,—আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো'।

অথবা 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর,—ধন্য হল অঙ্গ মম পুণ্য হল অন্তর'।

রসবস্তু কাব্যে ও দর্শনে—আলঙ্কারিক বলেন যে শুধু 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' নহে সে-রসের আস্বাদন 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যোব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ ॥

সাহিত্যদর্পণ ৩।৩৪

অর্থাৎ সহৃদয় পাঠক (বা নাট্যদর্শক) নিজের দেহ বা আত্মার মত অভিন্নভাবে যে রস আস্বাদন করেন,—সাত্ত্বিকভাবের উদ্রেক হয় বলে সেই রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দময়, চিন্ময়, বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য ও ব্রহ্মাস্বাদের সহিতই তুলনীয়।

বৈদান্তিকও তাই বলেন, 'রসোবৈ সঃ,'—'স এব রসানাং রসতমঃ' 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা স্বস্থীভবতি নন্দীভবত্যমৃতীভবতি' (ছান্দোগ্যশ্রুতি) সুরেশ্বরাচার্য কৃত দীপিকায় পাই—

"রসঃসারোঽমৃতং ব্রহ্ম আনন্দোহ্লাদ উচ্যতে
নিঃসারং তেন সারেণ সারবল্লক্ষ্যতে জগৎ।"

অর্থাৎ জগৎটা যেন নিঃসার আখের ছিবড়ের মত, আর মধুব্রহ্মই সেই নিঃসার জগতের মধ্যে রস সঞ্চার করে আখের মতই তাকে রসিয়ে তুলেছেন।

মধু ব্রহ্ম—তাই মধুমতীঋকে শ্রুতি বলেন 'মধুক্ষরতি তদ্‌ব্রহ্ম,—মধুক্ষরতি যদ্ ধ্রুবম্,'—'মধু বাতা ঋতায়তে'—বায়ুর দ্বারা মধু হিল্লোলিত তরঙ্গায়িত হচ্ছে—পৃথিবীর ধূলি পর্যন্ত মধুময় হয়ে উঠেছে,—'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'।

কাব্যের মধু—এই মধু, এই রস, এই আনন্দ স্বরূপকে কাব্যসাহিত্যের আলঙ্কারিক তার সৌন্দর্য মাধুর্যের একটু আভাস মাত্র দিয়ে, বর্ণনা করতে হার মেনে, বলেছেন 'অনির্বচনীয়'। দেবর্ষি নারদ বলেছেন 'মূকাস্বাদনবৎ'।

ধ্বন্যালোকে বলা হয়েছে—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীযু মহাকবীনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥

অর্থাৎ মহাকবিদের বাণীতে তার আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করেও এক নিগূঢ় বিচিত্র অর্থের দ্যোতনা থাকে, যেমন নারী-সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে

দেখা যায় যে শরীরের বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য অতিক্রম করে তার গঠনসৌষ্ঠবের সমষ্টির এক অনির্বচনীয় লাবণ্য প্রকাশ পায়। মেয়েলি ভাষায় মেয়েটি রূপসী না হলেও, এই লাবণ্য থাকলে, মেয়েরা তার 'আলগা ছিরি'র (শ্রীর) প্রশংসা করেন। যখন দৈহিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্য থাকে এবং সে সৌন্দর্যকেও যখন সে লাবণ্য অতিক্রম করে,—তখন বৈষ্ণব কবি তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,—

"কিবা ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরছা পায়।"

তখন সত্যই সে লাবণ্য তরঙ্গ তুলে অবনীবক্ষ প্লাবিত করে। নইলে শুধু 'আলগাছিরি কাজলা আঁখি মেয়ে' হয়েই সে দ্রষ্টার ক্ষণিক মনোহরণ করে মাত্র। কবি হয়তো তাকে স্মরণ করেন—'কালো? তা সে যতই কালো হোক,—দেখেছি তার কালো হরিণচোখ।' পাঠকের হয়তো সেক্সপীয়রের সনেটে বর্ণিত 'dark lady'র কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। যদিও তার রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয়নি।

কাব্যের প্রাণ—আলঙ্কারিক বলেন—"বাগ্বৈদগ্ধ্য প্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্।' কাব্যে শব্দ, বাক্য এবং অর্থের প্রাধান্য স্বীকার করলেও—রসই কাব্যের প্রাণ।

এই রসের কথা পূর্বেই কিছু বলেছি। কবি বলেছেন এই রস যেন 'ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুক্তবেণী মন্দির সঙ্গীত'। চিত্রশিল্পীর হাতে এই 'রস' অপরূপ ছায়া সুষমার খেলায় বিচিত্র ভাবের দ্যোতনা করে। সে যেন রূপ, অরূপ এবং অপরূপের এক মিলনমেলা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'অরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করতে গেলে সেই বর্ণনার বাচাবাচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তা রক্ষা করতে হবে'।

যে কাব্যে অনির্বচনীয়তা যত বেশী থাকে সেই কবিতা তত উচ্চ পর্যায়ের, তত সার্থক এবং রসোত্তীর্ণ।

সুরশিল্পীর কাছে এই রস harmony,—সে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের একতান-সঙ্গতি রক্ষা করে এবং নাদব্রহ্মের সন্ধান দেয়।

রসোত্তীর্ণ কাব্য :—কবির কল্পনা, 'স্বপনে স্বপনে দেয় বিয়ে'—সে বিবাহ রসলোকে বহন করে নিয়ে যায় আমাদের মানস অনুভূতিকে। রবীন্দ্রনাথ তাই সংক্ষেপে বলেছেন তাঁর গানের একটীমাত্র পালা, সেটী 'সীমার সঙ্গে অসীমের'

মিলনমেলা। 'অণোরণীয়ান্'কে সে 'মহতোমহীয়ানে'র সঙ্গে সম্মিলিত ক'রে ভূমার আস্বাদ দান করে। তিনি বলেছেন তাঁর 'গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে, দিনে দিনে সৃষ্টির প্রথম রহস্য 'আলোকের প্রকাশ', আর সৃষ্টির শেষ রহস্য 'ভালবাসার অমৃত'।

সুন্দরের এই অপরূপ অনির্বচনীয় রস কালাবচ্ছিন্ন নয়—অতন্দ্রপ্রতিষ্ঠ এবং শাশ্বত। তাই কবি Keats বলেছেন :—

A thing of beauty is a joy for ever
Its loveliness increases, it will never
Pass into nothingness"

কবি যেন বুদ্ধিজীবী মহাজনের মত। তাঁর সৃষ্টির চমৎকারিত্ব চিরদিন চক্রবৃদ্ধি সুদে আসলকে বাড়িয়ে যেতেই থাকে, ফলে অধমর্ণ ইতিহাস কোনদিনই তাঁর ঋণ শোধ করতে পারে না।

কবি সত্যেন্দ্র দত্ত ফরাসী কবি পল ভার্লেঁকে অনুবাদ করেছেন,—

কবিতা সে হবে শুধু সঙ্গীতে সঙ্কেতে উদ্বোধন
আভাসের ভাষাখানি প্রভাতের মন্থিম বাতাস
দু-পাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ কমল অগণন
বাকী যাহা, সে কেবল পণ্ডশ্রম পাণ্ডিত্যপ্রয়াস।

সার কথা এই যে—"তয়া কবিতয়া কিংবা, তয়া বনিতয়া তথা,—পদবিন্যাসমাত্রেণ যয়া নাপহৃতং মনঃ ?"—সে কবিতার মাধুরীই বা কি, আর সে রূপসীর রূপই বা কি, যে পদবিন্যাসমাত্রেই মনকে অপহরণ করে না।

কবিতার ভাষা—কবির ভাষায় অভিধার চেয়ে ব্যঞ্জনাই বেশী প্রভাব প্রকাশ করে। ধ্বনি এবং দ্যোতনা (suggestiveness)-ই তার প্রধান সম্পদ্। কবির কাব্যের ভাষায়,—তাঁর জীবনরহস্যের নানান্ ভাষ্য ও টীকায় ('Criticism of life—Matthew Arnold) তাঁর আবেগময় পরিকল্পনার কিছু আতিশয্য থাকে (in which emotional and imaginative elements predominate)—কবি সেই বিচিত্র বস্তুকে তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশানো—স্বকীয় পাকপ্রণালীতে ভিয়ান করে উপাদেয় মিষ্টান্নরূপে পাঠক পাঠিকাদের পরিবেশন করেন। ভাষার ইঙ্গিত এবং সঙ্কেত, ব্যঞ্জনা ও

দ্যোতনা ব্যতীত শুধু ছন্দ মিল উপমা অনুপ্রাস দিয়ে শুধু ধ্বনিময় ঝঙ্কারময় বাক্‌চাতুরী দিয়ে যা হয় তা কবিতা নয়, সে শুধু 'পণ্ডশ্রম পাণ্ডিত্য-প্রয়াস' কথার কারসাজি বা jugglery of words!

আধুনিক কবিতা ও তার 'সন্ধ্যাভাষা :—

সাড়ম্বরে প্রচার কার্য চলছে যাতে আধুনিক কবিকে দীর্ঘ ছাড়পত্র দেওয়া হয়, যাতে তাঁর ব্যাসকূটের হেঁয়ালির মত বক্তব্য তিনি যে কোন অপ্রচলিত শব্দ সংযোজনার দ্বারা ইচ্ছামত প্রকাশ করবার লাইসেন্স বা পাশ পান। এর জন্য এই হেঁয়ালির ভাষাকে 'সন্ধ্যা-ভাষা' নামে নূতন সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে তার যে 'গোরাচাঁদ' রূপ দেখছি, তাতে তার ভাবী 'কালাচাঁদ' রূপের কথা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি। তমসো মা জ্যোতির্গময়—বা অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার প্রার্থনা মানুষের সহজাত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করবার প্রবৃত্তি ব্যাধিগ্রস্ত মনেরই পরিচায়ক এবং তা আত্মঘাতী অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণের পরিণাম যে "অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ"—তাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পাঠকেরা চিরদিনই চান 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ'। লেখকের লেখার স্বাধীনতা পাঠকের বোধপরতন্ত্রতাকে সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে পারে না,—কারণ তাহলে সেরূপ লেখা হবে acrobatic feats of words—অর্থাৎ অর্থহীন কথার সার্কাস্ বাজী।

আধুনিক কবিতার উৎস য়ুরোপীয় অনুপ্রেরণা প্রসূত বলেই তা হেয় বা বর্জনীয় নয়। কবিগুরুর স্বপ্নোত্থিত গিরি-নির্ঝরের মত সে তার পাষাণ কারা ভগ্ন করে আপনার পথ আপনি কেটে নিক্। তার আপন গতিবেগে আপনার পথ গভীর এবং প্রশস্ত করে নিতে পারলে তা অবশ্যই প্রশংসা অর্জন করবে। কিন্তু তার পাথেয় হতে হবে তার স্বীয় প্রাণশক্তি নইলে শুধু মাছি-মারা-কেরাণীর মত, দাগবুলানো অন্ধ অনুকরণের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হবে সুদূর পরাহত। কয়েকটি সাধারণ অভিযোগ এ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করছি হিতাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হয়ে। প্রথম অভিযোগ 'একঘেয়েমি',—প্রচলিত রীতির প্রতি অহেতুক অবজ্ঞা এবং উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতার ফলে যে কোনো আধুনিক কবির কবিতার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করলে তা অপর যে কোনো আধুনিক কবিতার সঙ্গে প্রায় বেমালুম মিলে যায়। দ্বিতীয়,—উদাত্তকণ্ঠে

আবৃত্তির অনুপযোগিতা। তৃতীয়, কোনো দীর্ঘ বিষয়বস্তু বর্ণনার উপযোগী আখ্যানশক্তির অভাব। চতুর্থ,—অর্থ প্রতিপত্তির অক্ষমতা। কৃতবিদ্য পাঠকের দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা সমস্যাকণ্টকিত বিচার বিতর্ক সবই বুঝবেন,—কেবল ওই 'কবিতা'র কোনো গঠন বা অবয়ব (form) না থাকলেও শুধু কবিতার শিরোনামা দেখে তাকে কবিতা বলবেন এবং তার অর্থকে 'অবাঙ্‌মনস গোচর' ব'লে শুধু ক্ষমা নয় সম্মান করবেন এরূপ প্রশ্রয়ের কামনা কখনই যুক্তিসহ হতে পারে না। পঞ্চম,—উপমার অদ্ভুতত্ব—যেমন 'চীনেবাদামের খোসার মত নির্মল বাতাস'! এ বিষয়ে শুধু দিগ্‌দর্শন মাত্রই করলাম কবি ও কাব্যানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য।

ছন্দের কথা ঃ—বাঁধাধরা অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা স্তবক-নিবদ্ধ ছন্দ ব্যতিরেকেও কবিতা হতে পারে,—যদি রচনাশৈলীতে ভারসাম্য, সামঞ্জস্য ও সুষীমতা রক্ষিত হয়। কারণ গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, বাচনের সাবলীলভঙ্গী ও চলার গতিভঙ্গী বা ছন্দ তার অপরিহার্য সম্পদ। ছন্দ বলতে —তার উদার ব্যাপক অর্থে আমরা বুঝি একপ্রকার সুনির্বাচিত সুপরিমিত পদ-বিন্যাসের ললিতকলা যার প্রভাবে গদ্যে পদ্যে এবং সঙ্গীতে একটী সুমধুর শ্রুতিসুখকর নৃত্যভঙ্গিমা সঞ্চারিত হয়। যার ফলে তার চলার ভঙ্গীতে লাগে তটিনীর হিল্লোল অথবা হিন্দোলের দোদুলদোলা।

ছন্দোবদ্ধ এবং ছন্দোবর্জিত কবিতার মধ্যে মনোহারিত্বের তারতম্য বোধ করার সহজ উপায়,—যে কোন উৎকৃষ্ট ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে গদ্যে রূপান্তরিত (prose order) করে দেখা ; যেহেতু সেইভাবে দেখলেই তখন তার ছন্দোহীনতার দুর্গতি ও দারিদ্র্য স্পষ্টই বোঝা যাবে এবং ছন্দের মূল্যও নিঃসংশয়ে প্রমাণ হবে।

কাব্য ও অলঙ্কার ঃ—পূর্বেই বলা হয়েছে কাব্য একটী অখণ্ড সৃষ্টি। ব্রহ্মের মতই 'সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্' এবং 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'—সুতরাং কাব্যদেহে অলঙ্কার, গুণ, রীতি, বৃত্তি প্রভৃতির বিভাগ প্রদর্শন নিতান্তই ব্যবহারিক এবং শিক্ষার্থীদের বোধসৌকর্যের জন্যই এর উপযোগিতা। তাই কাব্য পৃথক, এবং তার অলঙ্কার পৃথক, এরূপ কল্পনা যুক্তিসহ নহে। কাব্যে অলঙ্কারযোগ যেন painting the lily বা কুমুদ কহ্লারকে চিত্রিত করে তার শোভাবৃদ্ধির অপচেষ্টা মাত্র। তাই অলঙ্কার কাব্যের দেহে যোগকরা হয় না, অলঙ্কৃত বস্তুই কাব্যরূপে স্বীকৃতি ও মর্যাদালাভ

করে। তাই কুন্তক বলেন—'সালঙ্কারস্য কাব্যতা'। ইহা নারীদেহের অলঙ্কারের মত বহিঃস্থিত পৃথক বস্তু নয়, ইহা কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মত, অঙ্গের সহিত প্রত্যঙ্গের মত অপৃথক ভাবে সন্নিবিষ্ট।

কাব্যের ফুলফোটানো :—কবির বাসনা এই যে তার কাব্যের মালঞ্চে ফুল ফোটাতে হবে। কারণ তার অন্তরে বিকাশ-ভিখারী অশরীরী এক শিশু বহির্জগতে প্রকাশিত হবার জন্য লালায়িত হয়ে—আর্তস্বরে রোদন করছে। তাই কাব্যমালঞ্চের মালাকর রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত কবিতাটী প্রত্যেক কবির অন্তরপটে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত। 'কবিতা' রচনা যেন—ফুল ফোটানোরই মত। তাকে কুঁড়ির ভিতর থেকে বলপূর্বক টেনে বার করা যায় না, যেহেতু 'কবিতা বনিতা চৈব সরসা স্বয়মাগতা',—অন্যথায় 'বলাদাকৃষ্যমানা চেৎ সরসা বিরসায়তে"। তাই কবি বলেন :—

তোমরা কেউ পারবে না গো পারবে না ফুল ফোটাতে
যতই বল যতই কর,—যতই তারে তুলে ধর,—
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন আঘাত কর বোঁটাতে।
দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে,—ম্লান করিতে পারো তারে,—
ছিঁড়তে পার দলগুলি তার ধুলায় পার লোটাতে।
তোমাদের এ গণ্ডগোলে যদিই বা সে মুখটী খোলে
ধরবে না রং,—পারবে না তার গন্ধটুকু ছোটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে
সে শুধু চায় নয়ন মেলে, দুটী চোখের কিরণ ঢেলে,—
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বোঁটাতে
যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।

রসিক পাঠক : সুবর্ণের মত এই কাব্যরসকে কষে নেওয়ার জন্য চাই বিদগ্ধ পরীক্ষক, সমালোচক,—চাই দরদী পাঠকের পরিশীলিত রসিক মন। তাই স্বয়ং কালিদাসও নূতন কাব্য সৃষ্টিপ্রসঙ্গে সন্দিহানচিত্তে বলেছেন—"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্"। বিদ্বজ্জনের অনুমোদনই এই কাব্যের কষ্টিপাথর। সংবেদনশীল সহৃদয় রসগ্রাহী পাঠক ব্যতীত কাব্যের আদর করবে কে? যে-বিদ্যা কাব্যবিচারের কষ্টিপাথর হতে পারে সে বিদ্যা কোন বিদ্যা?

আলঙ্কারিক বলেন—

'সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ
নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তাঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ।'

যাঁরা অনুরাগী সাহিত্য-রসপিপাসু তাঁদেরই রসাস্বাদন হয়,—যাঁরা বাসনাহীন বৈরাগী তাঁরা কাষ্ঠ, দেওয়ালের ভিত্তি, অথবা পাথরের মত নিষ্প্রাণ দ্রষ্টা মাত্র, 'সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ'। তাই পণ্ডিতেরা বলেন—'বিদ্যয়া সার্ধং ম্রিয়েত ন বিদ্যামূষরে বপেৎ'—অর্থাৎ নিজের বিদ্যা নিয়ে মরা ভাল, তবু ঊষর ক্ষেত্রে বিদ্যা বপন করবে না। এবং বিধাতাকে প্রার্থনা করেন—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ'। রসিকেরা পরিহাস করে বলেন :—

"নগ্নক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি"। নাগাফকিরের দেশে ড্রাইং-ক্লিনিং এর দোকান খোলার মত মূঢ়তা আর কি আছে ?

কাব্য পাঠের প্রস্তুতি—কবির কাব্যরস বিবিধ প্রকার। আলঙ্কারিকগণ রসকে নয় প্রকার বলেছেন শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। সুতরাং কাব্যের সূক্ষ্মতর আবেদন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে হলে পাঠকপাঠিকাদের ও কিছু মানসিক প্রস্তুতি অবশ্য প্রয়োজন। তাঁদের অনুভবশক্তি বাড়ানো এবং অন্তরের আধার প্রশস্ততর করা প্রয়োজন। তার জন্য কাব্যসাহিত্যের শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন অর্থাৎ অনুশীলন দ্বারা মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন অবশ্য প্রয়োজন (Cultivation of the faculty of poetic appreciation)

কবির কল্পনাকে কল্পনাশক্তির দ্বারাই গ্রহণ করবার জন্য এবং কবির আবেগের বা আবেগপ্রসূত আবেদন বা ধ্বনির উত্তরে দরদী অন্তরের সাড়া বা প্রতিধ্বনি তোলবার মত তাঁর যোগ্যতা থাকা চাই। এই সুযোগ্য সহৃদয় শ্রোতার অভাবেই একদিন মহাকবি ভবভূতি সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন —"উৎপৎস্যতেঽস্তি মমকোঽপি সমানধর্মা, কালোহ্যয়ংনিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী' অর্থাৎ একদিন না একদিন আমার কাব্যের উপযোগী কোনো শ্রোতা বা দরদী সমালোচক অবশ্যই উদ্ভূত হবেন কারণ কাল অনন্ত এবং ধরিত্রীও বিপুলা।

আমাদের মনের ক্ষেত্রকে সৎকাব্যের অনুশীলন রূপ কৃষিকার্যের দ্বারা,

সৎপ্রবৃত্তিরূপ অনুকূল সারের দ্বারা সহানুভূতি রূপ জলসেচনের দ্বারা উর্বর করে তোলা চাই। নচেৎ উষর অন্তরে অসৎ সাহিত্যের কাঁটাগাছ গজালেও সুকুমার কাব্যের রজনীগন্ধা ফুটবে না।

কাব্যের কোনো কোনো রস সার্বজনীন এবং সর্বজন প্রিয় যেমন স্বদেশ-প্রীতির গান ও কবিতা সাধারণতঃ সকলেরই ভালো লাগে সকলকেই প্রভাবিত করে। উদাহরণ স্থলে মুকুন্দদাসের গানের কথা বলা যায়। সাধারণ রচনার ফলে অসাধারণ উন্মাদনা এবং স্বাধীনতার সঙ্কল্প এই গানগুলিতে জনগণের মনে এনে দিয়েছিল।

Shelley যে কবিদের unacknowledged administrators of the world বলেছেন তার সম্পূর্ণ সমর্থন মিলবে এই শ্রেণীর গানের প্রভাবে। উদাহরণ স্থলে ঋষি বঙ্কিমের আনন্দমঠে 'বন্দেমাতরম্' এর প্রভাব ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের 'ও আমার দেশের মাটি,'—'সার্থক জনম আমার' প্রভৃতি অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' প্রভৃতি সকলেরই অন্তর স্পর্শ করে। কিন্তু 'তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন' কিম্বা 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে' প্রভৃতি বুঝতে হলে কবির সঙ্গে 'অরূপ রতন আশা করে' একটু রূপসাগরের অতল গভীরে ডুব দেওয়া ছাড়া গতি নাই। 'অপরূপকে দেখে এলাম দুটী নয়ন ভরে' বলবার অধিকার অর্জন করতে হলে শুধু ডুব দেওয়ার নয় একটু হাবুডুবু খাওয়ার মূল্যও পাঠককে দিতে হবে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদও বারংবার ডুব দিতে বলেছেন 'হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে' এবং ভরসা দিয়েছেন 'রত্নাকর নয় শূন্য কখন দু'চার ডুবে ধন কি মেলে?"

এই ডুব দিয়ে ডুবুরির সাধনায় সিদ্ধ হলে তবে তত্ত্বদর্শনের তৃতীয় চক্ষু লাভ করা যায়।

বঙ্গীয় কবি-পরিষদের তমলুক অধিবেশন

সভাপতির অভিভাষণ

৮ই অক্টোবর রবিবার, ১৯৬১ ২১ আশ্বিন ১৩৬৮ সাল

সমবেত সুধী, সাহিত্যিক ও কবি বন্ধুগণ এবং সাহিত্য রসিক ভাই ভগ্নীগণ—

আজ তমলুকে আপনারা বঙ্গীয় কবি পরিষদের এই সম্মিলন আহ্বান করে আমাদের শুধু যে আনন্দ দান করেছেন তাই নয়, বাংলার নবীন প্রবীণ কবি সাহিত্যিকগণের মনে যথেষ্ট উৎসাহ এবং আশার সঞ্চার করেছেন। আমি পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদের গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গত পূর্ব বৎসর (বাং ১৩৬৬, ইং ১৯৬০) সুদীর্ঘ ২১ বৎসর পরে, মেদিনীপুরেরই বৈষ্ণবচকে, বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের পুনরুজ্জীবন হয়। আজ দীর্ঘকাল পরে বাংলার অবহেলিত কাব্যসাহিত্যসেবক কবিদের আহ্বান ক'রে এই কবি-সম্মেলনের অধিবেশনের গুরুভার বহন ক'রে আপনারাই আবার অগ্রণী হয়ে, কাব্য ভারতীর এই সার্বজনীন সারস্বত পূজার ঘটস্থাপনা করলেন। দেবী সরস্বতী আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর আনন্দ চিন্ময় রসধারায় আপনাদের জীবন পরিপ্লুত এবং সাফল্য মণ্ডিত করুন।

এই উৎসবের মিলন-বাসরে অনেক সাহিত্যিক দিক্‌পালের বিরহ আমাদের বিশেষ ব্যথিত কচ্ছে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রাজশেখর বসু, সুবোধ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় রায়, প্রভাতকিরণ বসু প্রভৃতির পরলোক গমনে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে এবং সাহিত্যিকগণ, তাঁদের সঙ্গলাভে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে বিষন্ন এবং দুর্বল বোধ কচ্ছেন। আমার মনে হয় আমরা যদি আন্তরিক ভাবে গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁদের কথা স্মরণ করি, তাহলে তাঁদের স্বর্গত আত্মা আমাদের মনের মলিনতা দূর করে শক্তি সঞ্চার করবেন।

এই কবি-সম্মিলন আর এক দিক্ দিয়েও স্মরণীয়। কবিতিলক অক্ষয়কুমার বড়াল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ও কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের জন্ম-শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসব—১৩৬৭ ও ১৩৬৮ সালে পড়েছে। সুতরাং শ্রদ্ধানম্রচিত্তে

আমরা তাঁদের স্মরণ করি এবং তাঁদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যথাসাধ্য কাব্যালোচনায় ব্রতী হই।

এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ করি যে এই স্বল্পকালের সাহিত্যানুশীলনে আমাদের প্রধান কাম্য সাহিত্য-রসিক সুহৃজ্জনের সঙ্গলাভে নিজেদের অন্তরে পরিতৃপ্তি ও পরিতোষ লাভ করা। আমি মনে করি তার ফলে আমরা ভবিষ্যৎ সাহিত্যসাধনার জন্য শক্তিলাভ এবং পাথেয়-সংগ্রহ করতে সক্ষম হব।

আমি প্রথমে মেদিনীপুর বন্দনা করে, পরে তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে তার পরে কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে দু'এক কথা বলব।

মেদিনীপুর বন্দনা

('মন্দিরের চাবি' হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত)

মেদিনীপুরের বীরসিংহের বীর সন্তানে কেবা না জানে ?
বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর সবার দুঃখ যাঁহার প্রাণে। * * *
মেদিনীপুরের মেদ মজ্জায় স্বাধীন ভারত উঠিল গড়ি
আজি তার কথা গাথায় গাঁথিয়া মেদিনীপুরেরে প্রণাম করি। * * *
আজি বাংলার পুণ্যপীঠের শ্রেষ্ঠ আসনে বস মা তুমি
ঋষি বঙ্কিম পুজিল তোমায় হেরিয়া সাগর সিকতা ভুমি।
তাহারি 'কপাল কুণ্ডলা' পরে মূর্তি লভিল নূতন করি
নর-কপালের কুণ্ডল পরি' রণচণ্ডিকা খড়্গ ধরি।
কত সন্তান রণে দিল প্রাণ কত নিগ্রহে লুটায়ে পড়ে
হাজার-মুণ্ডী সাধনার স্থান, শহীদের বেদী তারাই গড়ে। * * *
ভূতগ্রস্তে মন্ত্র পড়িয়া ঘাড় হতে ভূত ছাড়ায় ওঝা
'ভারত ছাড়ো'র আন্দোলনের মন্ত্র পড়িল সরল সোজা। * * *
লক্ষজন সে শোভাযাত্রায় বক্ষ পাতিয়া হইল জড়
জাতীয়-পতাকা হস্তে যাহার আদর্শ তার' সবার বড়।
সবার অগ্রে থাকিয়া বাহিনী অভয়ে চালনা করেন যিনি
বয়সে প্রবীণা, সাহসে নবীনা, হিংসা-বিহীনা মাতঙ্গিনী।
ডানহাতে গুলি বিঁধেছে যখন, বামহাতে ধ্বজা উচ্চ করি।
বুক পাতি করে মৃত্যু বরণ মরিয়া তবুও পতাকা ধরি। * * *

ধর্মে মহান্ কর্মে মহান্ মর্যাদা দান করিল সবে
এই যে মেদিনীপুর মহীয়ান্ চারণের গানে অমর হবে।
বাংলার মান, ভারতের মান জড়জগতের সঞ্জীবনী
ভারত-মাতার কণ্ঠমালার উজ্জ্বলতম মধ্যমণি।
পার্থসখার পদধূলি নিয়ে দেশের কালিমা করিল দূর
সারা ভারতের তীর্থভূমি এ পুণ্যভূমি এ মেদিনীপুর।

তাম্রলিপ্তির কথা : বহু শতাব্দী পূর্বে হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রার কথা আজ পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। সেই স্মরণীয় যুগে এইখানেই ভারতবর্ষের বাণিজ্য বন্দর ছিল। এই বন্দরেই তখন বাণিজ্যপোত ও রণতরী সমূহ নির্মিত হ'ত এবং সুবৃহৎ অর্ণবপোত, যাত্রী ও পণ্যসম্ভার নিয়ে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয় দ্বীপপুঞ্জ এমন কি চীন জাপান পর্যন্ত যাতায়াত করত এবং সেই সমস্ত দেশের রত্নভাণ্ডার স্বদেশে বহন করে আনত। ('Indian Shipping' by Radha Kumud Mukherjee)

ঐতিহাসিক বলেন—"তাম্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় শত সৌধ চূড়ায় সে-বিভবচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙালীর পুরুষকার ঘোষণা করিত। কিন্তু এখন আর তাম্রলিপ্তের সে অনন্ত নীল জলরাশি নাই, সে বাণিজ্যপোত নাই, আর বাঙালীর পোতারোহণের সে কলকলায়মান কোলাহলও নাই। * * যে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তী হইয়া জগদ্বিখ্যাত ব্যাবিলন, ট্রয় প্রভৃতি উন্নতিশালী নগর সকল এক্ষণে নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে,—যে সর্বগ্রাসী কালের বশবর্তী হইয়া বিখ্যাত গৌড়, পাণ্ডুয়া প্রভৃতির গৌরব-সূর্য অস্তাচলে চিরনিমগ্ন হইয়াছে, সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের কঠোর হস্ত হইতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যও অব্যাহতি লাভে সমর্থ হয় নাই।" তাম্রলিপ্ত অতি প্রাচীন নগরী। রামায়ণে এর উল্লেখ না থাকলেও মহাভারতে (হস্তিনাপুরে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পর্কে ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়) বায়ু পুরাণে, বিষ্ণু পুরাণে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

কনক সভই পিলে বলেন যে,—এই তাম্রলিপ্তি, তামলিপ্‌টি বা তামালিত্তি হতেই 'তামিল' নাম হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে ইহারা দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং সুদূর ব্যাবিলন সিরিয়া ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন। ('Tamils 1800 years ago',—by K. Pillay)

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ("বাংলা ও দ্রাবিড় ভাষা"য়) "আজও বাংলায় দাড়ি, নাড়ি, হাঁড়ি, ভুঁড়ি প্রভৃতি শব্দ তাহার পরিচয় দেয়"।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এখানে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। পার্শ্বনাথের পর চতুর্বিংশ বা শেষ তীর্থংকর মহাবীর বা বর্ধমান স্বামীর নামেই বর্ধমানের নামকরণ হয় এবং তাঁহারা তাম্রলিপ্তের সহিতও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

খৃঃ পূঃ ৩০৭ অব্দে এখান হতেই বোধিদ্রুম সিংহলে প্রেরিত হয়। ৪৮৩ খৃঃ পূঃ বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের সময়েও এইস্থান একটি প্রধান বৌদ্ধতীর্থরূপে পরিগণিত হত।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য, সম্রাট, প্রিয়দর্শী অশোক, সিংহলরাজ তিস্যের আমন্ত্রণে এখান হতেই কন্যা সংঘমিত্রা ও পুত্র মহেন্দ্রকে বহু ভিক্ষুর সহিত সিংহলে পাঠান। সেও ২৪৩ খৃঃ পূর্বের ঘটনা।

চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তাঁর শেষ ২ বৎসর (৪১১-৪১২ খৃঃ) এখানে থাকিয়া বহু বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রতিলিপি করেন। এবং এখান হতে, বুদ্ধদন্তের প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগ দিতে সিংহল যাত্রা করেন।

৫২৬ খৃঃ আচার্য বোধিধর্ম এখান হতে ক্যান্টন যাত্রা করেন এবং তাঁহার সহিত 'প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়সূত্র' এবং 'উষ্ণীষ-বিজয়-ধারিণী' তন্ত্রগ্রন্থ চীনদেশে নিয়ে যান। বঙ্গাক্ষরে লিখিত এই দুটি গ্রন্থের পুঁথি জাপানে হোরি উজি মঠে আবিষ্কৃত হয়েছে। আজও জাপানে 'সিঙ্গোন' বা তান্ত্রিকগণ যে সব স্তবকবচাদি পাঠ করেন বা ধারণ করে থাকেন সে সব বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত।"

(মেদিনীপুরের ইতিহাস প্রথম ভাগ যোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত পৃঃ ৮৬ বিশ্বকোষ ১৭শ ভাগ পৃঃ ৪১১ হইতে উদ্ধৃত)।

৬২৯ খৃঃ ইউয়ান চোয়াং এখানকার ২০০ ফিট উচ্চ অশোকস্তম্ভের বর্ণনা করেছেন। ৫০টি হিন্দু মন্দিরের কথাও তাতে আছে।; তখনো দশটি বৌদ্ধমঠ ও সহস্রাধিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এখানে ছিল। তাম্রলিপ্ত বহুবার ভীষণ জলপ্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৬৩৫ খৃঃ, ১৭৩৭ খৃঃ, ১৮৬৪ খৃঃ এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের প্লাবনের দ্বারা বোধ হয় ক্রমান্বয়ে এই প্রাচীন নগরীর পূর্ব গৌরবের ধ্বংস সাধিত হয়েছে। মধ্যবর্তী ইতিহাস অসম্পূর্ণ এবং তা' এখানে আমাদের উল্লেখযোগ্য নয়। অশোক তাঁহার কলিঙ্গ বিজয়কালে তাম্রলিপ্তও জয় করেছিলেন, অশোকস্তম্ভটি তার পরিচয়।

তাম্রলিপ্তের পৌরাণিক যুগের দুটি প্রাচীন রাজার নাম পাওয়া যায়,—ময়ূর ধ্বজ ও তাম্রধ্বজ। তারপর পাওয়া যায় আরও তিনটি নাম।

রাজা দেব রক্ষিত (বিষ্ণু পুরাণে) রাজা দেব সেন (বাণভট্টের হর্ষ চরিতে) এবং রাজা গোপীচন্দ্র। শেষোক্ত নাম ম.-ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত কবি রামচন্দ্র লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিতে পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ ইঁহার মৃত্যুর পর কাঁকড়-দেশীয় রাজা কালু ভুইঞা তাঁর সুদক্ষ সেনার সাহায্যে তাম্রলিপ্ত অধিকার করেন। তমলুকের বর্তমান রাজবংশ তাঁহারই বংশধর বলিয়া পরিচিত। কালু ভুইঞা সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন।

কবি ও কাব্য সাহিত্য। যাঁরা কবি, যাঁরা লোকোত্তর পুরুষ তাঁদের স্মরণ করে আমরা নিজেরাই ধন্য হই, যেহেতু আমরা তাঁদের সাহিত্য সম্পদের 'দায়াদ'—বা উত্তরাধিকারী। তাঁরা কাব্যের অমৃতস্বাদলাভ ক'রে এবং অমর কাব্য রচনা ক'রে নিজেরাই মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন। তাই তাঁদের উদ্দেশে আমি বলেছি—'মৃত্যুহীন মহাকাব্যে তুমি কবি চির মৃত্যুঞ্জয়'। আর আমরা "কাব্য সুধাপান-ধন্য"—তোমাদেরি 'সম্পর্কগরবী'। আজীবন কাব্য সাধনা করে পূর্বসূরীর আমাদের জন্য যা রেখে গেছেন আমরা তাই আস্বাদন করছি, ভোগ করছি, এবং সম্মিলনে একত্র হয়ে পরস্পরকে আস্বাদন করাচ্ছি। এই সারস্বত সম্পদ দানে ক্ষয় হয় না,—"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে" তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নাই সীমা আগে পাছে, যত চাই তত আছে, যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে"। আজ প্রয়োজন হয়েছে পরস্পরের কাছে আসা,—পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা এবং পাওয়া এবং তাতেই হবে এই সম্মিলনের পরম সার্থকতা। "সহনাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহবীর্যং করবাবহৈ"—এই প্রার্থনাই প্রকৃত সাহিত্যিক প্রার্থনা।

সাহিত্যালোচনায়, এই সব কাব্য-সাহিত্যের স্রষ্টা আচার্য স্থানীয় কবিদের আমরা অল্পই কিছু আলোচনা করতে এবং তার দুই বা একদেশ মাত্র দর্শন করতে পারি। তবে কাব্যের মূলমন্ত্র সম্বন্ধে দু-একটি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলে বোধ হয় অধিক লাভ হওয়া সম্ভব।

পল ভাঁর্লে, জনৈক ফরাসী কবি, এ বিষয়ে কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের কবিতায় তা অনুবাদ করে দিয়েছেন। আমাদের

চিরদিনের সূত্র আছে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। রস না হলে কাব্য হয় না। তাই ভার্লে বলেছেন—

"কবিতা সে হবে শুধু সঙ্গীতে সঙ্কেতে উদ্বোধন
আভাসের ভাষাখানি প্রভাতের মন্থিম বাতাস
দুপাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ কমল অগণন
বাকি যাহা,—সে কেবল পণ্ডশ্রম, পাণ্ডিত্যপ্রয়াস!" (তীর্থরেণু)

এই 'আভাসের ভাষাই suggestiveness,—ভাষার সূচনা দ্যোতনা বা ধ্বনি যা তার অভিধার অর্থকে অতিক্রম ক'রে কল্পলোকগামী হয়। এই আভাসের ভাষা এবং তার অন্তর্বর্তী মধুর রস না হলে, শুধু গতানুগতিকভাবে, ছন্দ-মিল-উপমা-অলঙ্কার-অনুপ্রাস দিয়ে, শুধু ধ্বনিময় ঝংকারময় বাক্‌চাতুরী দিয়ে যা হয় তা কবিতা নয়, সে কেবল 'পণ্ডশ্রম পাণ্ডিত্যপ্রয়াস' বা intellectual acrobatics। এ-সব আঙ্গিকের কিছু অল্পতা বা অভাব থাকলেও কবিতা হতে পারে—যদি থাকে 'ভাব হতে রূপে' যাওয়া আসা করবার মত রসের রসদ, ভাবের সম্পদ এবং কল্পনার গতিবেগবৈভব।

নূতন বা পুরাণো ব'লে কবিতার বিচার সার্থক নয়, সার্থক হচ্ছে রসসৃষ্টি এবং তার আস্বাদ-মাধুর্য। কারণ,

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন বাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥

যিনি পরের মুখে ঝাল খান তাঁকে লোকে বুদ্ধিমান বলে না। তবে যিনি লেখক তিনি রসিক জনকে আস্বাদন করিয়ে, পরীক্ষা বা পরখ করিয়ে নিয়ে, পাঠকের মনোরঞ্জন বিষয়ে কতকটা আশ্বস্ত হতে পারেন। তাই কালিদাস বলেছেন,—"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্"। নূতন হোক বা পুরাণোই হোক—proof of the pudding is in the eating thereof"—অর্থাৎ পিঠে হল কেমন, না খেতে হল যেমন।

কবিতার Objective এবং Subjective বিচারও একান্ত সার্থক নয়। Objective বা বস্তুতন্ত্র কবিতাকে বস্তুতন্ত্র হিসাবেই সার্থক হতে হবে—by counting the streaks of tulip—অর্থাৎ বর্ণনীয় বস্তুটির পরিপাটি রূপ রচনা করে রস সৃষ্টির দ্বারা।

তেমনি subjective বা ভাবতন্ত্র কবিতাকেও সার্থক হতে হবে পাঠকের মনের তারে, সুরের ঝঙ্কার তুলে, ভাবের সাড়া জাগিয়ে রস সৃষ্টির যোগ্যতার দ্বারা। সবকিছুই কাব্যের বিষয় হতে পারে :—

ন তচ্ছব্দো নতদ্বাচ্যং নতন্ন্যায়ো ন সা কলা
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারোমহান্ কবেঃ।

অর্থাৎ এমন কোনো শব্দ অর্থ যুক্তি বা কলা নাই যা কাব্যের বিষয়ীভূত না হতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য কবিতার অনুকরণেও দোষ নেই,—কারণ art মাত্রেই imitation,—কলা বা শিল্প মাত্রেই অনুকরণধর্মী। কিন্তু অনুকরণ থাকলেও মৌলিকতা থাকবে, এবং রস সৃষ্টি করতে পারলে রসোত্তীর্ণ হবে। না পারলে হবে ব্যর্থ এবং হাস্যকর। আমাদের যা কিছু উপাদেয় মিষ্টান্ন সবই মূলতঃ সেই গব্যরস ইক্ষুরস এবং চাল ডাল ময়দার সংমিশ্রণ মাত্র,—অথচ কারিগরের হাতে সে কি বৈচিত্র্যই না লাভ করে এবং কি তৃপ্তিই না দান করে। আবার একই খাদ্য আহার ক'রে বিভিন্ন ব্যক্তির দেহ কত বিভিন্ন এবং বিচিত্র রূপ গ্রহণ করে। কাব্য বা সাহিত্য রচনা সম্বন্ধেও একথা অনেকটাই সত্য এবং প্রযোজ্য।

গদ্য ছন্দেও কবিতা হতে পারে,—কিন্তু ভেবে দেখলে স্বীকার করতে হবে যে পদ্যই হোক—বা গদ্যই হোক তার সূক্ষ্ম একটি শ্রুতিসুখকর ছন্দ অপরিহার্য, —তার ভারসাম্য থাকতেই হবে নাহ'লে সেটা সাহিত্যের বাটখারার ওজনে উত্তীর্ণ হবেনা।

কবিতার ভাষায় ধার থাকা চাই, যা ধারে কাটে না শুধু 'ভারে' কাটে এমন ভাষা কবিতার 'ধন' (asset) নয় ঋণ (liability) মাত্র। শব্দের ললিত লীলা, ছন্দের বরণীয় বিচিত্রতা থাকেতো উত্তম, কিন্তু যদি তার বাক্যের সঙ্গে অর্থের, পার্বতী-পরমেশ্বরের মত না হোক, অন্ততঃ লৌকিক দম্পতির মত অনুরাগের মিলন থাকে তবেই তা' হ'বে সার্থক।

কাব্যের যেটা রসবস্তু, "ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুক্তবেণী মদির সঙ্গীত",—সেটি অনির্বচনীয় 'মূকাস্বাদনবৎ'—সে যেন চিত্রশিল্পীর হাতে অপরূপ ছায়া-সুষমার খেলা,—সুরশিল্পীর যেন সে harmony, সে তারের যন্ত্র, ফুঁয়ের যন্ত্র, এবং তবলা আদি বাদিত্র যন্ত্রের মধ্যে মিলন ঘটায়,—সে স্বপনে স্বপনে দেয় বিয়ে—সে বিবাহ,

রসলোকে বহন করে নিয়ে যায় আমাদের মানস অনুভূতিকে,—যাকে প্রকাশ করেছেন শ্রুতি—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' ব'লে—সেজন্যই কাব্যকে বলা হয় "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর:"।

কবিতায় বর্জনীয় কি? যা জঘন্য, জুগুপ্সিত, নিষ্ঠুর এবং অশুচি,—যা হয়তো আপাতমধুর হলেও পরিণামে মধুর নয়—সাহিত্যে তা বর্জনীয়—যেমন আহার্যে, অতিশয় পেঁয়াজ রসুন ঝাল মসলা দিয়ে তৈরী মুখরোচক লোভনীয় খাদ্য বর্জনীয়। শ্লীল অশ্লীলের সূক্ষ্ম বিচার এখানে সম্ভব নয়। কাব্যে এ বিষয়ে নৈতিক লাগামকে যথেষ্ট 'ছাড়' দেওয়া আছে কিন্তু তথাপি তার একটা স্বাস্থ্যের মাত্রামান আছে। Wordsworth সম্বন্ধে বলা হয়েছে He uttered nothing base; রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সেই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। উভয়েই মহাকবি এবং বিশ্বকবি হয়েছেন রসের স্বাস্থ্য, শুচিতা এবং শালীনতা রক্ষা করেও।

প্রগতির ছদ্ম নামে আধুনিক কাব্যে যে রুচি-বিকার উপস্থিত হয়েছে দেখা যাচ্ছে,—তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি—

"আর্ট যেখানে বড় সেখানে মহৎকে সুন্দরকেই সে এঁকেছে। তোমরা আজকাল এ সব আদর্শ মান্‌তে চাওনা। তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ জীবনের সমস্ত মলিনতা সমস্ত দারিদ্র্য নিয়ে সাহিত্য গড়তে। কিন্তু মানুষের দুঃখে মানুষের দারিদ্র্যে সত্যই যদি তোমাদের মন টলতো, তাহলে তোমরা তা নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা লিখতে না। কোমর বেঁধে লেগে যেতে কাজে। আমাদের জীবনে আজ এত দুঃখ দারিদ্র্য এসেছে বলে কি আকাশে চাঁদ উঠছে না, মানুষ কি মানুষকে ভালবাসছে না? কাব্যকে বিকৃত করে লাভ কি?" (শ্রীনরেন্দ্র দেবের ভাষণ বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন স্মারক গ্রন্থ ১৩৬৬ পৃঃ ৬৩)

সমুদ্রের উর্মিমালার মত কাব্যসমুদ্রেও উত্তাল তরঙ্গ হয়, ঝড় ঝঞ্ঝা আসে এবং যায়। এটা সমুদ্রের মৌসুমীরূপ,—এটা তার নিত্যকার রূপ নয়। সমুদ্রের আর একটি রূপ—যে রূপের দ্বারা সে আকাশের ছবি দর্পণের মত বুকে ধারণ করে,—পৃথিবীর সমস্ত চঞ্চল তটিনীকে ধীর স্থির গম্ভীর অবিচল অচঞ্চলভাবে গ্রহণ করে,—সেটি তার শাশ্বতরূপ—"আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ" কাব্যেরও এইরূপ একটি স্বতন্ত্র শাশ্বতরূপ আছে। তা এবেলা ওবেলা বদলায় না,—তাকে স্বীকার করে Keats বলেছেন:—

"A thing of beauty is a joy for ever
Its loveliness increases it will never
Pass into nothingness"

রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন "রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশাকরি" তিনি লাভ করেছেন 'অপরূপ'কে তাই বলেছেন—'অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে"—এ থেকে প্রতীতি হয় যে মহাকবি রূপ, অরূপ এবং অপরূপের কারবারী, তিনি বলেছেন সংক্ষেপে তাঁর কাব্যের একটি মাত্র পালা, সেটি সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনমেলা। ধ্বন্যালোকে বলা হয়েছে—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥

রবীন্দ্রনাথ যেন ঠিক এরই ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—"অরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করতে হয়। নারীর যেমন শ্রী ও হ্রী, সাহিত্যের পক্ষে অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত। তাহা অলংকারকে অতিক্রম করে বেড়ে ওঠে, অলংকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে না। (উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের 'লাবণ্যে'র সহিত তুলনীয়, যা অঙ্গনাগণের প্রসিদ্ধ অবয়বের—অতিরিক্ত কিছু—এবং তা অনির্বচনীয়) কাব্যের একটা গুণ এই যে কবির রচনাশক্তি পাঠকের মনকেও টেনে নিয়ে এসে লেখকের সঙ্গে একাত্ম করে দেয়। তাকেও তদ্ভাবে ভাবিত করে তোলে। আধুনিক কবিতা এদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে।"

যে কাব্যে এই অনির্বচনীয় রস যত বেশী সেই কাব্য তত সার্থক এবং রসোত্তীর্ণ। কারণ আলঙ্কারিক বলেন—"বাগৈশ্বর্য প্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্"—বাগৈশ্বর্য প্রধান হলেও রসই কাব্যের প্রাণস্বরূপ। 'প্রগতির' নামে কাব্যের যে দুর্গতি দেখা যাচ্ছে—তার কারণ শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীনরেন্দ্রদেব যা নির্ণয় করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"কতকগুলি সাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা কাগজের মালিকদের কাব্য সম্বন্ধে বিপুল অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, নূতন ফ্যাশান হিসাবে তাঁদের কাগজে প্রতি সংখ্যায় যে সব রাবিশ রচনা ছেপে পাঠকদের ঠকাচ্ছেন, তাদের যদি challenge করা হয় যে, যে কবিতাটি কাগজে ছেপেছেন তার মানেটা কি আপনারা বলুন,—তাহলেই চক্ষুস্থির!"

অতঃপর এই রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিক কবিসম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রে এই প্রবন্ধ শেষ করি। সেদিকটি ভারতবর্ষের জাতীয় জাগৃতির উদ্বোধনের দিক,—তিনি যে স্বাধীনতার অগ্রদূত,—সে-কথা স্বাধীনতার অন্যতম সমরক্ষেত্র মেদিনীপুরেই আলোচনা করা কর্তব্য বলে মনে করি।

স্বাধীনতার অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ভারতবর্ষের শীর্ষে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয়ের মত—যেন এক 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়।' তাঁর প্রতিভা হিমাদ্রির মতই বহু উত্তুঙ্গ শিখর সমন্বিত। সে প্রতিভার বিকাশ বিশ্বতোমুখী এবং উচ্চতা আকাশস্পর্ধী।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"কমলহীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে,—আর তার থেকে যে আলো ঠিক্‌রে পড়ে তাকেই বলে কাল্‌চার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।" আজ তাঁর মণিদীপের দীপ্তির শুধু একটিমাত্র রশ্মি অনুসরণ করে,—সেই হীরকের একটিমাত্র 'পল' বা facet আমরা দর্শন করবো,—তাও অসম্পূর্ণভাবে। এই পরাধীন পতিত জাতিকে, স্বাধীন মনুষ্যত্বের কোঠায় উন্নীত করবার জন্য তিনি কি করেছিলেন,—তার একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া মাত্র—এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সোভিয়েট কবি বলেছিলেন :—

Arise,—
Our beloved Country groans,—
It calls for deliverance
As it never called before.

মহাকবি প্রার্থনা করেছিলেন,—

"প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান হে,—জাগ্রত ভগবান!"

তিনি অজস্র রূপ ও রীতি, নিত্য নব নব আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গী নিয়ে বঙ্গের সাহিত্য-গগনে যুগ-স্রষ্টির নূতন সূর্যের রূপে উদিত হলেন এবং অশীতি বর্ষ ধরে সমানভাবে তাঁর প্রতিভার সহস্রাংশু ভূগোলের উভয় গোলার্ধে বিকীর্ণ করলেন অমলিনভাবে।

Apollo র মুখে Shelley যে বলেছেন,—

> I am the eye with which the Universe
> Beholds itself and knows itself Divine.

অথবা Dryden যে কথা বলেছেন Shakespeare সম্বন্ধে—

> "A man so various, that he seemed to be
> Not one man but all mankind's epitome"

এই উভয় উক্তিই রবীন্দ্রনাথে পরম সার্থকতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ যুগন্ধর পুরুষ, জনগণের পথপ্রদর্শক নেতা, নিয়ন্তা এবং নায়ক,—তাই তিনি জাতির কণ্ঠে তাঁর জনগণমনের ছন্দে ছন্দিত এবং হৃৎস্পন্দনে স্পন্দিত জাতীয় সঙ্গীত দান করতে পেরেছেন। দিকে দিকে জাতীয় পতাকা আন্দোলিত হচ্ছে। দ্রুত না হলেও—দেশে জাগরণের সাড়া শোনা যাচ্ছে। আজ স্বাধীনতার শৈশবে,—নব জীবনের আলোকে—বহুবিধ slogan-এ এবং গানে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। 'বন্দেমাতরম্' থেকে 'জয়হিন্দ্' পর্য্যন্ত কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা-শ্রমিক এবং কমরেড্ কেউ কম 'রেড্' নন্ সকলেই দেশপ্রাণতার লালে লাল হয়ে উঠেছেন, বিশেষতঃ নির্বাচনের প্রাক্কালে। সকলেই বলছেন "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা!"

মহাকবির ভাষাতেই বলি,—

> "পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
> আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
> তারি লাগি তাড়াতাড়ি।"

কবির প্রথম দান,—অভয়বাণী ঃ—সেদিন সেই সকল-ভয়-ভঞ্জন, অলখ-নিরঞ্জনের নামে কবিগুরু আমাদের কানে জাগৃতির মন্ত্র দিয়েছিলেন; যদি কোনো দুর্বল মুহূর্তে, কারো মনে কুণ্ঠা, কার্পণ্য বা 'ভয়' এসে ভয় দেখায়, তাই শিখগুরুর মুখে কবিগুরু আমাদের অভয়বাণী শুনিয়েছিলেন,—

> 'রে পুত্র! ভয় নাহি।'

অনেকেই হয়তো জানেন না, যে সেদিন বিপ্লবীদের সঙ্গে যেমন থাকতো ভগবদ্‌গীতা, তেমনি অনেকেরই কাছে থাকতো রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা',— 'সঞ্চয়িতা' তখনো প্রকাশ হয়নি।

বন্দার পুত্র শহীদ শিখ বালকের মত, এই 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত এবং জাতীয় যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পবিত্র প্রাণগুলি আজ মহাকবির শতবার্ষিক স্মৃতিপূজায় শ্রেষ্ঠ পুষ্পাঞ্জলি বলে গণ্য হ'বে।

আবির্ভাব কাল ঃ—রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়, জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে। তখনো সিপাহীযুদ্ধের হুতবহশিখার ধূম এবং বিস্ফোরকের গন্ধকের গন্ধ,—জাতীয় হতাশার মধ্যেও,—পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ-সন্তানদের প্রেরণা এবং উত্তেজনা সঞ্চার করছিল। তখনো গ্যারিবল্‌ডি ও ম্যাটসিনির দ্বারা, অস্ট্রিয়ার হাত থেকে ইটালির স্বাধীনতালাভ ভারতবর্ষকে মুক্তির স্বপ্ন দেখাচ্ছিল।

চারণ-কবি ঃ—কূপ-মণ্ডূকের মত অহংসর্বস্ব, আত্মম্ভরি এবং আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদ (Aggressive Nationalism বা Jingoism) তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তথাপি দেখতে পাই তিনি বিশ্বমানবতার সার্বভৌম কবি হয়েও, জাতীয় জাগরণের সেই মহাসন্ধিক্ষণে, আপন চারণকবির কর্তব্য বিস্মৃত হ'ন নি। তাই সেদিন তিনি বলেছিলেন "এ যে বুকফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে দারুণ মরম বেদনা।" বড়ই দুঃখের বিষয় যে স্বাধীনতা লাভের যুগাধিক কালের পরও, সে দুঃখের অবসান আমাদের আজও হয় নি।

জাতীয়তার সত্য ইতিহাস ঃ—অভিসন্ধিমূলক, মিথ্যা ইতিহাস রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে, দেশপ্রাণ, ত্যাগের প্রতীক, রামদাস স্বামীর গৈরিক-পতাকা-ধারী শিষ্য শিবাজীকে, তিনি পার্বত্যদস্যুর কলঙ্কিত নাম থেকে মুক্তি দান করে, স্বাধীন রাজার সিংহাসনে গৌরবের স্বর্ণমুকুট পরিয়ে, অভিষেক করেন এবং শিবাজী উৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন।

"অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ, ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন হবে আজি জয়ী"।

ইংরাজ সরকারের স্বরূপ ঃ—তিনি এই পরাধীন, বিদেশীমায়ামুগ্ধ মোহান্ধ জাতিকে চক্ষুষ্মান ও জাগ্রত করলেন। তিনি জানালেন—'সুরঙ্গ পথের অন্ধকারে' ছদ্মবেশী বিদেশী বণিকের রাজ-সিংহাসন পাতা হয়ে গেছে এবং 'বণিকের মানদণ্ড' শর্বরী পোহাতেই 'রাজদণ্ড রূপে' ধরা পড়ে গেছে।

তখন জলোকার শোষণ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে—দেশ তখন শাসনে মূর্ছিত এবং শোষণে শোণিতহীন পাংশুবর্ণ হ'য়ে পড়েছে। তখন 'ধনীর দুয়ারে,' 'কাঙালিনী মেয়ে' ম্লানমুখে, বিরস-বদনে, দিনের পর দিন গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসছে। শারদোৎসবের 'সহকার শাখা' এবং 'মঙ্গল কলসে'র উৎসবের দ্যোতনা মিথ্যা এবং ফাঁকির অভিনয়ে পর্যবসিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের রূপঃ—তিনি চিত্রতুলিকা গ্রহণের বহুপূর্বেই চিত্রিত করেছেন—দেশমাতৃকার 'নির্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বলা', 'অনিল বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চলা',—'শুভ্র তুষার কিরীটিনী' 'ভুবন মোহিনী' মহিমময়ী প্রতিমা,—রেখায় নয় লেখায়। তিনি নিজেই আবার বজ্রাহত বিদীর্ণবক্ষ হয়ে আর্তনাদ করেছেন —সেই মহিমময়ীর কাঙালিনী রূপ দেখে।

পরিবেশ ও পরিস্থিতি, হিন্দুমেলা ও স্বাদেশিক সভাঃ—ঠাকুর পরিবারের মধ্যে দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র ও গণেন্দ্রনাথ, যখন বিদেশী বর্জন করে স্বদেশী শিল্পের প্রসার কল্পে 'হিন্দু মেলা' প্রভৃতি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলছিলেন, তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ—কৈশোরে পা দিতে না দিতেই স্বাদেশিকতায় এবং জাতীয়তায় দীক্ষা লাভ করেন। হিন্দুমেলার উদ্বোধন হয় ১৮৬৭ সালে,—জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় ১৮ বৎসর আগে।

তখন গোবিন্দ রায়ের, "কতকাল পরে বল ভারত রে"
রঙ্গলালের,—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়"
দ্বারকানাথের "না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা—"
মনোমোহন বসুর "দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হায় পরাধীন।"
হেমচন্দ্রের "ভারত তবুও ঘুমায়ে রয়" এবং "বাজরে শিঙা বাজ এই রবে
দ্বিজেন্দ্রনাথের—"চলরে চল সবে ভারত-সন্তান

মাতৃভূমি আজি করে আহ্বান।"
এবং "মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমার।"

সত্যেন্দ্রনাথের—"মিলে সব ভারত-সন্তান .... গাও ভারতের জয়"
গণেন্দ্রনাথের—"লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি ক'রে।"

ইত্যাদি জাতীয় সঙ্গীত, জাতির মনে জাতীয় প্রেমের প্রেরণা যোগাচ্ছিল; হিন্দুমেলার নবমবার্ষিক অধিবেশনে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে,

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু মেলার উপহার' নামে দেশের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র দিয়া একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। মনে হয় রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে 'স্বাদেশিক সভা' বলে যে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তা থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক ভাবধারার উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি সাধিত হয়। নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। তবে তাঁর স্বদেশপ্রেম তাঁর পৈতৃকসূত্রে পাওয়া, কারণ ঠাকুর পরিবার সে সময় স্বাদেশিকতার দৃষ্টান্তস্থল ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন,—"স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল,—তাহাই আমাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছিল।"

কংগ্রেস : ১৮৮৬ খৃঃ এ কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গান করেন—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মত ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।

তখনো কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ছিল আরামচেয়ারের উপর। নীতি ছিল আবেদন-নিবেদন মূলক। গভর্ণমেণ্টের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল এই ভিক্ষানীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই আস্থাবান ছিলেন না। তিনি ছিলেন বঙ্কিম-বিবেকানন্দ মার্গের বলিষ্ঠ ভাবধারার উত্তরাধিকারী, আত্মশক্তির সাধনায় বিশ্বাসী।

'সাধনা' পত্রিকা ও স্বাদেশিক সাধনার প্রস্তুতি :—১৮৯২ সালে জাতীয় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার জন্য এবং আত্মনির্ভরশীল করবার জন্য তিনি 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সমান্তরালে অর্থনৈতিক সংগ্রামও চালাতে হবে। অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের বর্জন এবং স্বদেশী শিল্পের উৎকর্ষ সাধন একই সঙ্গে করতে হবে।

'বন্দেমাতরম্' ও রবীন্দ্রনাথ :—রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই বাংলার কংগ্রেসে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' গানটি সেদিন জাতীয়সঙ্গীত রূপে গৃহীত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেটীর স্বরলিপি করে জাতীয় মহাসভায় গান করেন। ক্রমশঃ সেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি স্বাধীনতা যুদ্ধের মন্ত্র-রূপে যোদ্ধগণের প্রাণে উন্মাদনা সঞ্চার করেছিল এবং ইংরাজ সরকারের কর্মচারিগণের আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল। অসংখ্য শহীদ, বন্দুকের গুলিতে—

অথবা ফাঁসীর দড়িতে, প্রাণত্যাগ করবার মুহূর্তে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করে নিজে অমর হয়েছেন এবং জাতিকে এই গৌরবময় মৃত্যুর প্রেরণা দান করেছেন।

রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা বহুমুখী :—উল্লাসকর দত্ত বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পেয়েই গেয়ে উঠেন—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জীবন মাগো তোমায় ভালোবেসে"।

জাতীয়তার উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথের অবদান,—অতিবিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ এবং পারঙ্গম রাজনীতিবিদের মত।

প্রথমতঃ—তিনি দেশের দুর্বলতার প্রথম এবং প্রধান কারণ দেখলেন ভেদবাদ এবং প্রকোষ্ঠ-পরায়ণতা। জাতিভেদ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র-হরিজনাদির স্পৃশ্যাস্পৃশ্য—ভেদ-ভাগ, যাকে কথায় বলে 'বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি', এই ভেদবাদের প্রতিকার কল্পে এবং নীতিনিষ্ঠ চরিত্রবান ধর্মনিষ্ঠ যুবক যুবতী গ'ড়ে তোলবার জন্য, শান্তি-নিকেতন এবং ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় গ'ড়ে তুললেন। পরে আচার্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এসে তাঁকে সাহায্য করেন এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও শক্তি সঞ্চার করেন।

দ্বিতীয়তঃ—তিনি দেখলেন যে বিদেশী-বর্জন এবং স্বদেশী-সংগঠন না করলে ঐ বণিক সরকারকে আবেদন নিবেদনের দ্বারা অনুকূল করা যাবেনা তাই তিনি শ্রীনিকেতনে ও সুরুলে, কৃষি ও কুটিরশিল্প-সংগঠনে মনোনিবেশ করলেন।

তৃতীয়তঃ—ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান প্রভৃতি ধর্মবিভাগ ছাড়াও হিন্দুধর্মের মধ্যে অসংখ্য ভেদ আছে, যার ফলে শতকরা যদি ৫ বা ১০ জনের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে তো বাকী ৯৫ বা ৯০ জন এখনো "যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে।" তাই তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বললেন—"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছো অপমান, অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।" তিনি আত্মবিস্মৃত জাতিকে, আত্মসচেতন করতে চেয়েছেন। অলস, বিলাসপ্রবণ, কর্মবিমুখ, মুখসর্বস্ব, ঘরের কোণপ্রিয় বাঙালীকে জাগাবার জন্য বঙ্গমাতাকে ভৎর্সনা ক'রে বলেছেন :—

"সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননি!
রেখেছো বাঙালী ক'রে মানুষ করনি!"

চতুর্থতঃ দেশের অর্ধেক—অর্থাৎ সমগ্র নারী-সমাজ, নানাবিধ সামাজিক বন্ধনে, লজ্জায় এবং ভয়ে, অজ্ঞানে এবং কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন, জড়ীভূত, মূর্ছিত বা মৃতকল্প অবস্থায় পতিত বা পরিণত। কবি তা'দের সুস্থ, মুক্ত এবং প্রাণবন্ত করেছেন,—সমান অধিকার দিয়ে, পুরুষের সহধর্মিণী করে।

পঞ্চমতঃ—ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি, তার নিজস্ব সম্পদ ও সংস্কৃতির প্রতি, জাতির শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। সাহেবিয়ানা ও বিবিয়ানার অনুকরণ তিনি একান্ত ঘৃণা করতেন। সেই তরুণ বয়সে তিনি লিখেছেন :—

কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ
ছদ্মবেশে বাড়েনা কি চতুগুণ লাজ?
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছেনা নিত্য অপমান? * *
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছেনা কি তব স্বজাতিরে? * *
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি একি অহঙ্কার?
তার চেয়ে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার।

তিনি সতেরো বছর বয়সে বিলাত গিয়েছিলেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি যে তিনি বাঙালী। তিনি সেখান থেকে স্বদেশী পোষাকেই ফিরেছিলেন। যদিও সে সময় দেশের শিক্ষিত সমাজ, পোষাক পরিচ্ছদ আসবার পত্র সব কিছুতেই সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণ করে চলেছিল।

তাই প্রার্থনা জানিয়েছেন তিনি মহাজীবনের সাধনার জন্য মহামন্ত্রের :—

"দাও আমাদের অভয়মন্ত্র অশোকমন্ত্র তব
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র দাওগো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব
মৃত্যু তরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব"।

তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জন করে,—'জাত-পাঁত' ভেঙ্গে দিয়ে সর্ববিধ ভেদবাদ পরিহার করে,—তিনি মা'র অভিষেকের মঙ্গল ঘট ভরবার জন্য সকলকে আহ্বান করেছেন এবং বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশ্বভারতী রচনা করেছেন "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

যেখানে ভেদ বাধা এবং বেড়া সেখানেই তিনি দুঃখ বোধ করে বলেছেন—

"পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

যেখানে ভেদবাদী Rudyard Kipling বলেছেন,—"The East is East, the West is West and ne'er the twain shall meet." অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এক অনতিক্রমণীয় Apartheid প্রচার করেছেন সেখানে অভেদবাদী রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ব্যাঘ্র ও বলীবর্দকে, তাঁর আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন বলিষ্ঠ সাধনায়,—একঘাটে জল খাইয়ে ছিলেন,—"সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"। তাঁর কবিপ্রতিভা বিদ্বেষের নয়, প্রেমে এবং আনন্দে অবাধ আদান-প্রদানের। তাঁর মতবাদ উদার অসঙ্কীর্ণ বিশ্বমৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত—যেখানে সকলে "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।" তিনি বিশ্বমানবকে আলিঙ্গনবদ্ধ করতে চেয়েছেন,—নরদেবতার বন্দনায়,—বলেছেন—

"হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।"

তাই তিনি প্রথমতঃ স্বদেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী কবি, পরে স্বকীয় প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে সার্বভৌম প্রেমে আন্তর্জাতিক কবি বা বিশ্বকবি বলে পরিচিত হন।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও রবীন্দ্রনাথ: বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিরোধকল্পে বাংলায় যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়; সে আন্দোলনের পুরোভাগেও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইং ১৯০৫ সাল ১৫ই অক্টোবর, বাং সন ১৩১২ সাল ৩০শে আশ্বিন, রবীন্দ্রনাথ সারা বাংলাদেশে গঙ্গাস্নান, অরন্ধন, হরতাল এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে রাখীবন্ধনের বিধান ঘোষণা করেন। তাঁর রাখীবন্ধনের গানটি আজও মিলনের মন্ত্র স্বরূপ হয়ে অন্তরে অন্তরে বিরাজ করছে—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।"

* * *

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান।"

এই সময় থেকে বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত করার দিন ১৯১১ খৃঃ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিপ্লবের এক বিপুল বন্যা ব'য়ে গিয়েছিল—আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল—যার ফলে বাংলার অসংখ্য ছেলে হাসিমুখে ফাঁসি, দ্বীপান্তর এবং কারাগার বরণ করেছে। এদের সকলেরি অন্তর রবীন্দ্রনাথের সহস্রাংশুর উজ্জল কিরণে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমের মহামন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' মুখে নিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের উন্মাদনাপূর্ণ গান কানে শুনে, তা'রা নিঃশঙ্কচিত্তে জীবনকে তুচ্ছ করে বীরদর্পে অসাধ্য সাধন করেছে। তা'র কয়েকটি নমুনা দিই—

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সঙ্গীত ঃ—

--"আমি ভয় করবোনা ভয় করবোনা,—
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরবো না"
— "কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ
কাতরে কাঁদিবে মা'র পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।"

—"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।
—"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হ'বে মোদের বাঁধন টুটবে
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে।"
—"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা ব'লে ভাসা তরী"
—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।"
—"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে—তা বলে ভাবনা করা চলবে না,
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে হয়তো রে ফল ফলবে না"
—"নিশিদিন ভরসা রাখিস্ ওরে মন হবেই হবে
যদি পণ করেই থাকিস্ সে পণ তোমার রবেই রবে।"
—"মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?"
—"যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক—আমি তোমায় ছাড়বো না মা
আমি তোমার চরণ করবো শরণ আর কারো ধার ধারবো না মা।"
—"বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি।"
—আগে চল আগে চল ভাই।"

এই সব গান,—মোহগ্রস্ত মৃতকল্প জাতির অন্তরে প্রবল স্বাধীনতার পিপাসা জাগিয়ে—দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করে—অতি অল্পকালের মধ্যে যে অসাধ্য সাধন করেছিল তার ফলেই জাতি সর্বস্বপণ করে উত্তরোত্তর স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়ে যেতে পেরেছিল,—এবং আর এক মহামানবের নেতৃত্বে ১৯৪৭ খৃঃ তে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়েছিল।

নরমদল ও গরমদলঃ—রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে গরমদলের প্রতিই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ছিল দেশকে আত্মনির্ভরশীল করা গঠনমূলক ক্রিয়ার অনুবর্তী। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের মনে এই আন্দোলন negative বা নেতি ধর্মমূলক ব'লে কিয়ৎ পরিমাণে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে মহাত্মাজীর গঠনমূলক তালিকার অধিকাংশ কার্যসূচীই রবীন্দ্রনাথের লেখায় বা কার্যে রূপ গ্রহণ করেছে। উভয়ের এই আন্তরিক মিলের জন্যই মহাত্মাজী পরম শ্রদ্ধাভরে এবং সাগ্রহে কবিকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করেছেন। উভয়ের এই মহামিলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যে কতখানি অগ্রসর করে দিয়েছে তা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন। পরবর্তী আন্দোলনে কবির অন্তর মহাত্মাজীর আইন-অমান্য-করা অসহযোগের আন্দোলনে ঐকান্তিক ভাবে সাড়া দিয়েছিল। এই সত্যাগ্রহ ও সমাজ-সংগঠনের ভাবধারা তাঁর ১৯১২ খৃঃ এ রচিত 'মুক্ত ধারা'র রূপক নাটিকায় রূপ গ্রহণ করেছে।

কার্লাইল সার্কুলার ও ছাত্রদমনঃ—জাতীয় আন্দোলনে যাতে দেশের ছাত্রছাত্রীরা যোগ দিতে না পারে সেজন্য বাংলা সরকার কুখ্যাত 'কার্লাইল সারকুলার' জারি করেন ; যে কোন ছাত্র 'স্বদেশী' সভা সমিতিতে যোগ দেবে বা 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করবে তাকে চিরকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা হবে,—এই মর্মে। ছাত্রছাত্রীরা এই জুলুমের নিকট মাথানত করেনি। তারা অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটি গঠন করে এর প্রতিবাদ জানায় এবং বিরোধিতা করে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎঃ—রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি শিক্ষাব্রতী দেশনায়কগণ সংকল্প করলেন যে বিদেশী সরকারের করায়ত্ত শিক্ষা প্রণালীর জুলুম থেকে মুক্ত করে, জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে, আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এই জাতীয় শিক্ষা

পরিষৎএর জন্য অর্থসাহায্য করলেন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, স্যার তারকনাথ পালিত, এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তার প্রধান অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, এর অধ্যাপনার ভার নিলেন। রবীন্দ্রনাথও এতে নানা বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং উৎসাহদান করেছিলেন। কিন্তু পরিচালকদের মধ্যে নানা মতভেদ লক্ষ্য করে, ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে বাধ্য হ'ন। এই সময় তিনি 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামক প্রবন্ধ লিখে উভয় দলকে মিলিয়ে একযোগে দেশের কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ :—উভয়দলের এই মতভেদ ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিবাদে পরিণত হয় এবং ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে অত্যন্ত বিশ্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীঅরবিন্দকে ইংরাজ সরকার রাজদ্রোহ অপরাধে বন্দী করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যে অপরূপ কবিতাটী রচনা করেন সেটী প্রকাশিত হয় তাঁর নব প্রকাশিত বঙ্গদর্শনে। "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার,—হে বন্ধু হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার, বাণীমূর্তি তুমি" ইত্যাদি

১৯০৮ খৃঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয় পাবনায়। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করেন এবং চেষ্টা করেছিলেন উভয় দলকে যদি মিলিয়ে গৃহবিবাদ দূর করে, গঠন শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। এই অধিবেশনে তিনি সভাপতির অভিভাষণ বাংলায় দিয়েছিলেন, বলা বাহুল্য যে তার ফলে বাংলা ভাষার স্বকীয় মর্যাদা, স্বদেশে এবং বিদেশে, প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পথ ও পাথেয় :—এর পরে ঘটে ক্ষুদিরামের বোমা নিক্ষেপের ঘটনা মজঃফরপুরে। রবীন্দ্রনাথ এই জিঘাংসু পন্থা যে কল্যাণপ্রসূ হবে না তা তাঁর "পথ ও পাথেয়" নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। কিন্তু ছেলেদের আত্মোৎসর্গ এবং প্রাণবলি দেওয়ার বীরত্বের প্রশংসা করেছিলেন।

অসহযোগ - সত্যাগ্রহের প্রয়োগ - পরিকল্পনা :—মহাত্মাগান্ধীর আফ্রিকার **passive resistance** এর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯ খৃঃ-এ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনা করেন। তা'তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মাধ্যমে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার, তাহার প্রয়োগ সাধনা এবং

শক্তির বিপুলতার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই গান্ধীজি আফ্রিকায় Passive Resistance শুরু করেন,—রাজনৈতিক প্রতিরোধের অস্ত্র হিসাবে।

সমাজ সংস্কার :—রবীন্দ্রনাথের 'তপোবনে' প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি যেমন গভীর শ্রদ্ধা দেখা যায় তেমনি কদাচার, কুসংস্কার ও ধর্মের ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির প্রতি ও দেখা যায় মর্মান্তিক তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর 'অচলায়তন' নাটকে।

জাতীয় সঙ্গীত :—১৯১১ খৃঃ তে কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি উপহার দেন আমাদের বর্তমান জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে' ইত্যাদি।

এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ান এবং শান্তিনিকেতন প্রভৃতি দেশ ও জাতিগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে আমরা আজ পেয়েছি বিশ্ব ভারতী নামক বিশ্ববিদ্যালয়কে।

নোবেল পুরস্কার :—গীতাঞ্জলিও এই সময়ে প্রকাশিত হয় এবং কবি আধ্যাত্মিক সাধনা ও আরাধনার মধ্যে গভীরভাবে নিমগ্ন হন। ১৯১৩ খৃঃ তিনি 'গীতাঞ্জলি'র জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য :—ভারতের ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই,—যে ভারত চিরদিন বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং নানাবিধ মতানৈক্যের মধ্যে ঐক্যের এবং সাম্যের সন্ধান পেয়েছে। কবির অভিমত—তিনি সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন যে—

"এই ঐক্য ও সাম্যের দ্বারা নিখিল মানবের মুক্তিকল্পে তার কল্যাণের পথ প্রশস্ত করতে হবে।"

ছাত্র আন্দোলন :—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে কবি এই কথাই বিশদ করে বলেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে সুভাষচন্দ্র ও ওটেন-ঘটিত ব্যাপারে ইংরেজ সরকার যে নিষ্ঠুরভাবে ছাত্র দলন করেন তার প্রতিবাদে কবি 'ছাত্র শাসন' নামে একটি বলিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করেন।

শিক্ষার বাহন :—'শিক্ষার বাহন' নামক একটী প্রবন্ধে বাংলা-ভাষায় অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা দাবী করেন।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম :—প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে তাঁর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়। ইংরেজ সরকারের খেয়াল খুশীমত রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আলফ্রেড থিয়েটারে প্রবন্ধটি পঠিত হয় এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধক্রমে তাঁর আর একটা অবিস্মরণীয় ভারত বন্দনার গান—"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী" নামক গানটীও সেইদিন সর্বসমক্ষে গীত হয়।

বেশান্ত ও রবীন্দ্রনাথ :– ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয় কলিকাতায়। হোমরুল (Home Rule) পরিকল্পনার জন্য শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তকে সভানেত্রী করা নিয়ে নরম ও গরম দলের মধ্যে আবার বিরোধ বাধে। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, কিন্তু গরম দলের প্রতিই ছিলেন সহানুভূতি সম্পন্ন। এই বিদেশিনী মহিলার ভারতের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে কৃতজ্ঞ হ'য়ে, তাঁহাকেই প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তিনি সমর্থন করেন এবং তাঁহার সমর্থনেই বেশান্ত সেদিন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নাইটহুড্ ত্যাগ :—১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে জালিয়ানাওয়ালা-বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর কবি ক্ষোভে চার পাঁচ দিন প্রায় অনিদ্রায় অতিবাহিত করেন, অতঃপর তার প্রতিবাদ স্বরূপ সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রদত্ত নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে চেম্‌স্‌ফোর্ডকে যে পত্র লেখেন তা জাতীয়তার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। তার অংশ মাত্র উদ্ধৃত করছি :—

"The disproportionate severity of the punishment inflicted upon the unfortunate people and methods of carrying them out, are without parallel in the history of civilized Govts. ...And these are the reasons, which have painfully compelled me to ask your Excellency, with due deference and regret, to release me of my title of Knighthood.

'একতার উপায়' :– হিন্দু মুসলমানের একতা ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা অসম্ভব এই কথাই বুঝাবার জন্য এবং এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য তিনি 'একতার উপায়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

ফ্যাসিজম্‌এর প্রতিবাদ :—১৯২৬ খৃঃ-এ তিনি মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইটালি যা'ন এবং সেখানে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে কঠোর মন্তব্য করেন। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করে মানুষকে রাজশক্তির

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত ব্যবহার করা যে কত বড় বর্বরতা তা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন।

গান্ধীজিকে সমর্থন :—গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র ও অহিংস আন্দোলনকে অমানুষিক অত্যাচারের দ্বারা দমন করার জন্য তিনি লণ্ডনে "কোয়েকার" সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে দৃঢ়কণ্ঠে কঠোর মন্তব্য করেন এবং ইংরাজের এই কুশাসনের বিরুদ্ধে এই শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহকে সমর্থন করে লণ্ডনের বিখ্যাত 'স্পেক্টেটার পত্রিকায় একখানি পত্র লেখেন।

রাশিয়ার চিঠি :— ১৯৩১ খৃঃ এ রাশিয়া ভ্রমণ ক'রে এসে 'রাশিয়ার চিঠি' নামক গ্রন্থখানি লেখেন, তাতে তত্রতা প্রশাসনিক ব্যবস্থার উচ্চ প্রশংসা করেন এবং আমাদের পক্ষেও যে সামাজিক উন্নতির ও শিক্ষার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় এইরূপ মত প্রকাশ করেন।

জাতিভেদ ও রবীন্দ্রনাথ : জাতিভেদের প্রতিবাদকল্পে তিনি দুখানি নাটক পর পর রচনা করেন একটি 'শাপমোচন' অপরটি 'চণ্ডালিকা'। বুদ্ধের প্রচারিত জাতিভেদহীনতা, সামাজিক সর্বজনসমতা, প্রেম এবং করুণাই যে একমাত্র কল্যাণের পথ তাই তিনি দেখিয়েছেন। 'অপমান' কবিতায় বলেছেন,—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছো অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে।
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

নিয়তির মত অমোঘ এবং কঠোর মহাকবির এই ভবিষ্যদ্বাণী। এ যেন আগামী ১৯৪৩ খৃঃ-র ভীষণ এবং ব্যাপক দুর্ভিক্ষের ছবি কবির ধ্যাননেত্রে দেখে লেখা',—তার ছবি এঁকেছেন "Bengal Famine" নামক গ্রন্থে দেশপ্রাণ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ।

বিচারের দাবী :—স্বাধীনতালাভের পরেও যারা দেশের দুর্গতদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলছেন,—কদর্য দালালীর মাধ্যমে অবশ্য-প্রয়োজন অন্নবস্ত্র

ঔষধাদির অসম্ভব রকম মূল্য বৃদ্ধি করছেন,—এবং হীনতার ও নীচতার চরম সীমায় গিয়ে খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল মেশাচ্ছেন,—তাঁদের লক্ষ্য করেও কবি ঐরূপ শোকে দুঃখে অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর মতই বলে উঠেছেন—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে,
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

এই নিরীহ নিঃসহায়দের প্রতি অত্যাচারের যারা হেতু, সেই বিশ্বাসঘাতক কালোবাজারীদের লক্ষ্য করেই যেন বলেছেন,—

"অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস।
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।"

ভিসুভিয়াসের তরল অনলোদ্গারের মত কবি বলেছেন,

"যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়—আপনার,
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত ন্যায্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়
অন্ন তার অকল্যাণ মাতৃরক্তপ্রায়।
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তি তা'র
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগার।

মনে হয় কবির এই অভিশাপ—কোনো এক অনুশোচনার মুহূর্তে ঐ বিশ্বাসঘাতক ঘৃণ্য ব্যবসায়ীদের জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলবে।

জীবনের দাবী:—এদের পার্শ্বে তুলনা করুন বহু বৎসর পূর্বেকার (১৮৯৪ খৃঃ) তাঁরি আঁকা আমাদের অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত দরিদ্র বাস্তুহারা ভাইবোনদের ছবি,—যা ভাগ্যক্রমে তিনি দেখে যেতে পারেননি—যেমন আমরা

তা'র বহু বৎসর পরে প্রত্যক্ষ দেখার দুঃখ এবং যন্ত্রণা পেয়েছি এবং ভোগ ক'রেছি। তাদের হয়ে তিনি দাবী করেছেন—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।

জাতীয়তা'র প্রথম সূত্র তিনি নির্ধারণ করে গেছেন—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

যা'রা ভাই-ভাই হয়েও আজ ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে পড়েছে তাদের কাছে তিনি দা'বী করেছেন,—

"ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান—
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সব অসম্মান
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি
যে-মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।

আমাদের অন্তরের প্রদীপ তিনিই জ্বালিয়েছেন। আজ যে কেহ আপনার অন্তরের মধ্যে দেশপ্রেমের হোমানলের অরুন্তুদ অন্তর্দাহ অনুভব করেন তিনিই কবির মর্মপীড়া উপলব্ধি করেন—

"যেন সচেতন বহ্নিসমান নাড়ীতে-নাড়ীতে জ্বলে।"

সমাজের শ্রেষ্ঠ অভিজাত বংশে জন্ম গ্রহণ করে, চিরসুখীদের মধ্যে একজন সুখিতম জন হয়েও ব্যথিত বেদনের আশীবিষ-জ্বালা তিনি ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের দ্বারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড :—যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে নরকাগ্নি জ্ব'লে ওঠে, এবং ভারতের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়, তারই মৌরুসী পাট্টা ম্যাক্ ডোনাল্ডের কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড। উহার প্রবর্তনের সময় টাউন হলের সভায়—রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন,—

My advice to my countrymen is,—they should ignore this award and focus all their forces—against irrational

communal and class differences,—come to an agreement between ourselvs and thus remove one of the greatest obstacles in the path of our national self-expression."

সংগঠনাত্মক সেবা :—১৯১৮ খৃঃ এর পর রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিকে পশ্চাতে রেখে সাহিত্যে ও গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

শান্তি নিকেতন, শ্রীনিকেতন :—শান্তিনিকেতনে প্রথমে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, পরে বিশ্ব-ভারতীর প্রতিষ্ঠা, দ্বাদশবার সমুদ্র ও আকাশ যাত্রা এবং বিশ্বভ্রমণ, জমিদারীতে সমবায় সমিতি, পাঠশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন, চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষাদান, বৃক্ষরোপণ, ইষ্টাপূর্ত (public works) বা জনহিতার্থে কূপ জলাশয়াদি খনন, রাস্তা মেরামত ও প্রস্তুত করা, জঙ্গল পরিষ্কার দ্বারা পল্লী সংস্কার করা, সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা চাষীদের ঋণমুক্ত করা, শ্রীনিকেতন ও সুরুলে কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্পের প্রসার,—National Council of Education-এ যোগদান, প্রভৃতির দ্বারা তিনি তরুণ বয়স থেকে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অক্লান্তভাবে চেষ্টা ও পরিশ্রম করে গেছেন—নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্য দেশের শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য।

হিজ্‌লী হত্যার প্রতিবাদ :—১৯৩১ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে এই মেদিনীপুর জেলার হিজলী জেলে নিরস্ত্র বন্দীর উপর বেপরোয়া গুলিচালনার পর কবির অগ্নিগর্ভ বাণী আমরা শুনতে পাই সেই অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে। তিনি মনুমেণ্টের নীচে বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন "রক্ষক নামধারী নরঘাতকদের" বিরুদ্ধে জনসাধারণের নালিশ জানাবার জন্য।

নেতাজীর প্রতি :—মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কবি বাণী দিয়েছিলেন,—"ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। তা'রা দীপ জ্বালবার জন্য ভুল করে আগুন লাগালো, পথকে করল বিপথ। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণনিবেদন, আশু নিস্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে, কিন্তু তারাতো নির্ভীক মনে চিরদিনের মত প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে।

বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ,—তার সরলতা, তার কল্পনাবৃত্তি—তার নূতনকে চিনে নেবার উজ্জল দৃষ্টি,—রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য—পরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি,—এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর করে,—

তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে,—নব বসন্তে নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ কর তুমি।··আজ আমার শেষকর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করিতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক,—কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেবো এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছো, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।"

সভ্যতার সঙ্কট :— ১৯৪১ খৃঃ এ কবি তাঁর শেষ জন্মদিনে 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে তাঁর শেষবাণীতে আক্ষেপ করে বলেছেন, "পাশ্চাত্ত্য জাতির সভ্যতার অভিযানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা অসম্ভব হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে,—মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান, যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।·জীবনের প্রথম প্রারম্ভে সমগ্র মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি,—পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব,—সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে,—মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।"

মিস্ র‍্যাথবোনের প্রতি :—ভারতবাসীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ না দেওয়ার জন্য মিস্ র‍্যাথবোন,—বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যা— এক খোলাচিঠিতে বলেন, ভারতবাসীর পক্ষে সেটা কৃতঘ্নতা। রোগশয্যায় শায়িত হয়েও মহাকবি জাতির পক্ষ থেকে কঠোর ভাষায় তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন : দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, জাতীয়তার প্রতি, এই তাঁর শেষকর্তব্য পালন

পূর্বদিগন্তের সে মহামানব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং :—আমার মনে হয়েছে কবি যে মহামানবের আগমন-বার্তা সূচনা করে বলেছেন—"ওই মহামানব আসে—দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে" সে মহামানব তিনি স্বয়ং। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার বাণীও তিনি স্বয়ং রচনা করে দিয়ে গেছেন যেন তাঁর মহাপ্রস্থানের পর,—আমরা তাঁকে চিনতে পেরে, তাঁর অবিনশ্বর আত্মাকে ওই অভ্যর্থনা দিয়ে প্রতি জন্মদিনে অভিনন্দন করতে পারি।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

রামচন্দ্রপুর অধিবেশন

১লা ডিসেম্বর রবিবার ১৯৬৩, ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৭০

অল্প কথায় কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। স্থান এবং সময় যখন দুইই স্বল্প তখন একেবারে আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করাই ভাল।

কাব্যের মাল ও মসলা :—

রসবস্তুই হল কাব্যের 'মাল' বা মহাজনের মূলধন। ছন্দে ও ভাষায় কিছু কম শক্তি থাকে তো ক্ষতি নাই শুধু এইটুকু থাকলেই যথেষ্ট হবে যার দ্বারা পাঠকের মনে মোহ সৃষ্টি করা যায়—কারণ তার মোহিনী শক্তির দ্বারা মোহ সৃষ্টি করাই কাব্যরস ভিয়ান করার প্রধান 'মসলা'।

আমাদের চিরদিনের সূত্র আছে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' রস না হলে কাব্য হয় না। তাই মনীষীরা বলেন—

সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ।

এই কাব্যরসাস্বাদ এবং সজ্জন সঙ্গম, সাহিত্যিকদের মিলন-ক্ষেত্রে একই কালে এবং একই স্থানে সম্ভব হয় এবং সার্থক হয়।

সাহিত্যের সার্বভৌমতা :—

সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্যসাহিত্য, দেশবিদেশের সকল জাতির মধ্যে প্রীতির রাখীবন্ধন করে। এ শুধু "বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন" তাদেরি মধ্যে রাখীবন্ধন নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন রসপিপাসু নিখিল নরনারীর মধ্যে মন বোঝাবুঝির এবং ভাবের আদান প্রদানের খুব সোজাসুজি ব্যাবহারিক ব্যবস্থা।

সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্যসাহিত্য, অন্তরকে প্রসারিত করে, মনকে উন্নত করে এবং জাতি-পাঁতির পরিধি তথা ভৌগোলিক চতুঃসীমা কিছুই স্বীকার করে না। সাহিত্য নিষ্প্রাকার এবং নিষ্প্রত্যূহ। বিভিন্ন দেশের সঙ্কীর্ণ সামাজিক গোঁড়ামির অচলায়তনকে সচলায়তন এবং অবাধগমন করে তোলে,

কারণ "মনোরথানামগতি র্ন বিদ্যতে" এবং নিরঙ্কুশ কবিগণ মনোরথে আরোহণ করে আকাশপথেই বিচরণ করে থাকেন। বিগত বৎসরে সমগ্র বিশ্বে বিশ্বকবির স্মরণসংবর্ধনাই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আজও বিদেহী কবি নিখিল মানবের মানসলোকে বিচরণ করে তাদের প্রভাবিত করে তাদের শ্রদ্ধান্বিত চিত্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করছেন এবং চিরদিন করবেন। তাই মনস্বী কারলাইল বলেছিলেন— যে হয়তো ভবিষ্যতে কখনো ভারত সাম্রাজ্যের মত অতুলনীয় সম্পদ হারাতেও তাঁরা প্রস্তুত হতে পারেন—কিন্তু ইংলণ্ডবাসীরা তাঁদের সেক্ষপীয়রকে হারাতে কদাপি প্রস্তুত নয়। কীটস্‌এর ভাষায় কালিদাস সেক্ষপীয়রের ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যের সম্পদ, জগতে 'Joy for ever' বা শাশ্বত আনন্দের আকর হয়ে থাকবে।

অনুভূতি ও অনুমিতি ঃ—

যে দুঃখ, সুখ আমরা নিজে অনুভব করি তা আমাদের প্রত্যক্ষ লব্ধ বস্তু এবং তাই আমাদের নিজস্ব অনুভূতি। যে দুঃখ সুখের প্রসাদ আমরা কবি, সাহিত্যিক বা সাংবাদিকের অনুভবের দ্বারা অনুমান করে আস্বাদন করি তাই আমাদের অনুমিতি।

এই অনুভূতি এবং অনুমিতি সকল দর্শনের তথা সকল সাহিত্যের মূল।

সৃজনী প্রতিভা ঃ—

ইহার সহিত কবি যোগ করেন তাঁর নবনবোন্মেষশালিনী কল্পনা বা প্রতিভা বা প্রজ্ঞা। কবি এই প্রতিভার দ্বারাই সৃষ্টিশক্তির অধিকারী হন। তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছামাত্রে নূতন কল্পনা-জগৎ বা ভাব-জগৎ সৃষ্টি করেন—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে।

তিনি এই বিশ্ব-সংসারকে নিজের রুচিমত ইচ্ছামত নূতন করে সৃষ্টি করে নেন— অর্থাৎ "Gives to airy nothing a local habitation and a name" তিনি স্রষ্টার মত ঈক্ষণমাত্রেই 'সব পেয়েছির দেশ' বা 'নাই কোথাও এর দেশ' সৃষ্টি করেন, অন্ধকারের মধ্যে রহস্যময় 'রাজা'কে মঞ্চস্থ করেন এবং

জনসাধারণের অন্তরালে জালাবরণাবৃত মূর্তিমান যক্ষের স্বর্ণলিপ্সা ও অর্থগৃধ্নুতার প্রভাব প্রদর্শন করেন।

কবির কল্পনাই তার আলাদীনের প্রদীপ। শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ের অনুধ্যানে বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে তাকে একটু ঘর্ষণ করলেই নূতন নূতন জগৎ সৃষ্টি হয়।

কবিতার সংজ্ঞা :—

তাই Shelley কবিতাকে বলেছেন—'Expression of the imagination', Hazlitt—'language of imagination and the passions'—অর্থাৎ কল্পনার সঙ্গে মনোবৃত্তির আবেগ প্রকাশের ভাষা বলেছেন। Leigh Hunt 'Utterance of a passion for truth, beauty and power' বা 'সত্য, সুন্দর এবং শক্তিমানকে প্রকাশের জন্য আবেগময় উচ্চারণ' বলেছেন। Poe বলেছেন—'Rhythmic creation of beauty'—Watts Dunton বলেছেন—'artistic expression of the human mind in emotional and rhythmical language—অর্থাৎ মানবমনের আবেগময় ভাবকে সুষম শিল্পচাতুর্যে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করা-রূপ এক বিশেষ এবং বিচিত্র সৃষ্টি,—যেখানে বুদ্ধি, বোধি ও আবেগের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে।

কাব্যরস আস্বাদন :—

কবি যখন কাব্যের পথে এবং নিজস্ব প্রণালীতে জীবনদর্শনের সূত্র, ভাষ্য বা টীকা রচনা করেন, তখন তিনি জীবনরহস্যের এবং তার বিচিত্র সমস্যার রূপায়ণ এবং তত্ত্বমীমাংসা যে ভাবে ও যে ভাষায় করেন তাতে তাঁর আবেগময় পরিকল্পনার কিছু আতিশয্য থাকে ('in which emotional and imaginative elements predominate'),—কবি সেই বিচিত্র বস্তুকে তাঁর 'আপন মনের মাধুরী'-মিশানো, তাঁর স্বকীয় পাকপ্রণালীতে ভিয়ান করা মিষ্টান্নরূপে পাঠক পাঠিকাকে পরিবেশন করেন।

কাব্য পাঠের প্রস্তুতি :—

কবির এই কাব্যরস বিবিধ এবং বিচিত্র প্রকারের। কোনো কোনো রস সার্বজনীন,—যেমন অধিকাংশ স্বদেশপ্রীতির কবিতা বা সঙ্গীত যা সাধারণতঃ

সকলকেই প্রভাবিত করে এবং সকলেরই ভাল লাগে। কিন্তু কাব্যের সূক্ষ্মতর আবেদন অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হলে পাঠক পাঠিকারও কিছু মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। তাদের অনুভব করবার মত শক্তি এবং গ্রহণ করবার মত অন্তরের প্রশস্ত আধার প্রয়োজন। ইহার জন্য কিছু কাব্য সাহিত্যের সাধনা,—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা কাব্য সাহিত্যের অনুশীলন—'Cultivation of the faculty of poetic appreciation' অর্থাৎ কাব্যরস গ্রহণ করবার উপযোগী মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। কবির কল্পনাকে কল্পনাশক্তি দ্বারা গ্রহণ করবার জন্য, এবং কবির আবেগের বা আবেগপ্রসূত ধ্বনির উত্তরে দরদী অন্তরের সাড়া বা প্রতিধ্বনি তোলবার মত তাঁর যোগ্যতা থাকা চাই। আমাদের মনের ক্ষেত্রে ও কাব্যের কৃষিকার্যের দ্বারা, সৎকাব্যের অনুকূল সারের দ্বারা, সহানুভূতির জলসেচনের দ্বারা উর্বর করে তোলা চাই। নচেৎ ঊষর অন্তরে অসৎ সাহিত্যের কাঁটা গাছ উৎপন্ন হলেও—সুকুমার কাব্যের রজনীগন্ধা ফোটে না।

তাই পণ্ডিতেরা বলেন, "বিদ্যয়া সাধং ম্রিয়েত, ন বিদ্যামূষরে বপেৎ",—এবং বিধাতাকে প্রার্থনা করেন যেন অরসিকের কাছে রস নিবেদন করার বিড়ম্বনা তিনি কবির কপালে না লিখেন—"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ!"

কবিতা একপ্রকার সঙ্গীতময়ী বাণী বা musical speech সুতরাং কবিতা উপভোগ করতে হলে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে, এবং একজন দরদী শ্রোতা থাকলে তাঁকেও শুনিয়ে,—আবৃত্তি করে,—উভয়ে একত্র আস্বাদ করলেই অধিকতর আনন্দ পাওয়া যায়।

উদাহরণ দিয়ে বলি 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা,' 'সার্থক জনম আমরা জন্মেছি এ দেশে' অথবা 'ধনধান্য পুষ্পভরা' 'সকল দেশের সেরা'—আমাদের জন্মভূমির কবিতা সকলেরই অন্তর স্পর্শ করে কিন্তু "তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন" - কিম্বা—'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে' বুঝতে হলে—'অরূপ রতন আশা করে' কবির সঙ্গে একটু রূপ-সাগরের অতল গভীরে ডুব দেওয়া ছাড়া গতি নাই। 'অপরূপকে দেখে এলাম দুটী নয়ন ভরে'—বলবার অধিকার অর্জন করতে হলে শুধু ডুব দেওয়ার নয় একটু হাবুডুবু খাওয়ার মূল্যও পাঠককে দিতে হবে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও বারংবার ডুব দিতে বলেছেন—'হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে,' এবং ভরসা

দিয়ে বলেছেন যে "রত্নাকর নয় শূন্য কখন দু-চার ডুবে ধন কি মেলে"? এই ডুব দিয়ে দিয়ে ডুবুরির সাধনায় সিদ্ধ হলে তবে তত্ত্বদর্শনের তৃতীয় চক্ষু লাভ করা যায়।

কবির তৃতীয় চক্ষু ঃ—

সরস্বতী কণ্ঠাভরণের টীকায় রত্নেশ্বর বলেন,—

রসানুগুণ-শব্দার্থ-চিন্তা স্তিমিত-চেতসঃ
ক্ষণ-বিশেষ-স্পর্শোত্থা প্রজ্ঞৈব প্রতিভা কবেঃ।
সা হি চক্ষুর্ভগবতস্তৃতীয়মিতি গীয়তে।
যেন সাক্ষাৎ করোত্যেষ ভাবাংস্ত্রৈকাল্যবর্তিনঃ॥"

তাই Apllo-র মুখে Shelley বলতে পেরেছেন,—"I am the eye with which the universe beholds itself and knows itself divine."

ঋষি ও কবি ঃ—

দর্শনের ঋষি এবং সাহিত্যের কবি উভয়েই, 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্পর্কে বাঁধা। ঋষি বলেছেন—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ,'—কবি গেয়েছেন,—,—

"আলোয় আলোময় করে হে এলে আলোর আলো
আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো।"

অথবা "এই লভিনু সঙ্গ তব,—সুন্দর হে সুন্দর।
ধন্য হল অঙ্গ মম,—পুণ্য হল অন্তর।"

'রস' বস্তু কাব্যে ও দর্শনে ঃ -

আলঙ্কারিক বলেন, যে শুধু **'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'** নহে, সে রসের আস্বাদন **'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ'**

বৈদান্তিকও তাই বলেন,—**'রসো বৈ সঃ'**—'স এব রসানাং রসতমঃ'—**'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা স্তব্ধীভবতি** নন্দীভবতি অমৃতীভবতি' (ছান্দোগ্যশ্রুতি) অথবা,—

রসঃ সারোঽমৃতং **ব্রহ্ম আনন্দোহ্লাদ** উচ্যতে
নিঃসারং তেন সারেণ সারবৎ লক্ষ্যতে জগৎ।

অর্থাৎ জগৎটা যেন নিঃসার আখের ছিবড়ের মত,—আর মধুব্রহ্মই সেই নিঃসার জগতের মধ্যে রস সঞ্চার করে তাকে আখের মতই রসিয়ে তুলেছেন।

মধুব্রহ্ম ঃ—

তাই মধুমতী ঋকে শ্রুতি বলেন,—'মধুক্ষরন্তি তদ্‌ব্রহ্ম',—'মধু ক্ষরন্তি যদ্ ব্রহ্ম',—'মধু বাতা ঋতায়তে',—বায়ুর দ্বারা মধু হিল্লোলিত তরঙ্গায়িত হচ্ছে—পৃথিবীর ধুলি পর্যন্ত মধুময় হয়ে উঠেছে,—**'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'**।

কাব্যের মধু ঃ—

এই মধু, এই রস, এই আনন্দস্বরূপকে কাব্যসাহিত্যের আলঙ্কারিক, তার সৌন্দর্যের একটু আভাস মাত্র দিয়ে, বর্ণনা করতে হার মেনেছেন—বলেছেন 'অনির্বচনীয়'। দেবর্ষি নারদ বলেছেন—'মূকাস্বাদনবৎ'। ধ্বন্যালোকে বলা হয়েছে—

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব। বস্তুস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তম্। বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥"

অর্থাৎ মহাকবিদের বাণীতে তার আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করেও এক নূতন নিগূঢ় অর্থের দ্যোতনা থাকে,—যেমন নারীসৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য অতিক্রম করে—তাদের গঠনসৌষ্ঠবের সমষ্টির এক অনির্বচনীয় লাবণ্য প্রকাশ পায়। মেয়েলি ভাষায়, মেয়েটি 'রূপসী' না হলেও এই লাবণ্য থাকলে মেয়েরা তার 'আল্‌গা ছিরি'র (শ্রীর) প্রশংসা করেন। সেই লাবণ্য,—যখন দৈহিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্য থাকে,—এবং সেই সৌন্দর্যকেও যখন অতিক্রম করে,—তখন বৈষ্ণবকবি তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,—

"কিবা ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মুরছা পায়।"

তখন সত্যই সে-লাবণ্য, তরঙ্গ তুলে, অবনীবক্ষ প্লাবিত করে। নইলে শুধু 'আল্‌গা ছিরি কাজ্‌লা আঁখি'-মেয়ে হয়েই সে দ্রষ্টার ক্ষণিক মনোহরণ করে মাত্র।

সার্থক কাব্য ও কাব্যের প্রাণ ঃ—

যে-কাব্যে এই অনির্বচনীয় রস যত বেশী থাকে,—সেই কাব্য তত সার্থক এবং রসোত্তীর্ণ,—তাই আলঙ্কারিক বলেন,—

"বাগ্বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি **রস এবাত্র জীবিতম্**"।

এই রসবস্তুকেই কবি বলেছেন,—"ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুক্তবেণী মদির সঙ্গীত"। চিত্রশিল্পীর হাতে এই রস, অপরূপ ছায়া-সুষমার খেলায়, বিচিত্র ভাবের দ্যোতনা করে। সুরশিল্পীর কাছে সে 'harmony'—সে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের একতানতার ফলে নাদব্রহ্মের সন্ধান দেয়। সে—'স্বপনে স্বপনে দেয় বিয়ে'—সে বিবাহ রসলোকে বহন করে নিয়ে যায় আমাদের মানস অনুভূতিকে —যাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন শ্রুতি,—'আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি',—বলে, এবং সেজন্যই বুঝি কাব্যের রসবস্তুকে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর'-রূপ সংজ্ঞা দেওয়া সার্থক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই সংক্ষেপে বলেছেন,—তাঁর গানের একটী মাত্র পালা - সেটী 'সীমার সঙ্গে অসীমের' মিলন-মেলা। 'অণোরণীয়ান্'কে সে 'মহতোমহীয়ানে'র সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ভূমার আস্বাদ দান করে। তিনি বলেছেন, তাঁর গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে সৃষ্টির প্রথম রহস্য 'আলোকের প্রকাশ', আর সৃষ্টির শেষ রহস্য 'ভালবাসার অমৃত'। তাই তিনি প্রার্থনা করেছেন,—

'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা,—
প্রভু তোমার পানে,—তোমার পানে,—তোমার পানে'।

সুন্দরের এই অপরূপ অনির্বচনীয় রস গভীর গম্ভীর এবং অচল-প্রতিষ্ঠ। তাই কীট্‌স বলেছেন,—

"A thing of beauty is a joy for ever
Its loveliness increases, it will never
Pass into nothingness"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ ফরাসী কবি পল ভার্লেকে কবিতায় অনুবাদ করেছেন, তিনি বলেছেন,—

"কবিতা সে হবে শুধু সঙ্গীতে সঙ্কেতে উদ্বোধন
আভাসের ভাষাখানি প্রভাতের মঞ্জিম বাতাস
দু'-পাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ কমল অগণন
বাকী যাহা সে কেবল পণ্ডশ্রম পাণ্ডিত্যপ্রয়াস।"

অর্থাৎ ভাবটা এই যে,—"তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া তথা
পদবিন্যাসমাত্রেণ যয়া নাপহৃতং মনঃ।"

সে কবিতার মাধুর্যই বা কি, আর সে বনিতার সৌন্দর্যই বা কি,—যার পদবিন্যাস মাত্রেই মন মুগ্ধ এবং অপহৃত হয় না।

এই আভাসের ভাষাই Suggestiveness—ভাষায় সূচনা, দ্যোতনা এবং ব্যঞ্জনা যা তার অভিধার অর্থকে অতিক্রম ক'রে কল্পলোকগামী হয়। ভাষায় এই ইঙ্গিত এবং সঙ্কেত ব্যতীত শুধু গতানুগতিকভাবে ছন্দ-মিল-উপমা-অলঙ্কার-অনুপ্রাস দিয়ে, শুধু ধ্বনিময় ঝঙ্কারময় বাক্‌চাতুরী দিয়ে,—যা হয়,—তা কবিতা নয়,—'সে কেবল পণ্ডশ্রম পাণ্ডিত্য প্রয়াস' বা intellectual acrobatics—বা কথার সার্কাস্‌বাজী !

আচার্য ভামহ বলেছেন—

নাকবিত্বমধর্মায় ব্যাধয়ে দণ্ডনায় বা।
কুকবিত্বং পুনর্লোকে মৃতিমাহুর্মনীষিণঃ।

অর্থাৎ কবিত্ব না থাকলে অপরাধ নেই, কিন্তু কুকবিত্ব মৃত্যুবৎ !

কবিতার ভাব ঃ—

কবিতায় এই সব আঙ্গিকের কিছু অল্পতা বা অভাব থাকলেও তা 'কবিতা' হতে পারে,—যদি থাকে তার 'ভাব হতে রূপে' যাওয়া আসা করবার মত রসের রসদ,—ভাবের সম্পদ,—এবং কল্পনার গতিবেগবৈভব।

কাব্যের ফুল-ফোটানো :—

কাব্যের মালঞ্চে ফুল ফোটাতে হলে,—কাব্যমালঞ্চের মালাকর—কবি-গুরুর নিম্নোক্ত বাণী অন্তরপটে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত :—

তোমরা কেউ পারবে না গো পারবে না ফুল ফোটাতে
যতই বল যতই কর,—যতই তারে তুলে ধর—
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন আঘাত কর বোঁটাতে।

যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে
সে শুধু চায় নয়ন মেলে, দুটী চোখের কিরণ ফেলে,—
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বোঁটাতে
যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।

এই ফুল ফোটাবার জন্য চাই মালাকরের 'অপূর্বনির্মাণক্ষমা'—'নবনবোন্মেষ-শালিনী প্রতিভা' (ধ্বন্যালোক),—চাই অন্তরকারায় অবরুদ্ধ স্বপ্নভাঙা নির্ঝরিণীর মত উৎসারিত আবেগ উচ্ছ্বাস, যাতে পাষাণপ্রাচীর ভেঙে পড়ে—যাতে প্রবলতরঙ্গমালা তুলে, সে সমুদ্রাভিমুখে মিলন-পিপাসায় সহস্রবাধা অতিক্রম করে ছুটে চলতে পারে।

রসিক পাঠক :—

স্বর্ণের মত এই রসকে কষে নেওয়ার জন্য চাই বিদগ্ধ পরীক্ষক, সমালোচক,—চাই দরদী পাঠকের পরিশীলিত রসিক মন,—তাই স্বয়ং কালিদাসও নূতন কাব্য সৃষ্টিপ্রসঙ্গে সন্দিহান চিত্তে বলেছেন—"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্"। বিদ্বজ্জনের অনুমোদনই এই কাব্যের কষ্টিপাথর।

কবিতার ভাষা :—

পূর্বেই বলেছি কবিতার ভাষায় অভিধার চেয়ে ব্যঞ্জনাই বেশী মূল্যবান। 'ধ্বনি' এবং 'দ্যোতনা'ই তার প্রধান সম্পদ। কবিতার ভাষায় ধার থাকা চাই,—যা ধারে কাটে না, শুধু ভারে কাটে এমন ভাষা কবিতার 'ধন' (asset) নয় 'ঋণ' (liability) মাত্র। শব্দের ললিত-লীলা, ছন্দের বরণীয় বিচিত্রতা, এবং তরঙ্গায়িত সাবলীলতা যদি থাকে তো সোনার উপর সোহাগা, কিন্তু যদি তার কিছু দারিদ্র্যও থাকে তথাপি সে কাব্য হতে পারে মধুর,—যদি তার শব্দের সঙ্গে অর্থের এবং অর্থের সঙ্গে ভাবের সঙ্গতি ও সমন্বয় তার মূলে রস সঞ্চার ক'রে তাকে পুষ্পিত, প্রফুল্ল এবং ফলভারমণ্ডিত ক'রে তোলে।

'বাগর্থ প্রতিপত্তি' :—

অগ্নির সঙ্গে তাপের মত, আলোর সঙ্গে ছায়ার মত,—বাক্যের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক হবে নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য। এই সম্পর্কের তুলনা দিয়াছেন কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বর বা হরপার্বতীর মিলনের সঙ্গে। বাক্যের সঙ্গে অর্থের সম্পর্কে যদি অন্ততঃ লৌকিক মানবদম্পতির মত গভীর অনুরাগের দৃঢ়বদ্ধতা না থাকে তবে গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, সে হয়ে ওঠে 'চীনা হেঁয়ালি' (Chinese puzzle) বা বরযাত্রী ঠকানো ধাঁধা। অর্থপ্রতীতি না হলে তার সেই শ্রম একান্তই ব্যর্থ হবে।

ছন্দের কথা :—

বাঁধা ধরা অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা স্তবক-নিবদ্ধ ছন্দ ব্যতিরেকেও কবিতা হতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখলে স্বীকার করতেই হয় যে, গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক,—একটা স্বকীয় সাবলীল গতিভঙ্গী বা ছন্দ তার অপরিহার্য সম্পদ এবং তার ভারসাম্যও থাকা প্রয়োজন, না হলে সমালোচকের তরাজুতে তার মানের লাঘব হবে। কারণ ছন্দ বলতে আমরা বুঝি একপ্রকার সুনির্বাচিত সুপরিমিত পদবিন্যাসের ললিতকলা যার প্রভাবে পদ্যে এবং গদ্যে একটি সুমধুর শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতময় নৃত্যভঙ্গিমা সঞ্চারিত হয়,—যার ফলে তার চলার গতিতে লাগে প্রবাহিণীর তরঙ্গময় হিল্লোল অথবা মধুমাসের মাধবী কুঞ্জের হিন্দোলের দোদুল দোলা। ছন্দোবদ্ধ এবং ছন্দোবর্জিত কবিতার মধ্যে মনোহারিত্বের প্রভেদ বুঝতে হলে যে কোন উৎকৃষ্ট কবিতাকে গদ্যে রূপান্তরিত (prose order) ক'রে দেখলেই তার দুর্গতি ও দারিদ্র্য স্পষ্টই বোঝা যাবে এবং ছন্দের সার্থকতাও বোঝা যাবে।

কবির আকাঙ্ক্ষা :—

কবি চান,—ভাবে ও ভাষায়, ছন্দে এবং অলঙ্কারে, সত্য-শিব-সুন্দরকে লক্ষ্য করে,—সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, শান্তি এবং আনন্দের পঞ্চপ্রদীপে তাঁর আরতি করতে এবং তাঁকেই প্রণাম নিবেদন করতে—

যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বঃ সর্বতশ্চ যঃ
যশ্চ সর্বময়োদেবস্তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ ॥

সেই সর্বাত্মাই উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বা ইসলাম দর্শনের "ওয়াহিদাহু লা শরিক্।"

কবি চান, বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বপ্রেমের ভিত্তিতে এক সতীর্থ সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে,—যার কথা আশাবাদী কবি বার্ণস্ বলেছেন,—

"The Golden Age will revive
Each man shall be a brother
In harmony we all shall live
And share the earth together.
In virtue trained enlightened youth
Shall love each fellow-creature
And future years shall bear the truth
That man is good by nature."

শাসন ব্যতিরেকেও একদিন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানব তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে, —শাস্তির ভয়ে নয়,—সহজাত স্বভাবে। মানুষের সেই পবিত্র মানবতাকে প্রণাম জানিয়ে মহাকবি বলেছেন—

"হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে
উদারছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে।"

এই 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'র মস্তিষ্কবিকার অপনোদিত হোক,—তাই আজ নিখিল মানবের বন্ধু, বিশ্বশান্তির বিশিষ্ট রক্ষক, অবহেলিত জাতির উন্নয়নেচ্ছু, উদার হৃদয়, প্রেসিডেণ্ট কেনেডির নৃশংস হত্যায় মর্মাহত হয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে আর্যঋষির ভাষায় আজও সেই শান্তির শেষ প্রার্থনাই আমরা করি—

যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং
তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

বর্তমান সঙ্কটে সাহিত্যিকের দায়িত্ব

বর্তমান সময়ে আমরা যেন সঙ্কট সাগরে নিমজ্জিত হতে চলেছি,—চারিদিকেই সঙ্কট। তাই আজ মায়ের পূজার বেদীর চারিদিকে মায়ের উদ্দেশে আমাদের শাশ্বত প্রার্থনার অনুরণন শোনা যাচ্ছে :—

"শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।"

চারিদিকেই শুনি ভয়ের কথা বহিঃশত্রুর আক্রমণের কথা,—অন্ন বস্ত্র অস্ত্র শস্ত্রের একান্ত অভাব অনটনের কথা,—খাদ্য এমন কি ঔষধে পর্যন্ত ভেজালের কথা, মানুষের ক্রমিক অধঃপতনে পশুত্বপ্রাপ্তির কথা। সুতরাং দেশের ও সমাজের এই বর্তমান সঙ্কটে সাহিত্যিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি। দেশে আজও প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য 'মানুষ' আছেন তাই তাঁদের কাছ থেকে আমরা আজ মনুষ্যত্বের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং

প্রকৃত মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি আশা করি। যখন দেশ গিয়েছিল শক্তিশালী বিদেশী শাসক এবং নির্মম শোষকের হাতে, তখনও দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন :—

"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ'।"

বিবেকানন্দ প্রার্থনা করেছিলেন—হে 'গৌরীনাথ! হে জগদম্বে! আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা' এবং চেয়েছিলেন লোহার পেশী ও ইস্পাতের স্নায়ু। আজ এই সঙ্কটে তাই আমরা সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই, বিশেষতঃ সকল সাহিত্যিককেই আপন আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে অনুরোধ করি। দেশ স্বর্গের চেয়েও বড়, কিন্তু আজ দেশের চেয়েও যা বড় সেই 'মনুষ্যত্ব' আমরা হারাতে বসেছি। দুর্দৈবক্রমে মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্য, এই সঙ্কটগুলোও যেন দল বেঁধে আসে, তাই মহাজনেরা বলেন :—"ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি!" এবং "প্রায়ঃ সমাপন্ন বিপত্তিকালে ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনীভবন্তি"। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যেন বহু সঙ্কট জোট পাকিয়ে কুয়াসার মত আজ দৃক্-দৃশ্যের বিচার-বিশ্লেষণ অসম্ভব করে তুলেছে। সকলের মধ্যেই একটা উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজিত অসহ্য অসহনীয়ভাব। একান্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ ব্যক্তিরাও 'প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত'—বোধ করছেন। সকলেই যেন "বিষম বিষবিকার জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত"!

এই সঙ্কটে সমগ্র জাতির আশা এবং ভরসা আমাদের তরুণ ছাত্রছাত্রীগণ। দুঃখের বিষয় তারা আজ ঘরে বাইরে উপদেশ ও নির্দেশহীন,—তা'রাও আদর্শহীন উদ্দেশ্যহীন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে।

বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই সরল, ভালমানুষ, নিরীহ প্রকৃতির। কিন্তু তাদের গুরু আজ গৃহের গুরুজনরাও নন,—বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও ন'ন—পরন্তু যারা ক্ষুদে নেতা—যারা 'দুঁদে' বা দোর্দণ্ড প্রকৃতির ছেলে,—তারাই।

এর উপর,—অস্বাভাবিক রকম জনসংখ্যা-বৃদ্ধিকে যেমন জন-বিস্ফোরণ (explosive growth of population) বলা হচ্ছে,—তেমনি বিদেশীয় ফিল্‌ম্, পাশ্চাত্ত্য ফ্যাশন ও ব্যসনের অনুকরণ, এবং বিকৃত যৌন বিলাসের বহুল প্রচারের ফলে, 'যৌন বিস্ফোরণ'ও এই তথাকথিত আধুনিক প্রগতিকে কলঙ্কিত করেছে। পোশাকে-আশাকে, আভরণে প্রসাধনে, ছায়াচিত্রে, সংবাদ-সাহিত্যে পরিবার নিয়ন্ত্রণের নামে দায়িত্বহীন ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতার সুবিধা প্রদর্শনে দেশের তরুণতরুণীদের বিভ্রান্ত করছে।

পত্র পত্রিকায় গল্পে ও কথা-সাহিত্যে অনেকে সস্তায় জনপ্রিয়তা ও কিছু

কাঞ্চনমূল্য অর্জন করবার লোভে নরনারীর এই সহজাত ভোগপ্রবৃত্তির স্ফুলিঙ্গকে 'ফুঁ'দিয়ে জ্বলন্ত আগুনে পরিণত করছেন, ফলে এই দরিদ্র অধঃপতিত জাতি দ্রুততর বেগে ধ্বংসের পথেই উত্তরোত্তর নেমে চলেছে।

যাঁরা শিক্ষক, যাঁরা সাহিত্যিক এবং যাঁরা যুগপৎ শিক্ষক এবং সাহিত্যিক দুই-ই, তাঁরাও কেউ কেউ দেশের এই সঙ্কটে মানুষ তৈরী করার পবিত্র কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হয়ে কোমর বেঁধে অমানুষ তৈরীর কারখানা খুলে দিচ্ছেন,— নিজেরা সুলভে কিছু আর্থিক সুবিধা পাবার প্রত্যাশায়।

বর্তমান সঙ্কটের সম্মুখীন হ'য়ে, জাতীয় কুরুক্ষেত্রের এই উদ্যোগপর্বে কোনো দিক থেকে কি শোভা পায় এই জঘন্য যৌনলালসাকে প্রশ্রয় দেওয়া?

এই দুর্জেয় প্রবৃত্তি ফল্গুধারার মত নিয়তই বইছে—অন্তরে অন্তরে। এতে উত্তেজনার প্রশ্রয় দিলে অকূল পাথারে পরিণত হবে।

জাতিকে আজ একান্ত নিষ্ঠা সহকারে তৈরী করতে হবে, জাতির উপযুক্ত বংশধর, ভবিষ্যতের মানুষ। না হলে—"জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ" তামসী প্রবৃত্তি পরিচালিত জাতির, অদূর ভবিষ্যতে অধিকতর অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥"

অর্থাৎ অসংযত ইন্দ্রিয়গণ যখন ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে যথেচ্ছ ভোগ করে বেড়ায় এবং মন অবশভাবে তাদের অনুসরণ করে, তখন সে মন, সমুদ্রবক্ষে ঝঞ্চাহত নৌকার মত, নাবিকের প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে।

জাতির ভবিষ্যৎ সৌধ গঠিত হবে পাথর দিয়ে নয় চরিত্র দিয়ে। আজ প্রয়োজন হয়েছে আদর্শ শিক্ষক, উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক, উন্নতমনা জননেতা, বলিষ্ঠ তেজস্বী সন্তানসংঘ, 'অনুশীলন সমিতি'র মত মানুষ-তৈরীর কারখানা। সকলের মনে, মনের পুরোভাগে এক অবিচল দৃঢ় সংকল্প রাখা চাই 'আমরা মানুষ হবো'। এই প্রার্থনাই স্বামী বিবেকানন্দ, আমাদের প্রতিভূস্বরূপ, সমগ্র জাতিকে করতে শিখিয়েছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন:—"দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে, এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া কি তোমাদের নাম যশ স্ত্রী পুত্র বিষয় সম্পত্তি এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছো?—যদি ভুলিয়া থাকো তবে বুঝিও তোমরা স্বদেশ হিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছো।" তারই স্বপ্ন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন—"আমার মানস নয়নে আমি একটি মহৎ জাতির অভ্যুত্থান দেখিতেছি। বীর্যশালী কেশরীর মতই জাগিয়া সে তাহার কেশর সঞ্চালন করিতেছে।"

আমাদের আশাহত মনে প্রশ্ন জাগে যে সেই নবজাগ্রত জাতীয় কেশরী, কি আজ সমরেশ বসুর ('দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত) 'বিবরে' আশ্রয় নেবে অথবা অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসুর 'অলসা' পত্রিকায় প্রকাশিত—'এক বর্ষা রাতের' সুবিধা নিয়ে ছাগবৃত্তি চরিতার্থ করবে? সাহিত্যের মান আজ কোথায় গিয়ে নেমেছে? বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে (বৈষ্ণবচক) শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক বলেছিলেন :—

"* * আজিকার সাহিত্যের প্রধান সামাজিক প্রয়োজনের দিক হইল ভারতের সামগ্রিক সংস্কৃতিকে উন্নীত করা।"—

ঐ অধিবেশনেই মূল সভাপতি আচার্য শ্রীকুমার বলেছেন :—"মানুষ যখন ভয়াবহ বিপৎপাতে সর্বনাশের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করে, তখন তার উদ্ধারের একমাত্র উপায় কোন সুনিশ্চিত জীবনদর্শন ও সুপরীক্ষিত আদর্শবাদের দৃঢ় আশ্রয়।"

মূঢ় মদমত্ততায় আঘ্রাতমস্তিষ্ক আদর্শভ্রষ্ট সাহিত্যিকগণ যদি আমাদের শাশ্বত আদর্শের সোমনাথ মন্দিরকে তার অধৃষ্য মহিমায় অধিষ্ঠিত থাকতে দেখে—হিংস্র স্বভাবে এবং অবিমৃষ্যকারিতায় দলবদ্ধভাবে তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করবার জন্য ক্রমাগত আঘাত করতে থাকেন,—তবে একমাত্র ঈশ্বরই রক্ষা করতে পারেন এই হতভাগ্য দেশকে। এই আঘাত আজ নিদারুণ এবং ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

গল্প সাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য যে অবকাশরঞ্জন, তাতে সন্দেহ নেই,—কিন্তু তার আবশ্যিক শর্ত এই যে সেই মনোরঞ্জন বৃত্তিকে তৃপ্তিদান করতে হবে হিতকর সুখকর স্বাস্থ্যকর উপায়ে। ইংরাজী সমালোচক বলেছেন The sole condition is that the pleasure it affords is wholesome and tonic.—তা' না হলে স্বৈরাচারী লেখকদের মানসিক মহাব্যাধি সমাজের সমষ্টির কলেবরে সংক্রামিত হবে এবং তার বিষময় ফল অতি মারাত্মক হবে।

ঔপন্যাসিক এবং কথাসাহিত্যিককে সমালোচক যথেষ্ট স্বাধীনতা এবং প্রশ্রয় দেন কিন্তু তিনি একটি শর্ত সকল সময় রাখেন,—যে জীবনের মূলসূত্র জীবনীশক্তিকে বাঁচিয়ে তার সঙ্গে তালমান রেখে, তার স্বাস্থ্য শক্তিকে অক্ষুণ্ন

রেখে চলতে হবে, নইলে সমাজ কলেবরে যে ক্ষত এবং ক্ষতি হবে তার জন্য লেখককে অবশ্যই দোষী হতে হবে। কথা সাহিত্যিকের কর্তব্য হল তাঁর কথা শিল্পকে সাহিত্যরসে রসায়িত ক'রে পরিবেশন করা, নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন বা প্রচার করা তাঁর কাজ নয়, কারণ 'to write a good story and at the same time to produce a sermon,—has seldom ended in anything but failure,—অর্থাৎ এক সঙ্গে সরস গল্প লেখার এবং নীতি-শাস্ত্র প্রণয়ন করার চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও ভুললে চলবে না যে দুর্নীতি ও কুশিক্ষা প্রচার করলে তাকে সাহিত্য বিচারের ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত হতে হবে, কারণ "All really great novelists of the world, have been declared moralists and have troubled themselves a great deal about the moral bearings of the concrete facts presented by them."

অর্থাৎ খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিকদের বক্তব্য বিষয়বস্তু এবং তার পরিণাম ফল যে সুনীতির পরিপোষক হতে হবে, এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবে না, এ কথা সর্ববাদিসম্মত। তাঁদের বক্তব্য সমাজের স্বাস্থ্যহানি করবে না,—এবং শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যকে ব্যাহত করবে না। সিদ্ধির সঙ্কেতবাক্য বা মন্ত্রটি এই যে "The ethics must be wrought into the texture of the story,—the philosophy must be held in solution." অর্থাৎ নীতির উপদেশ তা'তে কাপড়ের মধ্যে সুতোর মত টানা ও পোড়েনে বোনা হয়ে থাকবে,—শরবতের মধ্যে শর্করার মত তাতে সুস্থ জীবন দর্শন একাকার হয়ে মিশে থাকবে।

In any novel, we have therefore to consider chiefly the impression made upon us by the spirit and temper of the work as a whole." অর্থাৎ উপন্যাসের ফলাফল বিচার করতে হবে আমাদের মনের উপর তার যে সামগ্রিক প্রভাব সে প্রকাশ করে,—তার উপরে। যা সৎ কাজের, উচ্চ আদর্শের এবং মনুষ্যত্বের প্রেরণা দেয়—তা' সৎ সাহিত্য আর যদি তা বিপরীত প্রভাবের দ্বারা সমাজের অধঃপতন ঘটায় তাহ'লে সে অসৎ সাহিত্য। এই অসত্তার মাত্রাধিক্য হ'লে তা' শুধু নিন্দনীয় এবং বর্জনীয় হ'বে না,—হবে বিচারালয়ে নিষেধযোগ্য, এমন কি দণ্ডনীয়।

কিন্তু আমাদের সরকার ট্যাক্স আদায় ক'রে এবং ছায়াচিত্রের উপর

'কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' এইরূপ ছাপ মেরেই নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁরা বোঝেন না,—যে ঐরূপ চিত্র, বাইবেলের নিষিদ্ধ ফলের মত শয়তানেরই প্রয়োজন সাধন করে এবং সুকুমারমতি বালকবালিকাগণকে অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত ক'রে আকৃষ্ট করে এবং বিপথগামী করে।

সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ সাহিত্যের প্রাণবস্তুকে যদি আমরা অবহেলা করি,—যদি সত্য, মঙ্গল, প্রেম এবং সুন্দরের মণিকোঠা থেকে নামিয়ে তাকে সস্তায় আপাত-মনোরম সুখের বা বিলাসের বেসাতির বস্তু করি—তা হলে art ও বাঁচবে না মনুষ্যত্বও বাঁচবে না। সে হবে ভেজাল তেলে ভাজা, ঝাল ফুলুরি পেঁয়াজ বড়ার মত, সে হবে মণ্ডপের মণ্ডপানের বিদংশ বা চাটের মত।

Realism বা বাস্তববাদ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন :—"দুনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে, নির্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে তা সত্য হতে পারে কিন্তু সত্যকার সাহিত্য হয় না। সত্যকার সাহিত্য যা,—তা' চির সুন্দর, চির কল্যাণকর।" "সংসারে যা কিছু ঘটে, এবং অনেক নোংরা জিনিসই ঘটে তা' কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পারে কিন্তু সে কি 'ছবি' হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র সৃষ্টি কি এতই সহজ?" শ্রেষ্ঠ চরিত্র স্রষ্টা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এই প্রশ্ন আজ সকলেরই গভীর ভাবে প্রণিধানযোগ্য। আবার শুধু Idealism আদর্শবাদ বা নীতিবাদেও যে সাহিত্য হয় না তা পূর্বেই বলেছি। শরৎচন্দ্রও তাই বলেছেন,—যে তাতে "নীতি পুস্তক হবে কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়,—তাও হবে,—কিন্তু কাব্য সৃষ্টি হবে না।"

একথা ভুললে চলবে না যে নীতি-পুস্তক বা স্মৃতি-সংহিতার লেখকের চেয়ে সাহিত্যিকের কলমের জোর অনেক বেশী এবং শস্ত্রের চেয়েও তার শাসনের শক্তি বেশী তাই P.E.N.-এর motto, হ'ল,—'Pen is mightier than the sword'—অসির চেয়েও মসির শক্তি বেশী।

একজন Dickens, একজন গর্কি,—একজন শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, সমাজচিত্তে যে প্রভাব ও চেতনা সঞ্চার করতে পারে—তা কোনো নীতি বা ধর্ম প্রচারক বিধি বিধান জারি করে করতে পারেন না।

এ বিষয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমালোচকের 'বাস্তবতা' সম্বন্ধে মন্তব্য

খুবই সরল এবং বিচারসহ। আমরা 'কালান্তর' ২৭শে এপ্রিল ১৯৬৭ থেকে কনস্তান্তিন ফেদিনের লেখার অনুবাদ উদ্ধৃত করছি ; তিনি বলেছেন—"সৃজনশীল সোভিয়েত শিল্পীরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্পী হয়েছেন। যে সব প্রধান বৈশিষ্ট্য আমাদের সাহিত্যকে, বুর্জোয়া সাহিত্য থেকে পৃথক করেছে সেগুলির মধ্যে সর্ব প্রথম এই দেখতে পাই যে সোভিয়েত সাহিত্য-লেখকের রচনায় শিক্ষামূলক লক্ষ্য ও কর্তব্যকে মৌলিক বলে স্বীকৃতি দেয়, সেজন্যই আমাদের দেশে আমরা সাহিত্য-কর্মে সদর্থক চরিত্রগুলির ভূমিকাকে চূড়ান্ত গুরুত্ব দিই।"

সোভিয়েত সাহিত্যে পূর্ণতাসহ জীবনের চিত্র পাওয়া যায়, যে সব দ্বন্দ্ব বাস্তবে রয়েছে লেখক তা' এড়িয়ে যান না।"

"সাহিত্যের দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দান সফল হয় তখনি যখন লেখক পাপকে ছোট করে দেখান না,—বা তা নিয়ে উল্লাস করেন না,—বরং এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন, যাতে নতুন জীবনের জয়লাভের স্বার্থে একে নির্মূল করা যায়। জীবনের সত্যই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতামূলক সাহিত্যের ধর্ম। এই সাহিত্য জনগণের অংশ এবং জনগণের সেবায় ব্রতী।"

সাহিত্য এবং নীতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রও সুস্পষ্টরূপে বলেছেন—"বিশ্বমানব একটা লক্ষ্য ধরে নিরন্তর চলেছে। তার তিনটে অংশ,—art, morality এবং ধর্ম বা religion, যা অসুন্দর যা immoral যা অকল্যাণ, কিছুতেই তা art নয়।

Art for Art's sake কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে কিছুতেই তা immoral এবং অকল্যাণকর হতে পারে না। শত সহস্র লোক তুমুল শব্দ ক'রে বললেও সত্য নয়। মানব জাতির মধ্যে যে বড় প্রাণটা আছে—সে একে কোনো মতেই গ্রহণ করবে না।" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে—শরৎচন্দ্র (১০ আশ্বিন ১৩৩১)

মনে হচ্ছে যেন আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি স্মৃতি নীতি এবং ধর্মের শাশ্বত আদর্শকে কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের দ্বারা—জাহান্নমের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। দেশ গড়ার পরিকল্পনা সেই চক্রান্তে যেন মরীচিকার মতই মিলিয়ে গেছে। এ বিষয়ে 'সংহতি' পত্রিকার শারদীয় (১৩৭৪) সংখ্যার 'জীবনের আয়নায়' নামক শ্রীসোমদেব রায়ের প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শারদীয় 'সাহিত্য পত্রে' সাহিত্যের দুর্যোগ প্রবন্ধে শ্রীঅসীম রায় বলেছেন—"খবরের কাগজের মালিকদের ছত্র-ছায়ায় এক সাহিত্যিক মূল্যবোধের নৈরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যেখানে চুপ করে থাকা চলে না। সাহিত্যে এই মূল্যবোধের ঘনায়মান নৈরাশ্যে, আমাদের ঐশ্বর্য-হরণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। বাংলা সাহিত্যের সমস্ত অনুরাগীদের এই প্রবল দুর্যোগে সচেতন হবার সময় এসেছে"।

নৈতিক নৈরাজ্য ও 'দেশ' পত্রিকা :—

শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্যের সম্পাদিত নব-পর্যায় বঙ্গদর্শনের সাহিত্য-বীক্ষায় শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী এই সম্বন্ধে 'দেশ' পত্রিকার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন সে বিষয়ে আমরাও সম্পূর্ণ একমত। এর প্রতিবাদ আমাদের 'পূর্ণিমা' সম্মিলনের সভায়, রবি-বাসরের সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার দে তুলেছিলেন—আমাদের সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর সে সভায় পৌরোহিত্য করেন,—পরবর্তী সভায় সভাপতির স্বকীয় ভবনে অনুষ্ঠিত সভাতেও সেই প্রতিবাদ বলিষ্ঠতর হয়। সাহিত্যিকরা মন্তব্য করেন যে, এই সঙ্কটে এবং এই স্বেচ্ছাচারিতায় যদি তাঁরা নীরব থাকেন, তাহলে তা'তে প্রশ্রয় দেওয়াই হবে। আগামী যুগের সাহিত্যিকরা বলবেন যে এ যুগের সাহিত্যিকরা Neroর মত বেহালা বাজাচ্ছিলেন যখন বাণীর পবিত্র তপোবনে আগুন লাগিয়ে দুষ্কৃতকারীদের তাণ্ডব নৃত্য চলছিল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বুনো ওল' নামক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের প্রায় আধা ভাগ জুড়ে আছে "রমণের রসাপ্লুত ক্লেদাক্ত বর্ণনা"। 'প্রজাপতি' গল্পটিও এই জাতীয় অভিযোগে অভিযুক্ত।

"ক্ষতির ষোল কলা পূর্ণ হবার আগেই" এ কলঙ্ক দূর করতে সাহিত্যিকদের কৃতসংকল্প হতে হবে। আমরাও তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তরের যুক্তি, শক্তি এবং আকুতি দিয়ে আবেদন জানাচ্ছি যে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাহিত্যিকগণ একযোগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে এ কলঙ্ক দূর করুন।

'সংহতি' পত্রিকা—কার্তিক ১৩৭৪

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন
জামসেদপুর-শাখার মূল সভাপতির ভাষণ

(ইং 27-12-1970 : বং ১১-৯ ১৩৭৭ : রবিবার)

জামসেদপুর সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সদস্যগণ, সহৃদয় সুধী শ্রোতৃবৃন্দ এবং সতীর্থ সাহিত্যিক মণ্ডলী—

এই সাহিত্য-সম্মিলনে আপনারা আমাকে পৌরোহিত্যের সম্মান এবং আপনাদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য দান করেছেন, যদিও আমি একজন অকিঞ্চন সাহিত্যসেবক মাত্র। আপনারা আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বিনয়নম্র নমস্কার ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্প দিন পূর্বে আমরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় বঙ্গভারতীয় একনিষ্ঠ সেবক আচার্য ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং অধ্যাপক কাজি আবদুল ওদুদকে হারিয়েছি। তা ছাড়া সুসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ও কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবীণ দার্শনিক ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যার সি, ভি, রমণ এবং মাত্র সেদিন কবিকুলতিলক কুমুদরঞ্জন মল্লিকও লোকান্তরিত হয়েছেন। সর্বাগ্রে আমরা এই দিক্‌পালগণকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি, ও তাঁহাদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

আজ নানাবিধ অভাব-অভিযোগে সংঘাত-সংঘর্ষে আমাদের জীবন ও গৃহশান্তি বিপর্যস্ত। কেহ কেহ হয়তো মনে করবেন—এ-সময়টা ঠিক সাহিত্যানুশীলনের উপযোগী নয়। আমার মনে হয় সাহিত্য আমাদের জীবনবেদ,—জীবনী শক্তি ও জীবন-বেদনার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। সাহিত্য আমাদের সর্ববিধ সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্বকালে ওতপ্রোত এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। তাই সঙ্কটকালেও সাহিত্যই আমাদের শক্তি সঞ্চার করবে এবং আলোকস্তম্ভের মত,—আমাদের দিগ্‌ভ্রান্ত ঝঞ্ঝাহত জাতীয় জীবন-তরণীকে উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছিয়ে দেবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

অন্নের লাগি মাঠে
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে,—
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের অন্ন ফলে।

এ কথা সত্য। আমরা অন্নগত প্রাণ, অন্নময় কোষই জীবাত্মার প্রথমকোষ বা প্রচ্ছদ,—অন্ন না হলে চলে না, তাই 'অন্নং বহুকুর্বীত'। ভূরি পরিমাণে অন্ন উৎপাদন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাই ব'লে দেহের খোরাকের মত মনের খোরাক 'সাহিত্য' না হলেও আমাদের একমুহূর্ত চলে না।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থল পৌরাণিক প্রতীক দেবাদিদেব মহাদেব। অন্নপূর্ণাকে তিনি অঙ্কে রেখেছেন, এবং শিরোপরি পরিপূর্ণা ভাগীরথীকে ধারণ করেছেন—কারণ অন্নজল দুই-ই জীবন ধারণের জন্য অতি আবশ্যিক প্রয়োজন।

জল এবং রস একার্থবাচক। রসকে ধারণ করে 'সরঃ' বা সরসী। তাই আমরা সাহিত্যিকরা সরস্বতীর উপাসক,—যেহেতু 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' এবং আমরা সেই রসেরই কারবারী।

শ্রুতির পরমতত্ত্বও রস,—'রসো বৈ সঃ' 'স এব রসানাং রসতমঃ' 'রস না হলে সাহিত্য হয় না। 'রস' সাহিত্যের sine qua non বা অপরিহার্য্য উপাদান। এই 'রস' নবধা পরিগণিত।

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। এরা একাকী বা মিলিত ও মিশ্রিতভাবে সাহিত্যে নানা রসের ভিয়ান ক'রে থাকে।

আমাদের 'জুজুর ভয়' অন্ধকারেই হয়। অন্ধকারকে কবি বলেছেন—ঘুমের মত, মূর্ছার মত, মৃত্যুর মত, কখনো বা দুর্ভেদ্য কঠিন কালো লোহার মত, ভীষণ পাষাণ কারাগারের মত। কিন্তু তার অন্যথাও আছে। 'Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage' কারণ দিব্য প্রেমের বর্তি বুকে জ্বালিয়ে বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া বা সুফি সাধিকা তাপসী রাবেয়া 'will take that for a hermitage'! তাকে তপঃকুটিরে পরিণত করেন। আবার জ্ঞান পিপাসায় শুষ্কতালু মানুষ যখন প্রার্থনা করে :—

'ও অসতো মা সদ্গময়,—তমসো মা জ্যোতির্গময়,—মৃত্যোর্মামৃতং গময়'

তখনো সে বাগ্‌দেবীর শরণাপন্ন হয়ে নিজের অন্তরের আর্তিকে সাহিত্যেই রূপায়িত করে,—অমৃতের পিপাসায়।

আজকের দিনে আধি-ব্যাধির প্রতীকারপূর্বক মনের ভূমিতে নবম 'রস' (শান্তরস)-টি সেচন করে, বাতাবরণ অনুকূল করতে পারলে তবেই সাহিত্যে অন্যান্য রসগুলির উপচয় ও উৎকর্ষ হতে পারবে, নাহ'লে—

"ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে" ইত্যাকার কবির অনুশোচনা ও সহানুভূতি সত্ত্বেও তা'রা অকালে শুকিয়ে যাবে।

কোনস্থানে, একদিকে যদি দর্শনের তর্ক-বিতর্ক হয় এবং অপরদিকে সুকণ্ঠে কবিতার আবৃত্তি হয়,—তাহলে দর্শনের পক্ষ ত্যাগ করে শ্রোতৃমণ্ডলী কাব্যের দিকেই আকৃষ্ট হন। নিকটে যদি কোথাও সুস্বরে সঙ্গীত হয় তাহলে কবিতা ত্যাগ ক'রে তাঁরা গানের প্রতি আকৃষ্ট হন, কারণ তাতে কবিতাও আছে আবার ছন্দে তালে গাঁথা মীড় মূর্ছনা সংবলিত রাগ-রাগিণীও আছে। আবার পাশের কক্ষে যদি হাস্যলাস্য অঙ্গভঙ্গী সমন্বিত নাট্যাভিনয় হয়, তাহলে বলাই বাহুল্য যে, সব ছেড়ে তাঁরা অভিনয় দর্শনেই আকৃষ্ট হন। কারণ তা'তে গদ্য-পদ্য গান ও হাস্যলাস্য মুখরিত বাঙ্ময় প্রকাশের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সবই আছে। কিন্তু কোন কারণে শ্রোতৃবর্গের যদি ২।৪ দিন রেশন সরবরাহ বন্ধ থাকে এবং জঠরাগ্নি জ্বলতে থাকে, তাহলে কোথায় বা বাণী, কোথায় বা বীণা! স্বয়ং ভগবানও সেখানে হাতে খাদ্য না নিয়ে উপস্থিত হ'তে ভরসা পান না,—একথা স্বয়ং মহাত্মাজিও কৌতুক করে বলেছেন। প্রাচীন শ্লোকেও আছে :—

কাব্যং হি দর্শনং হন্তি কাব্যং গীতেন হন্যতে,—
গীতং নাট্যবিলাসেন সর্বং হন্তি বুভুক্ষুতা!

পূর্বেই বলেছি 'সাহিত্য' মনের খোরাক যোগায়, বেঁচে থাকার সার্থকতা প্রমাণ করে, মনে প্রাণে রস সঞ্চার করে। কিন্তু হায়! উদরে অন্ন না থাকলে,—

বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্?

এই শিল্প-নগরীতে সাহিত্যচর্চা করতে এসে তাই পুনরায় ফিরে এলাম অন্নজলবস্ত্রের সমস্যায়।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে যেমন পৃথিবীর দূরত্ব এবং ভৌগোলিক চতুঃসীমার ব্যবধান ক্রমশঃ কমে আসছে, (সেদিন আমরা চন্দ্রলোক দেখে এসেছি, শুক্রগ্রহেও 'যাচ্ছি-যাবো' করছি)—ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও

ব্যবধান কমছে। আজ তাই আমি সবচেয়ে জোর এবং তাগিদ দিয়ে যে-কথাটি বলতে চাই—সেটি আমার অন্তরের একান্ত অনুধ্যানের বিষয়, তার নাম দিতে চাই সা-বি-দ সমন্বয়। সা=সাহিত্য, বি=বিজ্ঞান দ=দর্শন। এই তিন মার্গের সাধকগণের মধ্যে সতীর্থ-সদ্ভাবনা স্থাপন করা।

এই সমন্বয়ের সমর্থন পাই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের নিকটেও। তিনি মানব-কল্যাণের জন্য চেয়েছেন Cosmic religious consciousness এক প্রকার সার্বভৌম মানবতার সচেতন ও সুচিন্তিত ধর্ম-বন্ধনের স্বীকৃতি। যার স্বীকৃতি ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও :—

"আমি পৃথিবীর কবি যেথা তার উঠে যত ধ্বনি,
আমার-বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে অমনি।"

পুনশ্চ :—

"আমরা সবাই ভাই
ধরণীর-কোলে, জন্ম নিয়েছি স্তন্য তাঁহার খাই,—
এক মনপ্রাণ, এক ভগবান, কোনোখানে ভেদ নাই।
কেউ কালো কেউ গউর বরণ,
লম্বা বা খাটো সব খাঁটি মন
দুধ সেই সাদা, কালো হোক, চাই ধলোই হউক গাই"।

('তীর্থরেণু' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ কৃত, দ্রাবিড় কবি কপিলরের 'অভেদ' কবিতার অনুবাদ)

সাহিত্য সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে প্রীতির রাখীবন্ধন করে। রসপিপাসু নরনারীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের দ্বারা আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন করে। সাহিত্য নিষ্প্রাকার এবং নিষ্প্রত্যূহ।

সাহিত্যিক সর্বত্র অবাধ-গমন। 'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ'। তাই কবি বলেন,—

"সবঠাঁই মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি লব চিনিয়া।"

সাহিত্যের অনুশীলনে সহৃদয়তা লাভ হয়। এই 'সহৃদয়' শব্দটী সাহিত্যে একটী বিশিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার হয়। সাহিত্যের অনুশীলনের দ্বারা

যাঁদের মনোমুকুর স্বচ্ছ এবং বিশদ হয়, ও বর্ণনীয় বিষয়ও সেই মুকুরে অবিকৃত ভাবে প্রতিবিম্বিত হয় এবং মনটীও সেই বিষয়ের সঙ্গে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়,—"তে হৃদয়-সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ" তাঁরাই, মানুষের হৃদয় সংবাদের বার্তাবহ সাংবাদিক, 'সহৃদয় পাঠক, শ্রোতা বা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়দ্রষ্টা। ইহারাই রসিক বা রসবেত্তা বিদ্বান। ইহারাই সাহিত্যের পরীক্ষক। ইহাদের উদ্দেশেই কালিদাস বলেছেন,—"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্" এই পরীক্ষক পদের যোগ্যতা লাভের জন্য সৎসাহিত্যের দ্বারা মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন অবশ্য প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে এযুগ সমন্বয়ের যুগ। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প-কলা এবং তৌর্যত্রিক-বিদ্যা প্রভৃতি যা কিছু সত্য শিব সুন্দরের স্বাদ এবং মাধুর্যের সন্ধান দান করে তাই সাহিত্যিকের আলোচনা এবং গবেষণার বিষয়। আজ বিজ্ঞান ও দর্শন একটী পাখীর দুটী ডানার মত। এদের সমান গতি পাখীটাকে ঋজুপথে চালায়,—না হ'লে নানাবিধ অস্বচ্ছন্দ অসংবদ্ধ তির্যক গতি তার অগ্রগতি বিঘ্নিত করে এবং বিপৎপাতের কারণ হয়। উদাহরণ স্থলে আমার বিজ্ঞান ও দর্শন নাম্নী কবিতাটী উদ্ধৃত করি। আজ জাতীয় সঙ্কটের দিনে বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী শক্তি এবং দর্শনের সাম্যজ্ঞান সম্ভূত উদার প্রসন্ন মনোভাবের মিলনের অভাবে, যত কিছু জাতীয় অশান্তি ও রাষ্ট্রীয় যন্ত্রণার সৃষ্টি হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও দর্শন

'বিজ্ঞানে' যে জ্ঞান দিল 'দর্শনে' না দিলে উদারতা
কয়জনে অর্থ লভে, আর সবে ভুখা দরিদ্রতা।
'বিজ্ঞান রন্ধন করে চর্ব্য-চূষ্য লেহ্য আর পেয়
'দর্শন' বণ্টন করি দিলে তবে কহে উপাদেয়।
না হ'লে, কোথাও শস্য জমা রহে পর্বত-প্রমাণ
কোথাও স্বর্ণের খনি, কোথাও বা বসনের স্তূপ,
আপনি বিলাসে ভাসে অভুক্তে না দেয় অন্নপান
'বিজ্ঞান'='বিকৃত জ্ঞান',—সৃষ্টি করে নরকের কূপ

'বিজ্ঞান' তপস্যা করি আবিষ্কারে মহা মহৌষধি
কি ফল ? দরিদ্র রোগী গড়াগড়ি দিলে বেদনায়,—
অন্ন নাই,—পথ্য নাই,—নগ্নদেহ নরনারী যদি
প্রাংশুলভ্য দ্রাক্ষাফলে উদ্বাহু শৃগালে নাহি পায় !

'বিজ্ঞান', = 'বিশেষ জ্ঞান',—দর্শনে ফুটায় যদি আঁখি
না হ'লে, = 'বিক্রীত জ্ঞান'—অর্থ বিনা ব্যর্থ সবি ফাঁকি ।
'বিজ্ঞান' কাঞ্চনে যদি, দর্শনে'র মণি হয় যোগ
মণি-কাঞ্চনের মত পূর্ণ করে আনন্দ সম্ভোগ ॥

উদারতার অভাবে যে সঙ্কীর্ণতা, গৃধ্নুতা, স্বার্থপরতা ও লোলুপতার উদ্ভব হচ্ছে তার ফলেই, যাঁদের হাতে শক্তি আছে, শাসন দণ্ড আছে, তাঁরা সুবিধাবাদ অবলম্বন করে ক্রমাগত নিজের কোলে ঝোল টেনে চলেছেন. তাই স্বাধীনতার পর প্রায় সিকি শতাব্দী অতীত হলেও আমাদের পল্লীগ্রামগুলি যে তিমিরে সেই তিমিরেই হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা দিয়ে যাচ্ছে ট্যাক্স, আর (ডাকের কথায়) 'নেপো'-রা দধি সেবন (!) কচ্ছেন। প্রকৃত যা'দের ধন, তা'দের ধন যেন তা'দেরই নয়।

শতকরা ৯০ ভাগ লোক এই মহাদেশের লক্ষলক্ষ গ্রামে বাস কচ্ছে—যেখানে পথ নেই, শিক্ষা বা চিকিৎসা নেই, যানবাহন নেই, বিজলী নেই, টিউব ওয়েল নেই, জমি সেচনের জন্য বা ঘরে আগুন লাগলে নেভাবার জন্য পাম্প নেই, পাঁকে ভর্তি জলাশয়ে, পাঁক আছে জল নেই,—তাই পুকুরে মাছ নেই, হাঁস নেই, পুকুর পাড়ে ছাগ মুরগী পালন শাক সবজী ফল ফুলের গাছ-পালা কিছুই নেই। বিদ্যালয়, হাসপাতাল, প্রসব করাবার ধাত্রী, চিকিৎসক, প্রসূতি-আগার তো দূরের কথা !

জমিতে ফসল ফলাবার জন্য বীজধান ও বিভিন্ন প্রকার রবিশস্য এবং বৈজ্ঞানিক সার কিনবার মত টাকা পয়সা ও নেই, শিক্ষা ও নেই। গরু মানুষ সব, অভাবে এবং রোগে, কঙ্কালসার,—কিন্তু গোভক্তির চরম পরিচয়রূপে গোমূত্র এবং গোময় পরম পবিত্রতার সম্মান পাচ্ছে !

আজ বারংবার পঞ্চশালা পরিকল্পনা সত্ত্বেও দেশের কৃষক মজুর ভূমিহীন শ্রমিক এবং নিম্নমধ্যবিত্তগ্রামবাসিগণ, গ্রীষ্মকালে জলাভাবে এবং বর্ষাকালে সারডোবার জলে, পাঁকে কাদায় মিশ্রিত নরদমার নরককুণ্ডে বাস কচ্ছেন। শীতকালে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন শিশু বৃদ্ধ নরনারী, শুকনো পাতা সংগ্রহ করে অগ্নিকুণ্ডের চারি পাশে বসে আগুন পোয়াচ্ছেন।

পল্লীগুলি যেন দুধের মত ছিল, তা' থেকে সর তুলে নিয়ে নির্মিত হয়েছে নগর মহানগর সহর সহরতলী বাজার এবং গঞ্জও। তাই বা কয়টী? এই মহাদেশে মাত্র কয়েকটি মহানগরী বা সিটি, এবং লক্ষাধিক লোক বাস করার উপযোগী শহর প্রায় আঙুলেই গোণা যায়, বাকী সব কাদার পাচীরে গড়া খড়ের ছাউনি করা পর্ণকুটির সমন্বিত পল্লীগ্রাম।

কাব্যের, তথা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমি প্রবাসী বসুধারা, সংহতি· সুদর্শন, উজ্জীবন, বেতার জগৎ Saturday Mail, Desha-bandhu প্রভৃতি বাংলা ও ইংরাজী পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছি। এই সম্মেলনেও বিভিন্ন সাহিত্য শাখায় নানাবিধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা হবে। কিন্তু আমি আজ সাহিত্যের সকল দুঃখ সকলব্যাধির, নিদানে ও মর্মস্থানে তর্জনী নির্দেশ করতে চাই।

গ্রাম না বাঁচলে শহর বাঁচবে না, 'সা-বি-দ' গোল্লায় যাবে, গ্রামের উন্নতি না হলে সমগ্র দেশ এবার অধঃপাতে যাবে। দেশের কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে হলে মহাত্মাজি একটী সুচিন্তিত সরল সহজ নির্ভুল হদিস দিয়েছেন। চিন্তা করতে বলেছেন আমাদের জানা কোনো দীনতম দুর্গততম ব্যক্তির কথা। যদি বোঝা যায় যে অবলম্বিত পরিকল্পনার ফলে তার বা তাদের মত সর্বহারাদের কিছুমাত্র উপকার হবে, তাহলে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে সেই কাজে অগ্রসর হলে দেশের অবশ্যই কল্যাণ হবে।

এই নিঃস্বার্থ চিন্তার অভাবের ফলেই আজ আমাদের পরিসংখ্যান বিভাগ বলেছেন যে এতগুলি পরিকল্পনার ফলে ধনীরা ধনবত্তর হচ্ছেন এবং দরিদ্রেরা ক্রমশঃ দরিদ্রতর হয়ে দুর্গতির অধস্তম তলে তলিয়ে যাচ্ছেন। 'কা কস্য পরিদেবনা'! এরই প্রতিবাদে, আমাদের দেশের 'বড় সাহেবী'-মেজাজের প্রতি কটাক্ষ করেই লিখেছিলাম,—'যষ্টিমধুতে' (আষাঢ় ৩৭৫)

তোমার হাতে পড়বে কড়া তাঁহার বাড়ীর কড়া নেড়ে
Not at home—কি নেইকো বাড়ী, নয়তো কুকুর আসবে তেড়ে!
নয় দারোয়ান লম্বাদাড়ি গলার আওয়াজ বাজখাঁ ভারী
বলবে সাহেব 'বাহার গিয়া' আসবে ফিরে ঘণ্টা দেড়ে
ফিরলে তখন দেখা পেলে সেলাম দিও হাঁটু গেড়ে!

বড় ছোটর ভেদ, যুক্তির বিচারে ভিত্তিহীন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রাচীন কালেও বলেছেন যে—যিনি রাজার বড় ছেলে বলে আজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত

হয়েছেন, তিনি যেন মনে রাখেন যে গ্রামের পরাণ মণ্ডল ও তাঁরই মত নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে দেশের স্বত্বাধিকারী প্রজা এবং তাঁর সরিকান বা অংশীদার। আমার 'মন্দিরের চাবি'তে আমি বলেছি

—ক্ষুদ্র কেহ নহে
তুচ্ছ কভু নহে কেহ আজি রুদ্ধ রহে
উপ্ত বীজে সুপ্ত তনু ভস্মে বহ্নিসম
বিন্দুর জঠরে সিন্ধু দীপ্ত করি তমঃ
কালিকার ভবিষ্যের যোগ্য অবসরে,
রূপ ধরে শশিকলা পূর্ণ শশধরে ॥

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি রহেন তফাতে।

আজ পরস্পর হাতে হাত মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ না হলে কোনো আশাই নেই। সাহিত্যিকরা সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক, বিবিক্ত এবং স্বতন্ত্র। আজ তাঁদের চেষ্টা করে সংঘ-সচেতন হয়ে সংঘশক্তি গঠন করতে হবে।

আমাদের লেখকরা সরস্বতীর কৃপালাভের সাধনা করতে গিয়ে অনেকেই লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত হয়েছেন! লক্ষ্মী চঞ্চলা, তাঁর মন পাওয়া ভার। সরস্বতী প্রজ্ঞাপারমিতা হলেও, তাঁকে কোমলহৃদয়া করুণাময়ী বলতে পারা খুব কম লেখকের ভাগ্যেই ঘটে। প্রথম জীবনে অনেক কৃতী লেখকের প্রথম তপস্যার ধনগুলি কপিরাইট সমেত জলের দামে বিক্রী করে দিয়ে জীবনযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের রসদ সংগ্রহ করতে হয়েছে। আজকে যখন চাষের জমির Ceiling হচ্ছে শহরের সম্পত্তিরও Ceiling হবার চেষ্টা চলছে, তখন সাহিত্যিকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে Copy right আইন সংশোধন করে নিজেদের গায়ের-রক্ত-জল-করা তপস্যার ধনগুলি উদ্ধারের চেষ্টা কচ্ছেন না কেন?

আমাদের সরকার কৃষিপ্রধান এই মহাদেশকে হঠাৎ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করবার অপচেষ্টার ফলে আজ আমাদের এই সর্বব্যাপী অর্থ নৈতিক সঙ্কট। জনগণও দায়ী, তাঁদের ঘরে ভাত না থাকা সত্ত্বেও অত্যধিক আদিরসের নেশায় অবাধে অবোধের মত জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্ত। কথাসাহিত্যিকদেরও অনেকে এই ধূমায়িত কামাগ্নিতে ফুৎকার দিয়ে প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত করার অপরাধে অপরাধী। উপর কোঠায় এবং নীচের কোঠায় চিন্তাহীনতার

ফলে আজ 'পি-এল ৪৮০'র অবাঞ্ছিত সহস্র সহস্র কোটি টাকার অপরিশোধ্য ঋণভার। আজ জাতির অর্থ নাই, উৎসাহ নাই, বিচার বিবেচনা নাই যে-ডালে বসে আছে সেই ডালটিই নিশ্চিন্ত মনে কাটছে। যাঁরা তাদেরই হিতের জন্য, সুখ শান্তি অর্থ সামর্থ্য রাতের ঘুম, দিনের সোয়াস্তি, সব উৎসর্গ করেছেন তাঁদের অসম্মান করে, তাঁদের মর্মর মূর্তি ভেঙে ভীমরতির পরিচয় দিচ্ছে! ছন্নমতির পরিচয় দিয়ে খাল কেটে ঘরে কুমীর এনে, ভাবী বংশধরদের তার মুখে অর্পণ করতে চাইছে! ব্রিটিশ বণিকের মানদণ্ড পরে রাজদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার diagnosis করলেন রবীন্দ্রনাথ এবং চিকিৎসা করলেন রাজনৈতিক physician ও surgeon-গণ।

Physician মহাত্মাজি, দেশবন্ধু, মাতঙ্গিনী প্রমুখ নেতারা অহিংস-ভেষজে অসহযোগিতার অনুপান দিলেন। surgeon—নানা-সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসির রাণী থেকে মাষ্টারদা নেতাজী পর্যন্ত বহু বীর নরনারী বহু অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করলেন পরাধীনতার cancer সমূলে নির্মূল করবার জন্য। কিন্তু হায়! ভারতের দুর্বুদ্ধি সন্তানগণের একান্ত অবহেলায় ও নিশ্চেষ্টতায় আবার সেই মারাত্মক মহাব্যাধির পুনরাবির্ভাব দেখা যাচ্ছে! আবার দক্ষযজ্ঞের পর সতীঅঙ্গ ছারখার হবার সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

আমরা অলস, অচেতন, দীর্ঘসূত্রী পরমুখাপেক্ষী। ছেলের হাতের মোয়ার মত আমাদের হাতের শ্রেষ্ঠধন আজ কাক চিল ঈগলে ছিনিয়ে নিতে উঁচিয়ে উঠেছে, তবু আমরা নিশ্চিন্ত নিস্পৃহ! কথায় বলে যে আহাম্মকের মাথাভেদ করে গাছ গজালে সে বলে "আহা! মাথায় ছাতা ধরেছে"!

আমাদের মাটি সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা। অথচ নিরন্ন নির্ধন নিষ্প্রাণ নিরুৎসাহ কৃষক আমরা তাকে বীজ বিনা বন্ধ্যা করে রেখে পরের দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করছি, তাই শ্লেষ করে লিখেছিলাম এক সময়,—

মাটিরেও মাটি করি বীজ বিনা বন্ধ্যা
খেতে চাই ঘরে ব'সে তবু তিন সন্ধ্যা!
তাইতো পরের কাছে পাতি কাঙালের হাত
ধার ক'রে হাতী কিনে খেতে দিতে কুঁপো কাৎ!
দুর্বলে হেরি হয় প্রবলেরা লুব্ধ
টাকাটা সিকেটা পেলে মোরা হই মুগ্ধ!

মেরে ধরে কেড়ে নিলে পড়ে পড়ে মার খাই
কেমনে অন্ন রোচে মুখে হায়! ভাবি তাই।
শক্তির পূজা করি নির্ভীক সন্তান
বীর্যশুল্কে বীর লহ বিজয়ীর মান।
না হলে মাগিয়া নিয়া 'পি. এল চারশো আশী'
হেঁটমুখে চিরদুখে র'বি কি ভারতবাসী?

আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি—পার্লামেন্টের অ্যাক্টের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পাইনি,—প্রকৃত স্বাধীনতার মূল্য ও আমরা বুঝিনি।

আজ ধন প্রাণ সাহিত্য সংস্কৃতি মান ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাহিত্যিকদের পুনরায় মসীমুখী লেখনীকে অসিতীক্ষ্ণ ক'রে জাতীয় শক্তি ও জাতীয় চেতনার উদ্বোধন সংগ্রামে নামতে হবে,—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

এদিকে দেশের হীরের টুকরো ছেলেমেয়েদের Exodus বা মহাভিনিষ্ক্রমণ সুরু হয়েছে। সাত সমুদ্র পার হয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক সৈন্য সিপাহী এমন কি কিশোরী বালিকারাও nun হয়ে পরদেশে পাড়ি দিচ্ছেন, ঘরে তাঁদের সংস্থান হচ্ছেনা বলে! একে বলা হচ্ছে Brain drain! বা মস্তিষ্কবহিষ্কার!

উপসংহারে বলি, দেশে এখন প্রয়োজন হচ্ছে—অর্থকরী স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রসার, গণসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সমগ্র দেশের সহিত সকল প্রদেশের একাত্মতা বোধ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ। এসকলের প্রথম এবং প্রধান কর্মকেন্দ্র হওয়া চাই গ্রামে,—উদ্দেশ্য, গ্রামোন্নয়ন। চাই কৃষি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি রূপ Green Revolution বা সবুজ বিপ্লব এবং তার ফলে শস্য ক্ষেত্রের শ্যাম সমারোহ। চাই utilization of the primary resources of the country অর্থাৎ ক্ষেত্রজ, খনিজ ও মানুষের মস্তিষ্কজ সব কিছু ধন সম্পদের উন্নয়ন, উৎকর্ষসাধন ও সুসম্প্রয়োগ। এই বিরাট বিপুল মহাযজ্ঞে সাহিত্যিক ব্যতীত কে সমিধ সংগ্রহ করবে? কে বা সেই সমিধে সমাজস্থূয় যজ্ঞ করবে?

কথায় বলে Politicians think of the next election,—Statesmen think of the next generation,—but Litterateurs think of all time to come অর্থাৎ রাজনীতিবিদ্‌রা পরবর্তী নির্বাচনের

কথা ভাবেন, রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা তাঁদের পরবর্তী কালের বংশধরদের হিত চিন্তা করেন, কিন্তু সাহিত্যিকরা জাতির শাশ্বত কল্যাণের কথাই চিন্তা করেন।

যদি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় আমি জাপানীদের কথা চিন্তা করতে বলব। তাঁরা গত যুদ্ধে atom bomb-এর মার খেয়েও আজ পৃথিবীর প্রথম সারিতে স্থান নিয়েছেন,—আর আমরা "চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য" রেশমী পতাকার লেজের মত হয় পিছু হাঁটছি, নয়তো প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি রোমন্থন কচ্ছি—আজও পড়ে আছি যে তিমিরে সেই মহামোহ-তিমিরে।

মার্ক্‌স্‌-লেনিন করতে চেয়েছেন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিপ্লব সাধন ও সংস্কার। ভারতবর্ষের মনীষীরা চেয়েছেন তার সঙ্গে এবং তার উপরে আধ্যাত্মিক বিপ্লব-সাধন যার ভিত্তি 'জীব-শিব'-বাদ। তাই বেদব্যাস বারংবার নর, নারায়ণ ও নরোত্তমকে প্রণাম করেছেন। আমি ইহার নূতন ব্যাখ্যা করি এই যে 'নর' অর্থে সাধারণ মানুষ, 'নারায়ণ'—অর্থে নরের সমষ্টি বা জনগণ বা নরের অপত্য অর্থাৎ ভবিষ্যদ্‌ বংশধরগণ, এবং 'নরোত্তম অর্থে গীতার 'পুরুষোত্তম' (গীতা ১৫শ অধ্যায়)। আমিও আজ তাঁদের কাছেই আমার বিনম্র নিবেদন রেখে আমার ভাষণ শেষ করি।

সমাজের পটভূমিতে—বিদ্যাসাগর-গুরুদাস ও আশুতোষ

বাংলার তিনজন পুণ্যশ্লোক পূর্বসূরী এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু। উপরোক্ত তিনজন মহাপুরুষের জীবনী সম্পর্কিত ঘটনাই ইহার ভিত্তি। সে জন্য আমাদের জীবনী-সাহিত্যে এবং পরম্পরাগত ঐ তিন মহাপুরুষের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে ইহা কিয়ৎ পরিমাণে আলোকসম্পাত করিবে। আমি যথাসম্ভব স্বল্প কথায় উক্ত তিনটি চরিত্রের বিষয়ে তিনটি চিত্র রূপায়িত করিতেছি।

প্রথম চিত্রটি জাষ্টিস স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবীর।

তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ানা তখন তিনি স্যার গুরুদাসকে নির্দেশ দেন যে, তাঁহার শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণভোজনে যেন দেশবরেণ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্য নিমন্ত্রণ করা হয়। অধুনা অনেকে হয়তো না জানিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহের প্রতিবাদ ও বিধবা বিবাহের সক্রিয় সমর্থনের জন্য তৎকালীন সমাজে, তাঁহার সমাজের প্রতি সেই বিরোধিতার জন্য এক প্রকার 'একঘরে' হইয়াছিলেন।

তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে পাছে সমাজের অপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ না আসেন —স্যার গুরুদাস এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিলে তাঁহার মুমূর্ষু মহীয়সী মাতৃদেবী শান্ত, ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে বলেন,—"আমার মৃত্যুশয্যায় সকলের নিকট আমার এই শেষভিক্ষা জানাইবে যে, তিনি (অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়) আমার শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইলে আমার আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।"

অতঃপর সেই নিমন্ত্রণে বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও পূজনীয়া উদার-হৃদয়া গুরুদাস-জননীর শেষ ইচ্ছা বা আদেশ শিরোধার্য করিয়াই আসিয়াছিলেন এবং বলা বাহুল্য যে, সেই মিলনের ফলে তৎকালীন সমাজের দৃষ্টি, চিন্তা ও চেতনা আরও কিছুটা সম্মুখের পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

এখন দৃশ্যপট পরিবর্তন করিয়া আমরা দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসিতেছি। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এখন মৃত্যুশয্যায়। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তাঁহার শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণভোজনে যেন স্যার আশুতোষকে অবশ্য আমন্ত্রণ করা হয়। কারণ, এ ক্ষেত্রেও এই কথা বলিবার অনুরূপ প্রয়োজনই বর্তমান ছিল। স্যার আশুতোষকে তাঁহার বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেওয়া সংক্রান্ত সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার জন্য কতকটা অপাংক্তেয় করিবার অপচেষ্টা সে-সময়েও শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। সুতরাং স্যার গুরুদাসের কথাও যেন তাঁহার মাতৃদেবীর কথারই প্রতিধ্বনি। সকলের নিকট তাঁহার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহার শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণভোজনে স্যার আশুতোষ উপস্থিত হইলে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্যের সম্পূর্তি হইবে এবং তাঁহার আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে। বলা বাহুল্য, এবারেও মহাপুরুষের শেষ ইচ্ছা তাঁহার মাতৃদেবীর শেষ ইচ্ছার মতই সম্মানিত ও প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে সমাজে উদার আদর্শই প্রশস্তি লাভ করিয়াছিল।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

অর্থাৎ জনসমাজে শ্রেষ্ঠ এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকেরাও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেই রূপই করিয়া থাকে।

আমার মনে হয়, এই প্রেরণার পারম্পর্য আমরা দেখিতে পাই গত শতাব্দীর ইতিহাস হইতে,—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি ও অরবিন্দের ভিতর দিয়া।

এই প্রসঙ্গে মনে হয়, ভারতের মহীয়সী মাতৃজাতির কথা। যে তিন মহাপুরুষের প্রসঙ্গ আমরা উপস্থাপিত করিলাম তাঁহাদের সকলের মাতৃভক্তির কথা সকলেরই সুবিদিত। তাঁহাদের চরিত্রগঠনে ও জীবন নিয়ন্ত্রণে তাঁহাদের মাতৃদেবীর প্রভাবও সুবিদিত এবং সুপরিলক্ষিত।

'পিতুরপ্যধিকা মাতা'—পিতার চেয়ে সন্তানের জীবনে মায়ের প্রভাব বেশী, তাহা শুধু 'গর্ভধারণ পোষণাৎ'—কেবল গর্ভে ধারণ ও সন্তানকে লালন পালন করার জন্যই নহে,—মাতা আপনার সকল চিন্তা বিস্মৃত হইয়া যান সন্তানের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি, তুষ্টি ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের কামনায়। মাতা নিজেকে একান্ত গোপন করিয়া রাখেন সন্তানের জন্য। ভূগর্ভস্থ ভিত্তিপ্রস্তরের মত তাঁহারা চিরদিনের জন্য সন্তানরূপ অট্টালিকার বুনিয়াদে যেন স্বেচ্ছায় প্রোথিত থাকিয়া, লোক চক্ষুর অগোচরে, স্বকীয় স্বার্থত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠার বলে সন্তানদিগকে মানুষ করিয়া তুলেন। যে তিনটি মানুষ বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত, তাঁহারা তিনজনই অলোকসাধারণ মানুষ, যাঁহারা আপন আপন কীর্তিবলে দেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

যে মহীয়সী মাতৃশক্তি 'সর্বভূতেষু সংস্থিতা', তাঁর সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভাষাতেই বলা যায়—

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।"

মাতৃশক্তি, ভূগর্ভস্থিত বৃক্ষের মূলের মত, তখনও অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত থাকিয়া যায়, যখন সন্তানের নাম যশ দেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"Hands that rock the cradle, rule the world" অর্থাৎ যে-হাত ছেলের দোলনা দোলায়, সেই হাত ই সন্তানদের মাধ্যমে জগৎ চালায়।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ 'রুমি'-র একটি কবিতার অনুবাদে বলিয়াছেন—

পবনের মত তুমি ভগবন্
আমরা পবন-ধুনিত ধূলি
পবনেরে কেহ চক্ষে দেখেনা
দেখে চঞ্চল কণিকাগুলি।
তুমি ঋতুরাজ বিরাজিছ তাই
আমরা এসেছি পুষ্প-পাতা
ঋতুরাজে কেহ চক্ষে দেখেনা
দান দেখে লোকে দেখেনা দাতা॥

আমরা কেবল ফুল ফল দেখিয়া ধন্য ধন্য করি, কিন্তু যে ফলভারনম্রা ব্রততী বল্লরী তাহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন—তাহাদিগকে স্মরণ করি না—নারিকেল আহরণ করিয়া পিপাসা মিটাই, কিন্তু যাঁহার স্নেহধারা নারিকেলের মধ্যে রস সঞ্চার করে তাঁহাকে স্মরণ করি না।

প্রতিপাদপের পাদমূলে মূলের মত মাটির নিম্নে নিহিত থাকিয়া সেই মাতৃশক্তি ভূগর্ভ হইতে প্রাণরস সংগ্রহ করে, এবং সুফল ধারণের জন্য অহরহঃ তপস্যানিরত থাকে।

ইংরাজিতে কোনো মনস্বী লিখিয়াছেন—"God could not be present everywhere and therefore He made mothers অর্থাৎ শ্রীভগবান তাঁহার করুণাময়রূপে সর্বত্র থাকিতে না পারিয়া যেন তাঁহার প্রতিভূরূপে এই মাতৃ-জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সে জন্যই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সেই মাতৃশক্তিকে বারংবার প্রণাম নিবেদন করা হইয়াছে,—

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

ভারতের সংস্কৃতি

"সংস্কৃত" অর্থে,—মার্জিত, নির্মলীকৃত, শোধিত। সুবর্ণের অগ্নি সংস্কারে তাহার মলিনতা নষ্ট হওয়ায় সুবর্ণ যেমন বিশুদ্ধ উজ্জ্বল এবং ভাস্বর হয়, সংস্কৃতি বা সংস্কারের ফলে ব্যক্তি, বস্তু, মানব-সভ্যতা ও সমাজও তেমনি নির্মল উজ্জ্বল এবং উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সংস্কৃত ভাষা :—প্রাচীন ভারতের বৈদিক দার্শনিক, পৌরাণিক তথা সাহিত্যিক ভাষা মার্জিত অলংকৃত সুসংবদ্ধ ও পারিপাট্যসম্পন্ন—এবং সে জন্যই উহাকে 'সংস্কৃত' ভাষা বলা হয়।

বস্তু সংস্কার, পথঘাট সংস্কার বা ইষ্টাপূর্তাদি এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমার বক্তব্য।

সংস্কৃতির তারতম্য :—মানুষ সংস্কৃত না হইলে তাহাকে পতিত, বন্য, বর্বর বা ব্রাত্য বলা হয়। 'ব্রাত্য' অর্থাৎ 'ব্রতং অতীত্য তিষ্ঠতি। সংস্কৃত হইবার জন্য যে যে ক্রিয়া কর্মপদ্ধতি বা ব্রতাদি তাহাই সংস্কার। সে জন্যই বলা হয়—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

এই জ্ঞান-তারতম্যের জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি দ্বিজ,—এবং এবম্বিধ জ্ঞান বা সংস্কারের অভাবে শূদ্র এইরূপ শ্রেণী বিভাগ প্রাচীন ভারতে করা হয়।

সংস্কার অনুযায়ী দ্বিজ বা শূদ্র আখ্যা দেওয়া হইত। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভ হইতে—দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন সংস্কার হইতে গণ্য করা হইত। "প্রথমং মাতৃগর্ভাৎ স্যাৎ দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।"

অতঃপর "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্যং দয়ার্জবং"—এবং আহার শুদ্ধি প্রভৃতি সংযমাভ্যাসের ফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইত। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ"—এইরূপ শুদ্ধি ও সংস্কারের ফলে—"ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ"—আত্মা দেহ মন বুদ্ধি ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের উপযোগী হয়।

দশবিধ সংস্কার :—জাতকর্মের পূর্ব হইতেই এই সংস্কারের বিধান ছিল। যথা গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ।"

পুরাকালে আর্যকুমারীগণেরও উপনয়ন সংস্কার হইত। যথা বৌধায়ন সূত্রে—"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জিবন্ধনমিষ্যতে অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা" তাঁহারাও কুমারগণের ন্যায় শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিতা হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীও হইতে পারিতেন এবং ব্রহ্মতত্ত্বে নিষ্ণাত হইতেন।

উপনয়ন সংস্কার হইতেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের আচরণ আরম্ভ হইত—দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ—পূজোপাসনা, ঋষিযজ্ঞ—শাস্ত্রপাঠ, পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ তর্পণাদি, নৃযজ্ঞ—অতিথিসেবা, ভূতযজ্ঞ—জীবকে অন্নদান।

আহার ও আচার :—আহারে এবং আচারে সতত সাবধান হওয়ার অনুশাসন ছিল। কারণ "আচার প্রভবো-ধর্মঃ। আহার সম্বন্ধেও একই কথা। ক্ষুধাকে বৈশ্বানর অগ্নি বলা হয় (গীতা ১৫।১৪) নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি ভূতযজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। তাই আহারের প্রথম পঞ্চগ্রাস পঞ্চপ্রাণকে আহুতি দেওয়া হয়। প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি বলিয়া।

ভোগ ও ত্যাগ :—এই আহুতি বা উৎসর্গ প্রসঙ্গে 'স্বাহা' মন্ত্রটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইহার ব্যুৎপত্তি :—স্ব + আ + হু + ড + আ অর্থাৎ স্বং বা আত্মানম্ অর্থাৎ নিজেকেই আহুতি দিলাম। নিজের অহমহমিকা অহং মমত্ব প্রভৃতি অভিমান সহ। তাহার মন্ত্র ছিল—"মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্… সমর্পয়ামি স্বাহা"।

ঐহিক জীবনে সংস্কৃতির সাধনায় এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠায় ভোগের স্থান অবশ্যই আছে, কিন্তু সে ভোগ সংকীর্ণ স্বার্থের অন্বেষণ বা পরস্বাপহরণ করিবে না, বৃহত্তর জীবনাদর্শে ত্যাগের মুখে ভোগ করিবে। তাই বিধি ছিল—যজ্ঞ সম্পূর্তির পর যজ্ঞাবশেষ হোতা গ্রহণ করিবেন। অধ্যাত্ম শক্তির স্ফুরণ ভোগের মুখে হয় না, কারণ ভোগের দ্বারা বুভুক্ষারই বৃদ্ধি হয় ভোগাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। তাই শ্রুতি বলেন, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" (ঈশোপনিষৎ)।

প্রকৃতি, বিকৃতি ও সংস্কৃতি :—'সংস্কৃতি' শব্দের অর্থ এবং বিনিয়োগ বুঝিতে হইলে 'প্রকৃতি' ও 'বিকৃতি' শব্দ দুইটির অর্থও প্রণিধানযোগ্য। প্রাণী মাত্রেই ক্ষুধা পাইলে খায়, মানুষও ক্ষুধা পাইলেই খায় সুতরাং ক্ষুধা পাইলে খাওয়া প্রাণী মাত্রেরই প্রকৃতি, মানুষেরও। কিন্তু মানুষ অখাদ্য খায়—বিকৃত রুচি-বশতঃ গর্ভবতী নারী মাটি খায় এবং শিশুরাও খায় (Geophagy) ক্ষুধা না পাইলেও খায় এবং ক্ষুধার অতিরিক্তও খায়—ইহার নাম 'বিকৃতি'।

তাই আচার্য্য বিনোবাজী বলেন যে, যখন মানুষ ক্ষুধার্তকে খাওয়াইবার

জন্য নিজে উপবাস করে, নিজের মুখের গ্রাস নিঃসম্পর্ক অনাত্মীয় অতিথিকে তুলিয়া দেয় তখন তাহা হয় তাহার 'সংস্কৃতি'। 'সংস্কৃতি' কখনও মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। (ভূদানযজ্ঞ ২২শে মার্চ ১৯৫৮ পৃঃ ৫১)

ভারতের ভেদ ও ঐক্য :—ভারতে জাতিভেদ প্রথার প্রতি পাশ্চাত্যদেশীয়েরা অনেকে কটাক্ষ করেন, কিন্তু এক বিষয়ে ভারত অগ্রসর, ইয়ুরোপ অনগ্রসর। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন। এখানে ঐতিহ্য-পূর্ণ ও শক্তি সম্পন্ন দশ-বারটি ভাষা প্রচলিত আছে। তথাপি বিভিন্ন প্রদেশে ধর্মের মাধ্যমে এক ভারতীয় রাষ্ট্রবোধের স্বীকৃতি আছে। কেহই এ কথা বলেন না যে রাজ্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র হউক। অথচ এই প্রদেশগুলি ফ্রান্স জার্মানী, ইটালী, গ্রাস, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম-এর তুলনায় ক্ষুদ্র নহে। 'বল্কান'-ষ্টেটগুলি পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় ইংরাজীতে একটি নূতন শব্দই উদ্ভূত হইয়াছে 'Balkanisation'; সুতরাং কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্যন্ত এই ভারতীয়তার বোধ, সাজাত্য ও সাধর্ম্যের বোধ, ইহা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলিতে হইবে এবং ইহা তাহার প্রাচীন সংস্কৃতি প্রসূত।

সত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতি :—সনাতন সত্যের সর্বব্যাপী রূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হইলে মহাত্মা গান্ধী বলেন, "One must be able to love the meanest creation as oneself" অর্থাৎ "আত্মোপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ" তিনি আরও বলেন,

"A man, who aspires after that, cannot afford to keep out of any field of life. That is why my devotion to truth has drawn me into the field of politics, and I can say, without the slightest hesitation, and yet in all humility, that those who say that religion has nothing to do with politics—do not know what religion means."

ভারতের 'ধর্ম' ও ইংরেজী 'religion' এক বস্তু নহে—মহাত্মাজী ভারতীয় ব্যাপক অর্থেই 'religion' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা মনুষ্য সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করিয়া আছে তাহাই 'ধর্ম'।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য :—সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফলে সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য থাকিলেও প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক দেশেরই আপন আপন বিশিষ্ট সত্তা আছে। এই

বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠে সেই সেই দেশের আপন আপন বিশেষ পরিবেশে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে, ভৌগোলিক পরিস্থিতির সঙ্গে, ইতিহাসের ধারা এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে চলিতে প্রত্যেক মানবগোষ্ঠী এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, আপন সহজাত স্বভাব, শিক্ষা এবং সাধনায়, তাহার সমষ্টিগত সিদ্ধির উত্তরাধিকার সূত্রে।

সংস্কৃতির ঐতিহ্য :—আবহমান অতীতের ঐতিহ্যের প্রভাব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সকল জাতির পক্ষে, অশুভ এবং অশোভন তাই ভাগবত বলেন, "আজীবৈাকতরং ভাবং যস্তন্মমুপজীবতি ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারং নার্যসতী যথা।" যদিও মানুষের সঙ্গের দ্বারা মানুষ যেমন প্রভাবিত হয়, সেইরূপ এক জাতির সম্পর্কে—অপর জাতি,—এক সভ্যতার সংস্পর্শে অপর এক সভ্যতাও অবশ্যই প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত হয়। ভারতবর্ষও এইরূপ অসংখ্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছে যথা :

"কিরাতহূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশাঃ।
আভীর শুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ॥

ইহাদের সংস্পর্শ এবং ইহাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিরও পরিচ্ছদ পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

খাদ্যের পরিপাকের ফলে যেমন মানুষের শরীর পুষ্টিলাভ করে সেইরূপ আবহাওয়া, আহার্য ও পানীয়ের ফলে জাতির দেহ গঠিত হয় এবং শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফলে জাতির চিন্তা ও ভাবধারাও এক বিশিষ্ট প্রণালীতে প্রবাহিত হয়। 'বিজ্ঞান'—বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের অনুশীলনপরায়ণ এবং 'দর্শন' বিভিন্ন জ্ঞানের সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিতে, তাহাদের শাশ্বত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে এবং তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে যত্নবান।

ভাবী ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির সৌধ—নির্মাণ করিতে হইলে তাহার 'প্ল্যান' বা পরিকল্পনা একটি বিরাট অট্টালিকা নির্মাণের প্রণালীতেই করিতে হইবে। বৃহৎ অট্টালিকা গঠন করিতে হইলে তাহার ভিত্তি যেমন সুগভীর হওয়া প্রয়োজন, এবং সেই ভিত্তি দৃঢ়ভূমি বা প্রস্তর-কঠিন মালভূমির উপর স্থাপিত হইলে তাহা যেরূপ স্থায়ী হয়, সেইরূপ জাতির ভিত্তিস্থানীয় জাতীয় চরিত্র যদি নৈতিক বল এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়,— তাহা হইলে সেই জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং উৎকর্ষ অবিধ্বংসী হইয়া থাকে।

প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকাও যদি বালি বা নমনীয় ভূমির উপর নির্মিত হয়, তাহা হইলে অচিরেই তাহার খিলানে ফাট ধরে, ভিত্তি বসিয়া যায় এবং কালক্রমে অট্টালিকাও ধ্বসিয়া যায় এবং তাহার প্রস্তরাদি খসিয়া পড়িয়া গৃহবাসীর প্রাণহানির কারণ হয়।

জাতীয় চরিত্র :—দেশের এবং জাতির সাধনায় কোন উচ্চতর বা বৃহত্তর পরিকল্পনা থাকিলে জাতির মেরুদণ্ডরূপ নৈতিক চরিত্রের উন্নতি এবং উৎকর্ষ বিধান না করিলে সমস্ত আশা ও কল্পনা—মরীচিকায় পর্যবসিত হয়।

সংস্কার বা সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইল শুদ্ধিজনক কার্য। এই সংস্কৃতি নির্ভর করে মানুষের সভ্যতাজনিত উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের উপর। পূর্বেই বলিয়াছি যে সংস্কারের অর্থ নির্মলীকরণ—জীর্ণোদ্ধার সাধন, মার্জন শোধন প্রোক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা পরিষ্কারকরণ প্রভৃতি বুঝায়। সংস্কৃতির এই অংশটি negative অর্থাৎ বর্জন বা ব্যবকলনের দিক। অন্য অংশটি positive বা ধনাত্মক তাহা অর্জন, সংযোজন বা সংকলনের দিক।

বর্জনের দিকে পড়িবে, দোষ দূর করা—অর্থাৎ যথাসম্ভব এবং যথাসাধ্য দোষ পরিহারপূর্বক জীবনকে নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক এবং নির্মল করা।

অর্জনের দিকে পড়িবে,—সত্য, ক্ষমা, ত্যাগ, আত্মসংযম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, শুচিতা, পৌরুষ এবং উদারতা প্রভৃতি গুণকে নিষ্ঠার সহিত—আশ্রয় করা।

গীতার ষোড়শাধ্যায়ে—বর্জনীয় দোষগুলিকে আসুরী সম্পদ এবং অর্জনীয় গুণগুলিকে দৈবী সম্পদ বলা হইয়াছে। এবং বলা হইয়াছে—"দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা"। অর্থাৎ আত্মা দেহ এবং মনকে সংস্কৃত পরিশুদ্ধ নির্মল এবং নির্মুক্ত করিতে হইলে চাই দৈবীসম্পদ এবং আপন সত্তাকে পৃথিবীর আবিলতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতার দ্বারা আষ্টে পৃষ্ঠে আবদ্ধ করিতে হইলে চাই আসুরী সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত তথাকথিত সম্পদগুলি মানুষের সর্ববিধ অগ্রগতির অন্তরায় এবং সকল বিপদের কারণ।

ব্যক্তি বা ব্যষ্টির পক্ষে যে কথা সত্য, সমষ্টিগতভাবে জাতির পক্ষেও সেকথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

সভ্যতা ও শিক্ষা :—ইংরাজীতে—Civilization বলিতে বুঝায় culture, refinement of feelings taste & manners, from crudeness, coarseness and vulgarity, এবং তাহার সহিত development of arts & science, embellishment of mind & intellect, চিন্তাশীল

ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে এই সভ্যতা প্রধানতঃ বাহ্য বা ব্যবহারিক সভ্যতা। প্রকৃত সভ্যতা অর্জন করিতে হইলে দৈবীসম্পদ অর্জন এবং চরিত্র গঠন ব্যতীত হইতে পারে না। বর্তমান সভ্যতার ফলে বিভিন্ন দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা যে দৃশ্য দেখিতে পাই তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সভ্যতার রেশমী পোষাক পরা মুখোস-ঢাকা বর্বরতা। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন,

"দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ?"

তাহার ছবি আমরা আলোকচিত্রে দেখি, ডিটেকটিভ্ গল্পে পড়ি এবং প্রত্যেক দিনের সংবাদপত্রে ফৌজদারী আদালতের বিবৃতিতেও তাহার নগ্নরূপ দর্শন করি।

সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক :—ইদানীং যে কয়জন মহাপুরুষ ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী ও বিনোবাজীর নাম অবশ্য স্মরণীয়। ইঁহারা সকলেই ভারতের এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

সঙ্কীর্ণতা :—সর্ববিধ সংস্কৃতি এবং অগ্রগতির পথে মহান্ অন্তরায়। সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে নিজের চতুর্দিকে প্রাচীর তুলিয়া, কূপমণ্ডুকের মত তাহাকেই জগৎ মনে করিলে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা করা হইবে। বিশ্বকে উপলব্ধি করিয়া 'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে'—বিশ্বকে আমন্ত্রণ করিয়া—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্" এইরূপ 'বিশ্বভারতী' নির্মাণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বিশ্বকবি হইয়াছেন।

জাতীয়তার প্রয়োজন ও সীমারেখা :—যতদিন কোনও দেশ বা জাতি পরপদানত থাকে ততদিন তাহার সঙ্কীর্ণ অর্থে 'জাতীয়তা বা patriotism বা nationalism'-এর মুখ্যত: প্রয়োজন আছে, নচেৎ জাতীয়তার নামে ইতিহাস যে অত্যাচার, অনাচার এবং শোণিতস্রাবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "Nationalism is a cruel epidemic that is sweeping over the world and eating its moral vitality" গত মহাযুদ্ধে অ্যাটম বোমা দ্বারা (৬ আগষ্ট ১৯৪৫) হিরোসিমা-নাগাসাকিতে অন্যূন ২ লক্ষ নিরীহ নর-নারীর হত্যা, ইতিহাসে চিরদিন রক্তাক্ষরে লেখা থাকিবে।

স্বাধীনতার অর্জন, পালন এবং রক্ষার জন্যই জাতির এই গণ্ডী দিয়া আত্মরক্ষার প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে এবং ততদিন থাকিবে যতদিন না— United Nations তাঁহাদের সমষ্টির প্রতিভা সংযোগে—এক সম্মিলিত অখণ্ড জগৎ বা One world-এর পরিকল্পনাকে শাশ্বতিক শান্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। বিশ্বমানবতা বোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ গদ্যে পদ্যে পত্রে এবং প্রবন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতা বোধের মূর্ত প্রতীক। তিনি দেশের মাটিকে প্রণাম করিয়াছেন—

"হে আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা—
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।'

তাঁহার 'ব্যাধি ও প্রতীকার', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি অসংখ্য প্রবন্ধ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃতি ও উদারতা :—সাহিত্য সৃষ্টির পথেও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি মানুষের মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ করে, তাহার সৃজনী প্রতিভাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। চিত্র, সঙ্গীত, ললিতকলা ও ভাস্কর্য সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূলভিত্তি,—উদারতা, সার্বজনীনতা এবং বিশ্বমৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই আমরা শিখিয়াছি—

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্—
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥

তাই এখানে "সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ", অতিথি সর্বত্র গুরু এবং বরণীয়। "সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"—সর্বভূতে সমদৃষ্টি লাভ হইলেই ঈশ্বরে পরাভক্তি লাভ হয়। "শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।"

সংস্কৃতি ও ধর্ম :—ধর্মের প্রসঙ্গেও এই উদারতা অবশ্য প্রযোজ্য। বৈদিক ঔপনিষদিক ধর্ম, গীতায় প্রচারিত ধর্ম, যে ধর্মের উপর রামমোহন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকেরা জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা মানুষের ব্যক্তিকে বা ব্যষ্টিকে সম্মান এবং স্বীকৃতি দান করিয়া তাহার উপর সমষ্টিকে—অর্থাৎ সমাজকে—তথা জাতিকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। ব্যক্তি মানুষ যে 'নর', সে নারায়ণেরই প্রতীক। শ্রুতি বলেন, "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

তুলসীদাস বলেন, "সব ঘট বিরাজে রাম।" বিবেকানন্দ বলেন, "জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন পূজিছে ঈশ্বর।" ভাগবত বলেন,

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
হিত্বাঽর্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥

সর্বভূতস্থ পরমেশ্বরকে ত্যাগ বা অবহেলা পূর্বক যে মূর্তি-পূজা করে সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালিয়া হোম করার মত পণ্ডশ্রম করে। মহাভারত বলেন, "ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"।

ইহাকেই চণ্ডিদাস তাঁহার অনবদ্য কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

এই প্রসিদ্ধ শ্লোক 'জয়' শব্দটির অর্থে সাধারণ জয় বা বিজয় মাত্র নহে 'জয়' শব্দের অর্থে রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি ধর্ম শাস্ত্রকে বুঝায় যাহা পাঠ বা অনুশীলন করিলে আমরা সংসার 'জয়' করিতে এবং সংসারের বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ হই।

ধর্মান্ধতা :—ধর্ম এবং সমাজের গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'অচলায়তন'কে রূপ দিয়াছেন। এই মূঢ়তাকে ভৎসনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন :

"আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটাইয়াছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করেছি। স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করেছি এবং সকল প্রকার বুদ্ধি যুক্তিকে লঙ্ঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে।" (শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায় উদ্ধৃত পত্র—২০শে আষাঢ় ১৩১৭। সংহতি পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ দ্রষ্টব্য)

মহাকবি দেশের জড় বুদ্ধিকে কশাঘাত করিয়া মানবতার প্রতি মমত্ববোধ জাগাইতে চাহিয়াছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি যখন বহু সহস্র বৎসরের অসংস্কার এবং পরাধীনতা নিবন্ধন অবসাদের ফলে, আপন সংস্কৃতির শস্য ত্যাগ করিয়া তুষমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিল, যখন ভারত সন্তান আপন শোণিত স্রাব করিয়া বিদেশীয় জলৌকার

পুষ্টি সাধন করিতেছিল, ধর্ম যখন 'বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ী'র প্রথায় পাকশালায় প্রবেশ করিয়া নিজের 'পাক' (!) বা পবিত্রতা রক্ষা করিতেছিল, তখন সংস্কৃতির ঘোর দুর্বিপাক উপস্থিত হইয়াছিল। তাই এই যুগন্ধর পুরুষেরা মিষ্ট রুষ্ট নানাবিধ মিঠে-কড়া বচনে জাতির আরোগ্যার্থে আঘাত-চিকিৎসায় (shock treatment) ব্রতী হইয়া তাহার অপ্রকৃতিস্থতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রকৃত ধর্ম :—মৌলিক অর্থে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক এবং উদার। "ধারণাদ্ধর্ম ইত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। যঃ স্যাৎ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।" অর্থাৎ ধর্মই সমাজ এবং জাতিকে ধারণ করিয়া তাহাদের একতা ও সমগ্রতা (integrity) রক্ষা করে। ইহাই ভারতের প্রকৃত ধর্ম।

ধর্ম এবং সঙ্গ :—শ্রীরামকৃষ্ণ 'চারাগাছে'র উপমা দিয়াছেন। তাহাকে যেমন বেড়া দিয়া বাঁচাইতে হয় চতুষ্পদের বুভুক্ষু আক্রমণ হইতে—তেমনি করিয়া কোমল এবং নমনীয় শৈশবের অপরিণত অবস্থায় মানুষের তথা জাতির চরিত্রকে রক্ষা করিতে হয় কতকগুলি অবশ্য পালনীয় সংযম নিয়মের অনুবর্তিতায়। 'দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ',—কারণ মানুষের মনের সহজাত ষড়রিপু দুঃসঙ্গ পাইলে অগ্নির ন্যায় ঝটিকার সংযোগে অদম্যশক্তি লাভ করে, তাই দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, "তরঙ্গায়িতা অপি ইমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তে।" কিন্তু এ সমস্ত কথা দুঃসঙ্গের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহা কোনও জাতি বা ধর্ম বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে। এখন শৈশবের বেড়া অতিক্রম করিয়া নওযোয়ান স্বাধীন ভারত বিশ্বজগতের সহিত করমর্দন করিয়া, লাভবান হইতেছে এবং হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

জাতি এবং বর্ণ:—আমাদের সমাজের স্মার্ত ব্যবস্থায় 'জাতি' এবং 'বর্ণ'-কে এক পর্যায়ে ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয়ের জাতি এবং বর্ণ পাইলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিভাগের সুবিধা হয় বলিয়া। কিন্তু জাতি ও বর্ণ এক বস্তু নহে। 'বর্ণ'—গুণ কর্ম বিভাগের উপর নির্ভর করে। অভিধানে এখনও দেখা যাইবে 'জাতি ব্রাহ্মণ' অর্থে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, যাহার জন্মলব্ধ জাতিই একমাত্র পরিচয়। 'সংস্কার' লাভ করিয়া সে দ্বিজও হয় নাই, বেদ পাঠ বা জ্ঞানলাভ করিয়া সে ব্রাহ্মণও হয় নাই। ভগবান বুদ্ধ, তাঁহার ধর্মপদে, 'ব্রাহ্মণবর্গে'—ব্রাহ্মণকে যে সকল গুণের পরিচয়ে নমস্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই ব্রাহ্মণের প্রকৃত পরিচয়।

পঞ্জিকায় বলে অমুক সময় জন্ম হইলে অমুক 'বর্ণ' হইবে এবং সেই হিসাবে কোষ্ঠীতে উল্লেখ করা হয় এবং জাতি নির্বিশেষে ব্রাহ্মণাদিকেও ক্ষত্রিয় শূদ্রাদি বর্ণে পরিচায়িত করা হয়।

ফলিত জ্যোতিষ:—যদিও 'বর্ণ' এবং 'জাতি'র পার্থক্যের প্রামাণ্য হিসাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই প্রথা উল্লেখ করিতেছি, তথাপি এই প্রসঙ্গে বলা অবশ্য প্রয়োজন যে, ফলিত-জ্যোতিষ, জ্যোতিষীর অর্থাগম এবং অন্ন সংস্থানের জন্যই রচিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ যতই অন্ধকারপূর্ণ, ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য মানুষের কৌতূহলও সেই পরিমাণে উগ্র। সেই কারণে, সেই দুর্বলতার ফলেই, ফলিত জ্যোতিষ প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, নচেৎ জন্মলগ্নের উপর নির্ভর করিয়া কোষ্ঠী-বিচার এবং বিবাহের যোটক বিচার এক অন্ধ-কুসংস্কারের পরিণাম এবং প্রতিফল মাত্র। এই কুসংস্কার প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অবিলম্বে দূর করা কর্তব্য নচেৎ উঠিতে হাঁচি, বসিতে টিকটিকি এবং যাইতে অশ্লেষা-মঘার ভয়ে ভীত জাতি—যে তিমিরে সেই তিমিরেই চিরদিন থাকিবে। দৈনিক পত্রিকায় "এ সপ্তাহ কেমন যাইবে" অদ্যাপি এই কুসংস্কারের পরিচয় এবং প্রশ্রয় দিতেছে।

গীতার "চাতুর্বর্ণ্য":—বর্ণ এবং জাতি যে একার্থব্যঞ্জক নহে, এবং গীতার গুণকর্ম বিভাগ অনুসারেই যে একদিন জাতির নির্ণয় হইত, তাহা ভাগবত হইতে এবং মহাভারতের যুধিষ্ঠির নহুষের কথোপকথন হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন:

> যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসাং বর্ণাভিব্যঞ্জকম্
> যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের গুণ যদি অন্যত্রও দেখা যায় তাহা হইলে সেই গুণের দ্বারাই সেখানে বর্ণের নির্দেশ করিতে হইবে।

সত্যকামের উপাখ্যান এবং পুরাণের বিভিন্ন উপাখ্যানও তাহাই প্রমাণ করে। অনুলোম বিলোম বিবাহেও বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মধ্যে শোণিত সংমিশ্রণের প্রমাণ ইতিহাসে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের সমগ্র বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ স্পঞ্জের মত স্বশরীরে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। তাই আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, 'শক হুন দল পাঠান মোগল' এখানে এক দেহে লীন হইতে পারিয়াছে।

জাতি ও সংস্কৃতি :—রামমোহন এই জন্মগত জাতিবাদকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 'কুসংস্কার' কঠিনপ্রাণ, একবার তাহার শিকড় বা মূল বাড়িলে তাহাকে উন্মূলন করা সুকঠিন। তবে সময়ের গতি, বিজ্ঞানের প্রগতি এবং স্বাধীনতার পরে জাতীয় সংবিধান ও বিবাহ আইন প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলে লোকে এখন পূর্বোক্ত মনস্বীদের উপদেশেরপ্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান হইতেছে ইহা মঙ্গলের কথা।

বিজ্ঞানের প্রভাব—বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন দেশের দূরত্ব দ্রুতবেগে দূর হইয়া যাইতেছে; বৎসরের পথ দিনে অতিক্রান্ত হইতেছে। পৃথিবীর উভয় গোলার্ধ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক তথা ব্যাবসায়িক আদান-প্রদানে ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতা লাভ করিতেছে।

বিশ্বমৈত্রী ও রবীন্দ্রনাথ :—এরূপ অবস্থায় অনেক প্রকার বৈষম্য দূর হইতেছে, তেমনি আবার নানাবিধ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অশান্তি, জিগীষা ও হিংসা উপস্থিত হইতেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"The human world is made one, all the countries are losing their distance everyday, their boundaries not offering the same resistance as they did in the past age. Politicians struggle to exploit this great fact and wrangle about establisning trade relationships. But my mission is to urge for a world-wide commerce of heart and mind, sympathy and understanding and never to allow this sublime opportunity to be sold in the slave markets for the cheap price of individual profits or be shattered away by the unholy competition in mutual destructiveness." (Paris May 3, 1930).

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই কামনা করিয়াছেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে মৈত্রী এবং মিলন, মন বুদ্ধি অন্তঃকরণ এবং আন্তরিক সহানুভূতির মাধ্যমে। অর্থাৎ "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে,—এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।" ভারতের সংস্কৃতিও এই মিলনের প্রস্তুতির জন্য সাধনা করিয়াছে —মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা প্রভৃতি উদার সদ্‌গুণাবলী।

পশ্চিমের কবি Rudyard Kipling বলিয়াছেন, "The east is east,

the west is west, And the twain shall never meet." অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিমের মিলন অসম্ভব। ভারতীয় সংস্কৃতির রাজদূত রবীন্দ্রনাথ এই অসম্ভবকে তাহা সত্ত্বেও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি :—ভারতীয়সাহিত্যের মূলকথা রসসৃষ্টি। এই রসকে বলা হইয়াছে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ'। ব্রহ্ম রসস্বরূপ 'রসোবৈ সঃ।' সেই রসস্বরূপের আস্বাদন হয় সাহিত্যের মাধ্যমেও। অর্থাৎ শব্দ-ব্রহ্মের মাধ্যমে রস-ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন, "একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্‌ভবতি।" হর-পার্বতীর মত এই শব্দের সহিত ও বাক্যের সহিত অর্থ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, কালিদাস বলিয়াছেন, "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ", শক্তির সহিত শক্তিমানের মত, অগ্নির সহিত তাহার দাহিকা শক্তির মত—অন্যোন্যাশ্রয়ী এই সম্পর্ক। সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের সাধনাও ভারতীয় সাহিত্যের ত্রিপথগামী ভাগীরথীর ধারা যাহা ভাবসমুদ্রে মিলিত হইয়াছে।

সাহিত্যে—বিশেষতঃ কাব্যসাহিত্যে বাক্য এবং অর্থ, ধ্বনি এবং ছন্দ ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন এবং তাহাই ভারতীয় কাব্যের সম্পদ এবং আদর্শ।

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যোব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ ॥

এবং,—ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন রসো ভাববর্জিতঃ
পরস্পরকৃতাসিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ ॥

সাহিত্য এবং দর্শনঃ—উভয়েরই লক্ষ্য প্রকারান্তরে একই। দুঃখ দূর করা এবং আনন্দ লাভ করা। এই সুখবাদ (hedonism) পবিত্রতর, উন্নততর এবং সাধারণ সুখবাদ হইতে মহত্তর এবং উজ্জ্বলতর। হিতবাদ এবং সুখবাদ পাখীর দু'টি ডানার মত। উভয়পক্ষে ভর করিয়া কাব্য কল্পলোকে উড্ডীন হয়, শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়ের মিলিত শক্তির যোগে।

সাহিত্য শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যায় এই অর্থের সমর্থন। 'সাহিত্য' শব্দে এক সংসর্গ, একক্রিয়ান্বয়িত্ব বা বৈদিক ভাষায় সমাম্নায়ত্ব সূচিত হয়। 'সহিত' অর্থে সংযুক্ত বা সমভিব্যাহৃত। তাই বৈদিক প্রার্থনায় পাই 'সহনাববতু' ইত্যাদি শ্রুতিতে সকলে এক সঙ্গে পালিত, শিক্ষিত, বীর্যবান, তেজস্বী এবং ঈর্ষাহীন হইবার সম্মিলিত প্রার্থনা।

'হিত' শব্দের অর্থ—যোগ্য, পথ্য, উপকারক, প্রিয়। এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে ব্রহ্মাস্বাদের উল্লেখ করিয়াছি। ইহার অর্থ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন:

"ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।"

তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিভূ বা প্রতিনিধিস্বরূপ ক্রান্তদর্শী, মহাকবি। তাঁহার ঋষিচেতনা কবিদৃষ্টির দ্বারা উদ্ভাসিত। সাহিত্যের সুখবাদও সেই অমল্ল ভূমানন্দের আস্বাদকামী। 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্'। আগুনের পরশমণির' দ্বারা তিনি baptism of fire লাভ করেন। তিনি 'সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে' —অন্তর দেবতায় আরতি করেন। সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে তাঁহার বাঁশি 'যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল' এবং মাধুর্য রভসে উন্মত্ত হইয়া মন্দ্রিত হয়। দুটি নয়ন মেলে অপরূপকে দেখে যাওয়ার যে অলৌকিক আনন্দ, তাহাতেই তাঁহার অন্তর হয় পরিপ্লুত এবং 'ভাব হতে রূপে অবিরাম' চলে তাঁহার 'যাওয়া আসা'।

সাহিত্যিকের দর্শন Dialectic materialism নহে, antihumanic religion নহে, antireligious humanism নহে, egoistic hedonism-ও নহে কারণ ইহা ব্যক্তিগত সুখবাদ নহে। কবি বলেন, "অপরূপ আনন্দের ভার, বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার।" ইহা ব্যক্তিগত নহে যেহেতু কবির প্রসাদ যে গ্রহণ করে সে-ই এই অপরূপ আনন্দ-বেদনা আস্বাদ করে। ইহাকে আইন-ষ্টাইনের কথায় cosmic religious consciousness অথবা অঙ্কশাস্ত্রের ভাষায় an L. C. M of science, philosophy and religion বলা যায়।

সাহিত্যে মানবধর্ম:—religion শব্দটির ব্যুৎপত্তি হয় 'ligo' to bind হইতে। যাহা প্রত্যেক নর-নারীকে জাতিগত বন্ধন ছাড়াও অভিনব আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ করিয়া বিশ্বমানবকে একপরিবারভুক্ত করে, তাহাকে Religion of Humanity, devotion to human interests বা Humanism বলা হয়। ইহার দেবতাও নরাকৃতি পরব্রহ্ম। ইনি এই নূতন বন্ধনে আবদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত নিজের ভক্তগণের দ্বারা ভাবে ভাষায়, রূপে ও অরূপে পূজা গ্রহণ করেন। ইনি তিন পুরুষে মানুষ। আদিতে ইনি 'নরোত্তম' (বা গীতার পুরুষোত্তম) মধ্যে ইনি 'নর' এবং তত:পর ইনি নরের পুত্র (নর + অপত্যার্থে

ক্ষায়ণ) 'নারায়ণ'। এই Humanism-এর প্রণাম গীত হইয়াছে মহাভারতে—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্"। অর্থাৎ নরোত্তম বা apotheosised man, নর=average man এবং নারায়ণ বা progeny of man-কে প্রণাম জ্ঞাপন। এই নরোত্তমই গীতার পুরুষোত্তম এবং ভাগবতের ভগবান। দর্শনে ও সাহিত্যে রসবস্তু—ভারতীয় দর্শন, জগতের যিনি 'কারণং কারণানাং', তাঁহার পরিচয়-সূত্র করিলেন 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব"। তাহার পর এই অনির্দেশ্যস্বরূপ বস্তুটি সম্বন্ধে আর একটু আভাস দিলেন, বলিলেন তিনি আনন্দ স্বরূপ। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" এবং পরে বলিলেন, "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধা স্বন্দীভবতি, নন্দীভবতি অমৃতীভবতি।" বলিলেন, "স এব রসানাং রসতমঃ"। এই রসই সাহিত্যের ভূমা, অখণ্ড আনন্দ চিন্ময়স্বরূপ ইনি "কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি।"

"তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান ছড়াইছে দেশে দেশে।" কবি আশা করেন: "উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে দুঃখহীন নিকেতনে"। সে-নিকেতন হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না 'ন স পুনরাবর্ত্ততে' বা 'যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে'। সে-লাভ অপেক্ষা অধিকতর লাভ নাই সে-সুখ অপেক্ষা অধিকতর সুখও নাই। তাহা "বুদ্ধি-গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।" ভারতীয় সংস্কৃতির 'ধর্ম' ধারণাত্মক, গ্রহণাত্মক, সমন্বয়াত্মক। সমুদ্র যেমন "নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ" অচল-প্রতিষ্ঠ হইয়া শান্তভাবে গ্রহণ করে এবং আত্মসাৎ করে —ভারতীয় সংস্কৃতিও তদ্রূপ। 'যত মত তত পথ' বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মহিম্ন স্তোত্রও তাহাই বলেন—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

"ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ, কিন্তু এক গম্যস্থান। যে যেমন পারে ট্রেনে ইষ্টিমারে হোক সেথা আগুয়ান॥"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পার্থক্য:—পশ্চিম বলেন—চাহিদা বাড়াও—যত পাও তত নাও এবং আরও চাও। ভোগের দ্বারাই জীবন সার্থক হয়। ভোগ কর। ভারতবর্ষ বলেন, চাওয়া কমাও,—তাহা চাহিয়া কি হইবে যাহা দ্বারা

জীবনে অমৃতত্ব লাভ হইবে না। "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?" যেহেতু "হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।" কারণ চাহিয়া এবং পাইয়া জীবের অনন্ত তৃষ্ণা মিটিবার নহে। অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন, আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে ভোগ দিলেও তেমনি—"ভুয় এবাভিবর্দ্ধতে।" রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"এ কেবল দিনে রাত্রে
জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে"।

দর্শন ও কাব্য :—দর্শন প্রথমে নিম খাওয়াইয়া পরে চিনি দেয়। কাব্য প্রথম হইতেই মধুরাস্বাদ দেয়। তাই "কাব্যং হি দর্শনং হন্তি", যদিও উভয়েই দেয় চরমে পরম আনন্দ তাই সূত্রকার বলেন, "প্রয়োজনমানন্দঃ কাব্যস্য" "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" "মনোহারিণৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্।" তাহার মনোহারিত্বের কারণ, রস-মাধুর্য্য, ভাব-বৈচিত্র্য ছন্দঃ সৌন্দর্য্য এবং অলঙ্কার-সৌকুমার্য্য, যাহার দ্বারা কাব্য রসিক-জনকে আহ্লাদিত করে। তাই এক বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিলে পরে অন্য বেদব্যাস ভাগবত রচনা করিয়া চরিতার্থ হন;

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য :— ভারতবর্ষ উপলব্ধি করিয়াছে যে, প্রকৃত স্বার্থ লাভ হয় পরার্থপরতায়, তাই এখানে শ্রুতি বলেন, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ,' অর্থাৎ ত্যাগের মুখে ভোগ করিবে অর্থাৎ ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতে হইবে, ইহাই প্রকৃত আত্মপ্রসাদ। নচেৎ স্বার্থ সেবায় লোভই বাড়িয়া উঠে তৃপ্তি লাভ হয় না। তাই মহাকবি বলেন :

"স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে উঠে বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পূরিতে চায়!"

কারণ এই লোভ, এই কাম, 'মহাশনঃ' 'মহাপাপ্মা' মানুষের মহাবৈরী। চাহিয়া না পাইলে ইহা হইতেই ক্রোধ হয়, হিংসা হয়। যাহার ফলে আজ আমরা সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া দেখিতেছি "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।" ভারতবর্ষ শান্তিকামী, প্রত্যহ প্রতি অনুষ্ঠানে শান্তিমন্ত্র তাহার অবশ্য পাঠ্য "যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ।"

সমস্ত পৃথিবীর তর্পণ কামনা করিয়া ভারতবাসী নিত্য তর্পণ করে "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" ইহাই ভারতীয় দর্শনের, ভারতীয় সাহিত্যের, তথা সংস্কৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

রোগীকে নিরাময় করিয়া, অভুক্তকে অন্নদান করিয়া, দুঃখিতকে আনন্দ এবং ভীতকে অভয়দান করিয়াই তাহার আনন্দ। 'আত্মৌপম্যেন',—সর্বত্র সমদর্শনই তাহার দর্শনের শিক্ষা। আমরা এই শিক্ষা ও আদর্শ হইতে কত দূরে, পড়িয়া রহিয়াছি তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

ভারতবর্ষ বলেন, যাহা দেওয়া হয় তাহাই সার্থক হয়, যাহা না দেওয়া হয়, শুধু নিজের অযথা ভোগে বা বিলাসে ব্যয়িত হয়, তাহা ব্যর্থ হয়। "তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।"

ভারতবর্ষ ও কমিউনিজম্ :—আজকাল রুশিয়ার Communism-এর উদাহরণে অনেকেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে, তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর এবং শ্রেষ্ঠতর মতবাদ বহু পূর্বে ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে তাহারই বীজ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে রুশিয়াকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ভাগবত বলিয়াছেন : "যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম। অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥" নিজের ঠিক যতটুকু অবশ্য প্রয়োজন তাহার অতিরিক্তে যে লোভ করে সে তস্করের মত দণ্ডনীয়। নিজের আবশ্যিক প্রয়োজনটুকুই তাহার প্রকৃত স্বত্ব। এই বুনিয়াদের উপরই মহাত্মাজীর trusteeship বা ন্যাসরক্ষার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। যাহার নিকট উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত কিছু আছে তাহা তাহার নিকট ন্যস্ত আছে মাত্র। দেশের সঙ্কটমুহূর্তে তাহা অম্লান মুখে দান করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের চিকিৎসার আদর্শ :—মহান্ এবং লোকোত্তর। "নাত্মার্থং নাপি চার্থার্থম্ অথ ভূতদয়াং প্রতি"—চিকিৎসক চিকিৎসা করিবেন তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ বা কাম্য কামনা বা যশোলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, শুধু রোগীর প্রতি, আতুরের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া তাহারই দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য।

"কুর্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসাপণ্যবিক্রয়ং, তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে" যাহারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে পণ্যদ্রব্যের মত বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করে তাহারা কাঞ্চনরাশি ত্যাগ করিয়া ভস্মরাশির সমাদর করে।

ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান :—ভারতীয় আদর্শে নারী দেবীর মত পূজা পাইবার যোগ্যা। "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" চণ্ডীতে দেবী সমগ্র নারীশক্তির মধ্যে ওতপ্রোতরূপে প্রকাশিতা—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"। তাই বিবাহের মন্ত্রে দেখি "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব।"

ভারতের কর্মযোগ :—ভারতীয় আদর্শে জড়তা বা আলস্যের স্থান নাই। গীতা প্রত্যেক নরনারীকে নিয়ত কর্ম করিবার এবং স্বশক্তিতে শ্রদ্ধাবান হইবার প্রেরণা দিয়াছেন। "নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং" "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" জ্ঞানের দেবতা যে সরস্বতী তিনি এখানে "নিঃশেষজাড্যাপহা"।

ভারতের সাধক :—ভারতের ভক্ত সাধক স্বার্থলিপ্সাহীন, ভারতবর্ষের ভক্ত সাধকগণ নিজের সুখ, বা নিজের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের আদর্শ মহত্তম, তাঁহারা বলেন :

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্…আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদুঃখভাজাম্" (ভাগবত) তিনি ঈশ্বরের নিকট পরমা গতি প্রার্থনা করেন না। দুঃখশোকার্ত জনের বেদনার অংশভাগী হইতে চাহেন, যাহাতে তাহাদের দুঃখের কণামাত্রও লাঘব হয়।

উপসংহার : আজ কোথায় সেই আদর্শ ভারত, আর কোথায় আমরা পতিত ভারতবাসী। তথাপি মহাকবির ভাষায় বলিব, 'তা বলে ভাবনা করা চলবে না' সুতরাং "আগে চল, আগে চল ভাই।" গীতার ভাষায় বলিব, "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ"—কারণ "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ"। সুতরাং "কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।" সকলে আপন শক্তির সমস্তটুকু প্রয়োগ করিয়া 'আদর্শ'-সিদ্ধির জন্য যত্নবান হউন। স্বাধীন ভারত আদর্শনিষ্ঠ হইয়া যশস্বী হউক। ভারতবর্ষ নিখিলের মঙ্গল প্রার্থনা করে এবং সেই প্রার্থনার দ্বারাই এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করি :

"সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভবন্তু সুখিনো মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥"

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৬৬

ঘরের কথা

একদিন "London Life" এর প্রচ্ছদপটে দু'টী নারী মূর্ত্তির পদ-বিন্যাস ভঙ্গী দেখেছিলাম। বুঝি নাই যে সে তাণ্ডব না লাস্য, প্রচণ্ড না বীভৎস, কলা না শিল্প, লীলাবিলাস না যুদ্ধ বিগ্রহ।

বিজ্ঞাপনে—হাণ্ডবিলে, ক্যালেণ্ডারে, দেয়ালের গায়ে, বড় বড় পোষ্টারে, ফটোগ্রাফে, বায়োস্কোপে—সর্ব্বত্রই নারায়ণের মোহিনী মূর্ত্তির অতি আধুনিক সংস্করণের যে বিশ্বব্যাপী প্রসার দেখা যাচ্ছে, তাতে দেবাদিদেবেরও ধ্যান ভঙ্গ হয়—সুতরাং দুর্ব্বলচিত্ত কলির মানবের আর অপরাধ কি?

অন্যদিকে আবার কাব্যে তথা কথাসাহিত্যে তো আর নিষিদ্ধ ফলও নাই, নিষিদ্ধ সম্পর্কের বালাইও নাই। "বিবাহের চেয়ে বড়ো"—সম্পর্কে আবদ্ধ হবার জন্য অনেক সাহসী যুবক অগ্রসর হয়েছেন—এবং অনেক সাহসিকা সতীত্ব বস্তুটাকে—নারী-চিত্তের উপর পুরুষের প্রভাব বিস্তারের (exploitation) অছিলা মাত্র বলে, জাহির করতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

জীবনের পথে পথে বিজ্ঞানের হাজার বৈদ্যুতিক বাতির উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেছে। তার প্রভায় ভারতের শান্ত স্নিগ্ধ গৃহদীপগুলি আপাতদৃষ্টিতে বড়ই মলিন দেখাচ্ছে—তাই আজ অনেকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে সেই আলাদীনের ভাঙ্গা প্রদীপের পরিবর্ত্তে, নূতন প্রদীপ বিনিময় করে নিজেদের বড়ই লাভবান মনে করে নিচ্ছেন।

কিন্তু আজ শুধু দোষ ধরবার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু বলতে গেলে—আমার মনে হয়—তাতে নূতন করে দোষই করা হবে মাত্র, দোষের প্রতিবিধান করা হবে না। সময়ের যে স্রোত—আজ যে শক্তিতে বয়ে চলছে, তা'তে ঐরাবতও ভেসে যাবে—যদি সে প্রতিকূলতা কর্ত্তে চায়। কিন্তু এই স্রোতের মধ্যে থেকে, এই স্রোতের অনুধাবন ক'রে—একেই অবলম্বন ক'রে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীন শিশু অনায়াসে বিপরীত স্রোতে গমনাগমন করতে পারে। এই সত্য নিহিত আছে একটী হিন্দি দোঁহায়:—

—"উলট্ জলে মছ্‌লি চলে—বহি যায় গজরাজ।"

সমাজ সংস্কারের ঐরাবত শক্তি যেখানে বাধা দিতে পারে না—সেখানে সহানুভূতির দ্বারা, ক্ষীণশক্তি শফরীর মত বিপরীত পথে চল্‌বার—সম্ভাবনাটা নিতান্ত অসম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—বিপরীত পথে কেন চল্‌বো? Bioscope এর film এর মতো নয়নরঞ্জন বেশ ভূষা নিয়ে—সারি সারি—পাশাপাশি—বিশ্বের তথা ভারতের নরনারী বেশ চলেছে—সময়ের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে। সেই স্রোত আটলাণ্টিক মহাসাগরে উদ্ভূত হয়ে, ভূমধ্য ও লোহিত সাগরে বেগ সঞ্চয় ক'রে—আজ ভারত মহাসাগরকেও তোলপাড় ক'রে তুলেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু তোলপাড় করেছে বলেই যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে—তার কি মানে আছে? তবে এই জিজ্ঞাসা স্বভাবতই না জেগে পারে না যে আপাত মধুরের অমৃত লাভের লোভে—এই অশান্ত আলোড়ন এই দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন যে চলেছে—তা'র ফলে কি সুধাপাত্র নিয়ে ধন্বন্তরির আবির্ভাব হবে,—না কৈলাস পর্বতে প্রতিনিধির দল পাঠিয়ে আর্জি পেশ করতে হবে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট—এই বিংশ শতাব্দীর নূতন কালকুট কণ্ঠে ধারণ করবার জন্য?

শাস্ত্র বলেন—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" কিন্তু শাস্ত্রের কথা বল্‌তে গেলেই প্রথম কথা উঠবে—শাস্ত্র বড়, না যুক্তি বড়? আমি বিংশ শতাব্দীর সুরেই বলছি—যুক্তিই বড়। কারণ যদি বলি শাস্ত্রই বড়—তাহ'লেও বিশ্লেষণ করে দেখলে ঠিক তা'রই অর্থে বোঝা যাবে—যে যুক্তিই বড়ো, নইলে অশাস্ত্র থেকে শাস্ত্রকে নির্বাচনই বা করবে কে? এবং শত শত শাস্ত্র গ্রন্থের বিভিন্ন মতবাদের মীমাংসাই বা করবে কে? এবং শাস্ত্রকে শাস্ত্র নাম দিয়ে শাসনই বা মান্‌বে কেন?

যা কিছু—সংস্কৃত, আরবী বা হিব্রু ভাষায়—বেদ, পুরাণ, কোরাণ বা বাইবেল—উপাধি মণ্ডিত হ'য়ে বিশ্বের বিচারাসনে বসে—স্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যতা বা অনন্ত স্বর্গ নরকের বিধান দেবে—তাই যে হবে সত্য এবং সুবিচার একথা স্বীকার করা সুকঠিন। আমাদের শাস্ত্র তা করতেও বলেন না। আমাদের শাস্ত্রই বলেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

কিন্তু যেমন বৈজ্ঞানিক জগতে—স্যার পি, সি, রায়, স্যার জগদীশ বা স্যার সি, ভি, রমন কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করলে সাধারণ লোকে সেই

তথ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ বা আস্থাবান্ হন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। —বরং আরও বলা চলে যে—বর্তমান বিজ্ঞানাচার্যগণ হয়তো অনেক সময় স্বমতের পোষণ ও পরমতের নিরসন জন্য, যশোলিপ্সা বা জিগীষার বশবর্তী হয়ে ভ্রমে পতিত হলেও হতে পারেন, কিন্তু পূর্বকালের ষট্‌সম্পত্তি সম্পন্ন মনীষিগণের, তদ্রূপ ভ্রমে পতিত হবার আশঙ্কা অনেক কম ছিল এবং তাঁরা অনেক বেশী পরিমাণে সত্যাশ্রয়ী ছিলেন।

কিন্তু সেই সঙ্গে একথা না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে যে মানুষ কখনো সর্বজ্ঞ হতে পারে না এবং মুনিদেরও মতিভ্রম হয়। শাস্ত্র সম্বন্ধে অন্ততঃ এ কথা বলতে পারা যায় যে, শাস্ত্রোক্ত বিষয় মাত্রই শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণিধান যোগ্য —এবং দেশ কাল পাত্রের সহিত একান্ত বিরোধ না ঘটলে, শাস্ত্রোক্ত নির্দেশগুলি বিচারপূর্বক মেনে চলা উচিত।

অবশ্য বিধি নিষেধের মধ্যে কতকগুলো ঠুন্‌কো জিনিষ আছে যা একান্তই স্পর্শাসহিষ্ণু—তা ভাঙবেই। ইতিহাসে মানব জীবনের গতি বেগবতী নদীরমত —দুকূল ভাঙতে ভাঙতেই চলেছে—তটভূমির স্নেহের বাঁধনের ধস্ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে। মধ্যে মধ্যে ইট কাঠ লোহার বাঁধন দিতে হয়, তটস্থিত বাসভূমির রক্ষণার্থে। তেমনি স্মৃতির নির্দেশ যুগধর্মের সহিত বদলাতে বদলাতেই চলেছে—অত্রি অঙ্গিরা যাজ্ঞবল্ক্য হারীত বিষ্ণু মনু পরাশর ইত্যাদি করে, বিভিন্ন স্মৃতিকারের বিভিন্ন ব্যবস্থাই তার সাক্ষী।

গতিশীল মানবের আদিমকালীন ব্যবহার-বিধি কখনও চিরদিনের জন্য স্থিতিশীল হতে পারে না। সমুদায় বিধি নিষেধের চরম লক্ষ্য—সমষ্টিবদ্ধ মনুষ্য সমাজের মধ্যে শ্রী, শৃঙ্খলা, সুখ ও শান্তি সংস্থাপন, ব্যক্তিগত লাভ এবং সুবিধাকে দেশের এবং দশের সমষ্টির কল্যাণ কামনায় গৌণস্থান দেওয়া। ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম ঘটবেই—কিন্তু সমাজের শরীরে প্রাণ থাকলে, সে ক্যান্সারগ্রস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত—সেই বিকৃতাঙ্গকে উপায়ান্তর না থাকলে নির্মমভাবে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না—সমগ্র সমাজ-দেহের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য।

যাঁরা—"অল্পস্য হেতোর্বহুহাতুমিচ্ছন্"—একের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য দশের কল্যাণের দিকে দৃক্‌পাত করেন না—তাঁরা স্বার্থপর। যাঁরা সমাজে বাস করেন—অথচ সমাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা না করে, সমাজের প্রাপ্য অংশ সমাজকে না দিয়ে, সমাজের ষোল আনা সুবিধাটুকু ভোগ করতে চান,—

সমাজের কল্যাণে কোনও বিশেষ তথাকথিত কুসংস্কারকে সমাজ থেকে ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা না করে, নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বাহাদুরী করে সমাজকে অতিক্রম করেন,—তাঁরা সমাজের সহিত শুধু অসহযোগ করেন না—সমাজকে পদদলিত করেন। এই প্রকার হঠকারিতায় কোনও বড় জিনিষ গড়ে উঠবার সম্ভাবনা পর্যান্ত নষ্ট হয়, কারণ ব্যক্তিগত খণ্ড স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ থাকায়, বৃহদায়তন সমাজ কলেবরের প্রতি সেই সকল লোকের অবজ্ঞা ও অবহেলা এসে যায়।

মনে করুন অস্পৃশ্যতাবাদ,—মনে করুন কুক্কুট মাংস ভোজন। প্রথমটীর কথা বিবেচনা করা যাক্। অস্পৃশ্যতা বর্জন না করলে পাপ হয়, ঈশ্বরের বৃহত্তর আইনের অবমাননা করা হয়,—যাঁর বিবেক এই কথা বলে, যাঁর মনের মধ্যে অন্য কোন বক্র উদ্দেশ্য নিহিত নাই, তাঁর পক্ষে এরূপ ক্ষেত্রে বৃহত্তর আইনের মর্যাদা রক্ষা করার যুক্তি আছে—এমন কি সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করেও করা যায় বিবেকের বশে। কিন্তু এরূপ করবার পূর্বে তাঁর প্রথম কর্তব্য, তিনি যে সমাজে বাস করেন সেই সমাজকে এ বিষয়ে নিজ মতে আনবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা, এবং তাতে ফল না হলে, স্পষ্ট ভাবে সমাজকে জানিয়ে দেওয়া যে, সমাজ এ বিষয়ে সমর্থন না করলেও তাঁর কোনও উপায়ান্তর নাই। তিনি বিবেকের প্রেরণায় সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

—"শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।"—ঠিক তেমনি বৃহত্তর কর্তব্যের অনুরোধে ক্ষুদ্রতর সঙ্কীর্ণতর কর্তব্যকে বিসর্জন দেওয়াই প্রয়োজনীয়,—এই মনোবৃত্তি নিয়ে যাঁরা অস্পৃশ্যতা বর্জন করেন, তাঁরা আমাদের সম্মানের পাত্র, কিন্তু আদ্যোপান্ত বিচার না করে, অন্ধ গতানুগতিকের বশে দলগত বাহবা পাওয়ার জন্য,—অথবা অস্পৃশ্যতা বর্জন করিলে ব্যক্তিগত সুখসুবিধার সুযোগ হয় বলে—অস্পৃশ্যতাবর্জন যাঁরা করেন, অথবা সমাজ থেকে দূরে, সমাজকে অতিক্রম করে—সমাজের চাপে সে কথা যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁরা সমাজের অপকারই করেন, একথা আমরা বলতে বাধ্য।

দেশের অধিকাংশ লোক বাস করেন গ্রামে। গ্রামের সমাজ বন্ধন—দোষে গুণে অনেকটা বাঁধা ছিল—সেখানে সহযোগিতা সহানুভূতিও ছিল—ঈর্ষা, দ্বেষ, দলাদলিও অল্পবিস্তর ছিল। আমাদের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র "পল্লী সমাজ" গল্পে যে চিত্র এঁকেছেন তাও মিথ্যা নয়—যদিও সেটা অপেক্ষাকৃত

আধুনিক। সেই রকম ঘটনা যে সমাজে ঘটেছে—আমার মনে হয়, তার মূল কারণ সমাজকে ব্যক্তিগত ভাবে অতিক্রম করা ও তাচ্ছিল্য করা। ধনের গৌরবে সহরের সভ্যতার নূতন আলোকে—

"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া"—এই প্রকার অভিমানও তার জন্য অনেকটা দায়ী।

আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণ কুক্কুট মাংস ভোজনের প্রসঙ্গটাও এই সঙ্গে চিন্তা করা চলে। বিষয়টা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হয়—যে সমাজে পায়রা, হাঁস, বন্য কুক্কুট, আর আধুনিক শিকারী বাবুদের আগ্নেয়াস্ত্রে নিহত, হরতেল, চখা, তিতির মানিকজোড় ঘুঘু প্রভৃতি চলে—এবং যে ধর্ম একদিন—

"বামে বামা দক্ষিণে পানপাত্রং।
মধ্যে ন্যস্তং মরিচ সহিতং শূকরস্যোষ্ণ মাংসং॥—

—এই ব্যবস্থা দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, যেখানে একদিন মুনি ঋষির আশ্রমেও সুপক্ক বৎসতরীর মাংসের গন্ধ আশ্রম বালকেরা দূর থেকে পেয়ে, আশ্রমে distinguished guest অর্থাৎ কোনও বিশিষ্ট অতিথির আগমন অনুমান করতো, সেই দেশে, সেই ধর্মে, সেই সমাজে,—আজ পলাণ্ডু বা কুক্কুট মাংস স্পর্শে ধর্মহানি ঘটবে বলে যে নির্দেশ প্রদত্ত হচ্ছে, সে নির্দেশের সার্থকতা কোথায়?—এই প্রশ্ন উঠতে পারে তাতে সন্দেহ নাই।

সার্থকতা থাক আর নাই থাক—একথা স্বীকার না করে উপায় নাই যে, সময়ের মাপ দিয়ে বিচার করলে, কুক্কুট মাংস ভক্ষণে বাধা সূচক এই নির্দেশও প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে। এ কথা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার্য্য যে—একটা প্রাচীন প্রচলিত চিন্তাধারা ও বিধিবিধানের স্বীকৃত প্রথার বিরুদ্ধে যেতে হলে—বিশেষ বিবেচনা করে যাওয়া উচিত। যদি দেখা যায় একদিন—কোনও ধনী পাশ্চাত্ত্য আলোকপ্রাপ্ত যুবক হঠাৎ সহর থেকে গ্রামে এসে, বাবুর্চি দিয়ে রান্না করে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন করতে আরম্ভ করেছেন, তাহলে তাঁর জিহ্বার পরিতৃপ্তির জন্য সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ চিন্তাশীল ব্যক্তির উদারতাকেও বিক্ষুব্ধ করে তুলবে। মনে হবে ঐরূপ স্বার্থপর রসনাপরায়ণ সমাজ বিমুখ ব্যক্তিকে শাসন করা কর্তব্য। এই প্রকার কারণে সে কালের সমাজ অনেকে শাসনও করেছেন। কারণ শুধু 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি' বললে চলে না 'সংঘং শরণং গচ্ছামি' নীতিরও প্রয়োজন আছে না হলে স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিলে সমাজ রক্ষা করা যায় না।

আজ আর সে কথা বলা অবশ্য চলে না—কারণ এইরূপ ব্যক্তিগত বিদ্রোহের ফলে সমাজ এখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন—কোথাও তার হাত কোথাও তার পা পড়ে আছে।—চিন্তাশক্তি মূর্ছিত কি মৃত বোঝা যায় না। আজ Exception-টাই Rule হয়ে পড়েছে—ব্যতিক্রমটাই হয়েছে নিয়ম—বিধি আজ ব্যতিরেকমুখী। এই যে পরিবর্তন ঘটেছে সময়ের স্রোতে,—তাতে আমরা ভেসে চলেচি মড়ার মত। আজ ঠিক এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সমাজ যে আর সাড়া দেয় না—তা'তেআমাদের বিজয় গৌরব নেই—আছে আমাদের সামাজিক মৃত্যুর পরিচয়, পরাজয়ের গ্লানি। ঠিক এই বস্তুই আমাদের শ্লাঘার বিষয় হতে পারতো, যদি আমরা সমষ্টিগতভাবে সকলে মিলে এই মুর্গীর মাংসকে—অন্য মাংসের সঙ্গে আয়ুর্বিজ্ঞানের নিক্তিতে ও জাগতিক ব্যবহারের তৌলে, ভাল মন্দ বিচার করে, সামাজিক অনুমোদনের দ্বারা তাকে গ্রহণ করতাম। সমগ্র চীন জাগরিত হয়ে 'চণ্ডু' ত্যাগ করল টিকি কেটে ফেললো—এটা তার কুসংস্কার বর্জনের বিজয়গৌরবের পরিচয়। আমরাও টিকি কাটছি, মাথাও ছিড়ছি, পৈতাও ফেলছি—ক্রমশঃ সময়ের স্রোতে এগুলি ব্যাপক হয়ে উঠ্‌ছে বটে—কিন্তু সেই স্বৈরাচারে সমাজতন্ত্র শিথিল হয়েছে—আমাদের ঘরের বাঁধন আজ নেই বললেই চলে।

তার ফলে আমাদের সমাজের যা কিছু নির্বিচারে সবই আমরা ঘৃণা করতে শিখছি। নারীসুলভ লজ্জা নম্রমুখী অবগুণ্ঠনবতী বিয়ের কনেকে শ্রদ্ধার চক্ষে আর আমরা দেখতে পারি না,—নগ্নপ্রায়া, কর্তিতকেশা, লীলায়িতেক্ষণা, ধূমপানরতা, সমানাধিকার দাবী সম্পন্না, রঞ্জিত বদনা, রাঙাফলের মত তথাকথিত প্রগতিপ্রাপ্তা আধুনিকার দিকেই—আমাদের ঝোঁক বাড়ছে, যদিও আমরা এ কথা ভাবি না যে অমনি একটী আধুনিকাকে গৃহলক্ষ্মী করে আনলে তাঁর রুজ পমেটমের খরচ যোগানই আমাদের অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। সেই অসহধর্মিণীকে 'সহধর্মিণী' করে গঠন ক'রে তুলবার মত শক্তি ও পৌরুষ অধিকাংশ পুরুষেরই নাই। তাই অনুকরণের ফলে, চরিত্রবল ও আদর্শ নিষ্ঠার অভাবে সমাজ আজ অসহায়ভাবে ভেসে চলেছে,—ভোগ বিলাসের পথে। বিবাহবন্ধনও স্থায়ী হচ্ছে না।

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি আমার দেশের পোশাক হিসাবে ধুতি এবং সাড়ীর জন্যই ওকালতি করছি। বরং আমার নিজের ধারণা যে বাঙালী পুরুষকে কর্মযোগ্যতা লাভ করতে হলে, ধুতি ত্যাগ করতে হবে এবং বাঙালী

নারীর সাড়ীর নীচে উপযুক্ত অধোবাস এবং দেহে সুসংবদ্ধ জামা পরতে হবে। ধুতি পাঞ্জাবী এবং চটীজুতা কেবলমাত্র, বৈঠকখানা ঘরে চৌদ্দপোয়া হয়ে, অনায়াসে আরাম করবারই একমাত্র উপযোগী। আমার বক্তব্য শুধু এই যে—নিজের সুখ সুবিধার চেয়ে—বিলাস বিভ্রমের চেয়ে—নির্বাচনের নিক্তিটী ধরা উচিত—স্থান কাল পাত্র বিচারে, দেশের এবং দশের কল্যাণ কামনায় অনুপ্রাণিত হয়ে। হয়তো বলবেন যে এরূপ—"দীর্ঘ প্রস্থ বাণী"—অর্থাৎ লম্বা-চওড়া কথা বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন। কে সে কথা অস্বীকার করবে? যিনি এই প্রবন্ধ লিখ্ছেন—তিনিও জানেন যে এজাতীয় পরিবর্তন কত দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ।

দেশ আজ যে নানাবিধ মুশকিলের জটিল সমস্যায় জড়িত এবং জর্জরিত হ'য়ে পড়েছে—সেই মুশকিল আসানের প্রথম উপায়,—চিন্তা, দ্বিতীয় উপায় উদ্যোগ। এই চিন্তা বা কল্পনা চিরদিনই একটু লম্বা চওড়া হয়—এবং বাস্তবের চেয়ে এগিয়ে চলে। আকাশ পানে লক্ষ্য করে তীর ছুড়লে তবে যদি বৃক্ষাগ্র পর্যন্ত পৌঁছায়। তাই চিন্তাশীল ব্যক্তিকে পরে আক্ষেপ করতে হয় যে, যত সাধ ছিল তত সাধ্য ছিল না। তবুও বৃহত্তর আদর্শের পরিকল্পনাটী নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে—তবে যদি কার্যের সমাধানের উপায়ের সঙ্গে কার্য্যকর্তার মনের এবং সংকল্পের সংযোগ সাধিত হয়—তা' না হলে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই প'ড়ে থাকবো,—

ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ!

আমাদের দেশে ঝগড়া বিবাদ দলাদলির অভাব নাই। শাক্তে বৈষ্ণবে বিবাদ, হিন্দু মুসলমানে বিবাদ, এবং রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে দল বদলের বিবাদ, যেগুলি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে হাস্যকর বলে মনে হয়। আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমে যে বুদ্ধির বিচারের কথা বলেছি—সেই যুক্তিদ্বারা বিচার করলে এই অনর্থক বিরোধের অবসান হয়ে, জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত এবং জাতির উন্নতির পথে বহু বাধা বিঘ্ন দূর হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ সেই মাংস ভক্ষণের কথাটাই আলোচনা করা যাক্।

নিরামিষ ভোজন—নিবৃত্তি মার্গের অনুকূল অর্থাৎ সাত্বিক আহার, আর আমিষ ভোজন প্রবৃত্তি মার্গের পোষক, এই নিয়েই শাক্ত বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব লেগে আছে। সত্যিই কি তাই? আমিষাহারী বাঙ্গালী জাতি নিরামিষাহারী মাড়োয়ারীদের অপেক্ষা অধিকতর প্রবৃত্তিপরায়ণ নয়। আবার পক্ষান্তরে

নিরামিষাহারী মাড়োয়ারীজাতি আমিষভোজী বাঙ্গালীদের থেকে অধিকতর কর্মশক্তি বিশিষ্ট নয় কি? মানবের দেহ মন চরিত্র গঠনের প্রণালী বড়ই জটিল। বহু কারণের ও কারণ-সমবায়ের পরিণত ফল মানব-চরিত্র।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জনৈক পার্ষদের উক্তি অবশ্যই স্মরণীয়—

সিংহোবলী দ্বিরদশূকরমাংসভোজী।
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারম্‌॥
পারাবতস্তৃণশিখাকণমাত্রভোজী।
কামী ভবত্যনুদিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥

অর্থাৎ বলবান সিংহ,—হস্তী শূকরাদির মাংস ভোজন করেও সংবৎসরে একবার মাত্র রতিক্রীড়া করে থাকে—কিন্তু পারাবত শস্যকণা মাত্র খেয়েও অনুক্ষণ কামক্রীড়া-পরায়ণ হয়। এর হেতু কি?

তারপর হিন্দু মুসলমানের বিরোধ। আমরা মুসলমানদের ম্লেচ্ছ বলি এবং দ্বেষ করি তাদের গোমাংস ভক্ষণের জন্য।

পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু এবং মুসলমান গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরে গরু এবং গোশালার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমার ধারণা হয়েছে যে, তথাকথিত ম্লেচ্ছরা গোহত্যা করে—সত্য, কিন্তু তারা যে পরিমানে তাদের গোধনের অর্থাৎ গাই বলদের যত্ন করে, তাহার কিছুই আমরা অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চজাতীয় হিন্দুরা —করতে পারি না, বা করি না। তার প্রত্যক্ষ ফল এই যে—আমরা গোহত্যা করি অল্পে অল্পে তিলে তিলে, ধীরে ধীরে, অথচ গরুকে বলি—ভগবতী মাতৃস্থানীয়া। বাছুরকে বঞ্চনা করে তার সমস্তটুকু মুখের গ্রাস নিঃশেষ করে কেড়ে খাই মায়ের সামনে তার উপবাসী বৎসটী কাতর চক্ষে চেয়ে থাকে—অল্পে অল্পে শুকিয়ে মরে—মরে গেলে তার চামড়ার মধ্যে পাট কিম্বা তুলার প্যাকিং দিয়ে গোমাতার শোকে সান্ত্বনা ক'রে, তাকে প্রবঞ্চনা ক'রে, দুগ্ধ শোষণ করি। এই আমাদের গোভক্তি! মসজিদের সামনে বাজনা বাজালে মুসলমানের অসহিষ্ণুতার কারণ যেমন জিদ ব্যতীত আর কিছুই নয়—তেমনি গোমাংস ভক্ষণের জন্য হিন্দুর মুসলমান বিদ্বেষ কেবলমাত্র জিদ এবং প্রাচীন কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়। সূক্ষ্মভাবে আমাদের চিত্ত-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ঠিক এই গোমাংস ভক্ষণের জন্য আমরা ইউরোপীয়দের ততটা বিদ্বেষের চক্ষে দেখি না—যতটা বিষ আমাদের দৃষ্টিতে

বর্ষণ করি, আমাদের প্রতিবেশী মুসলমানের প্রতি। আমার মনে হয় এর মূলে একটু পর্যুষিত প্রীতির পূতিগন্ধও সংমিশ্রিত আছে। হিন্দু এবং মুসলমান এক মায়ের দুই ছেলে। হিন্দু তার মনের ভাব এবং সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মানের দাবী—বিদেশী ইউরোপীয়ের নিকট কিছুমাত্রও করে না, কিন্তু সে আশা করে—সে শ্রদ্ধা সম্মান এবং সহানুভূতি তার মুসলমান ভাইয়ের নিকট থেকে পাবে, বিশেষতঃ যখন তার সেই দাবীটুকু পূরণ করতে ধর্মেও বাধে না এবং ক্ষতিও হয় না। কিন্তু সে তা পায় না—আবার সেইরূপ মুসলমান ও হিন্দুর নিকট সেই প্রকার শ্রদ্ধা সম্মান ও সহানুভূতি চায় কিন্তু পায় না। ইহার ফলে পরস্পর প্রতিবেশী এই দুইটী প্রাচীন জাতি প্রবল কাটাকাটি করে মরছে আর এই গৃহদ্বন্দ্ব ও ভ্রাতৃবিরোধের সুবিধাটুকু করে নিচ্ছে স্বার্থানুসন্ধিৎসু সুচতুর তৃতীয় জাতি।

আজ আমাদের হিন্দু এবং মুসলমান দুটো জাতকেই ভূতে পেয়েছে! এই ভূত আর কিছু নয়—এর নাম—অতীতের মোহ। একদল তাকিয়ে আছেন—কোন পশ্চিম সীমান্তে সুদূর বিদেশে, কবে কোথায় ইসলাম ধর্মের গৌরব রবির অভ্যুদয় হয়েছিল সেইদিকে—আজও তাই তাঁদের স্বমাতা জন্মভূমির ক্রোড় থেকে—মুগ্ধ দৃষ্টি পড়ে আছে সেই বিমাতার পদতলে। আর একদল তাঁদের আভিজাত্য গৌরবের প্রাচীন জন্মপঞ্জিকা খুলে বসে আছেন, কবে কোন সাবর্ণি মনুর আমলে—ভরদ্বাজ, কশ্যপ প্রভৃতি নামে দেবর্ষি, মহর্ষি বা ব্রহ্মর্ষি ছিলেন—যাঁরা আমাদের অধস্তন অধঃপাতকে ধন্য করে গেছেন। আমাদের গোত্র-গৌরব, আজ আমাদের গৌরবের না হয়ে লজ্জার পরিচয় হয়ে উঠেছে। মেনে নিলাম তাঁরা এতই বড় ছিলেন যে পঞ্জরাস্থি দিয়ে বজ্রনির্মাণের জন্য প্রাণ দান করেছিলেন—আশ্রিত পক্ষীর জন্য স্বীয় শরীরের মাংস দান করেছিলেন, অতিথির জন্য নিজ সন্তানের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা নিয়ে গর্ব না করে—আমাদের লজ্জায় মুখ লুকিয়ে থাকা উচিত,—এই কথা মনে করে যে, আজ আমাদের সে তুলনায়—কি ভয়ানক অধঃপতন হয়েছে। সে পরিচয় আজ আমাদের আরও লজ্জার কারণ এই জন্য যে আমরা আজ আমাদের ভাই বন্ধু প্রতিবেশী এবং স্বদেশবাসীর সুখ সুবিধা অথবা মনস্তুষ্টির জন্য, দেহের হাড়, দেহের মাংস, দেওয়া তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্রও ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করি।

হিন্দীতে একটী দোঁহা আছে যে—
হাঁকে সে টাট্টু চলে,—শুঁখে আতর বাসায়—
(আউর) পুছে বেটা জানিও তো—দে নদী বহায়—

অর্থাৎ যে ঘোড়াকে ক্রমাগত হেট্ হেট্ করিয়া হাঁকাইতে হয়—এবং যে আতরকে নাকের নিকটে রাখিয়া সজোর নিঃশ্বাসে গন্ধ আঘ্রাণ করিতে হয়, এবং যে পুত্রকে তার পিতৃপুরুষের পরিচয় জানাইতে হয়—তার নিজের পরিচয়ের কিছুই নাই—এই তিনকেই নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত। আমাদের হয়েছে—"কোন কালে দুধ খেয়েছি তাই হাতে সরের গন্ধ!"

ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়—উপবীত এবং উপাধিমাত্রে পর্য্যবসিত শর্মাকে আজ চিনতে হয় শুধু শিখায় এবং সূত্রে। চোখের আগুন, আমাদের আজ কতক উঠেছে কপালে কতক নেমেছে মুখে এবং উদরে।

ক্ষত্রিয় বলেন তিনি বর্মা—জানি না তাঁহার "বর্মায়" বর্ম-পরিধানের সহিত কোনও মৌলিক সম্পর্ক আছে কিনা—শোনা যায় বভ্রুবাহনের রাজত্ব নাকি বর্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল! ক্ষত্রিয় আজ—ক্ষত থেকে পরিত্রাণ করবেন কি—পরশুরামের কুঠারের আঘাতে অদ্যাপি পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছেন।

বৈশ্য ও শূদ্র তখনও ছিলেন মাটির মানুষ এখনও তাই,—তাঁরা কৃষিকার্য করেন—"ধুলার শরীর তুমি হবে ধূলিসার"—এই বিধি শিরোধার্য করে 'ব্রাহ্মণ'-নামক পুরুষ পরম্পরাগত অধিকার প্রাপ্ত 'নরদেবতা'কে—ঠাকুরঘরে ঠাকুরমশাই সাজিয়ে রেখে, নিজেরা পদধূলিতে ধূসরিত হ'য়ে, পাদোদক পান করে কৃতার্থ বোধ করেন।

কথায় কথা বাড়ে, তবে নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। নিন্দা করবো কার? শুধু নিজেদের কুটীর প্রাঙ্গণে ব'সে—নিজের ঘরের অভাব অনটন অসদ্ভাব স্খলন পতন ত্রুটির—আলোচনা করছি মাত্র। উদ্দেশ্য,—প্রথমতঃ সকলের মনে—ব্যাপকভাবে প্রশ্ন জাগানো,—"কুত আগতোঽসি" এবং "কুতোঽসি গন্তা"!

আজ পশ্চিমযাত্রার পথে যদি ভারতের ভাব-ধারার পাথেয় সঙ্গে না থাকে, এবং স্বগৃহে পাশ্চাত্য অতিথির অভ্যর্থনায় যদি প্রাচ্যের স্বকীয় সম্পদের পরিবর্তে, পাঁউরুটী পরিবেশন কর্তেই বদ্ধপরিকর হই, তা হ'লে আমরা পাশ্চাত্য গুরু এবং পাশ্চাত্য মহাজনের দ্বারা ভারাতুর এবং অভিভূত অধমর্ণের মত, অবজ্ঞাতই

হ'ব। আজ প্রয়োজন হ'য়েছে নিজেদের প্রবোধ দেবার—"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ"—আজ প্রয়োজন হ'য়েছে নিজেদের প্রবুদ্ধ করবার—"নিজ শক্তিম্ উমাং পশ্য মহেশ ইব নৃত্যসি"—আজ প্রয়োজন হ'য়েছে—আড় চোখে চাওয়া, ঘাড় বাঁকিয়ে সরীসৃপ ভঙ্গীতে চলা, এবং বিষ-কুম্ভের অন্তর নিয়ে পয়োমুখে কথা বলা—একান্তভাবে পরিহার করবার। আজ আমরা কোদালকে কোদাল বলতে কুণ্ঠিত হই। শূকরকে শূকর বলি না—বলি হয় 'গজক্ষয়'—নয় "মূষিক বৃদ্ধি"! এমনি সত্যের অভাবে এবং অপলাপে, মিথ্যার প্রভাবে এবং প্রশ্রয়ে কেবল গোঁজামিল দিয়েই চলেছি ; জল ত্যাগ করে মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করছি—নিজের অন্তরের অবিকশিত কুট্মলের যে গন্ধ—অন্ধ হয়ে পথ খুঁজছে—বিকাশভিখারী অশরীরী যে দেবশিশু—লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছে, তা'দের দিকে কর্ণপাত না ক'রে, কস্তূরী মৃগসম আত্মহারা হ'য়ে—বহির্মুখে ছুটে চ'লেছি। এই ছুটে চলার আকাঙ্ক্ষা—এই প্রগতির উদগ্র আগ্রহ, এই অজ্ঞাত দুর্লভের আকর্ষণ থেকে প্রবৃত্তির দশ ঘোড়াকে বল্গায় বেঁধে, পাঞ্চজন্য বাজিয়ে নিয়ন্ত্রিত ক'রবে—আজ কোথায় সেই সুদর্শনধারী হৃষীকেশ? এই ভারতের মহামানবের নবজন্মলব্ধ নূতন যৌবনের জলতরঙ্গ প্রতিরোধ করবার জন্য ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বল্‌তে হয়,—

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে—
হরে মুরারে—হরে মুরারে।"

বল্‌তে হয়—"রুদ্র" যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্" প্রার্থনা করতে হয়—

"আবিরাবির্ম এধি—"

"প্রকাশ হও গো—উদয় হও গো—পথিক হও গো নয়ন-পথে"। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে ব্রতী করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

অপর দিকে,—যুদ্ধ না করলে—

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।

একদিকে নির্ভয়ের পৌরুষ,—অপর দিকে কাপুরুষতার লজ্জা,—ইহার মধ্যে বিচার করিয়া পথ নির্বাচন করিতে হইবে,—স্বীকার করিতেই হইবে—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ"

কারণ যখন—"জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রু´বং জন্ম মৃতস্য চ"

তখন এই অপরিহার্য মৃত্যুপথের পথিক মারীচের মত—একদিকে রাম এবং অপর দিকে রাবণের মধ্যে, আপাতসুন্দর এবং পরিণাম মধুর নয়নানন্দ রামচন্দ্রকে বরণ করাই বাঞ্ছনীয়। মৃত্যুই আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে, মৃত্যু-চিন্তাই আমাদের—প্রলোভনের অন্তরালে ব্যাধের বাগুরা দেখাইয়া দেয়। দক্ষিণা কালিকামূর্ত্তির এক হাতে বর এবং অন্য হাতে বৈরাগ্যরূপ অভয় প্রদান করে।

দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুভয়বশতঃ বার বার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে—নির্ভীক পুরুষ—মৃত্যু যখন আসিবার আসিবে—'will come, when it will come" বলিয়া নির্বিকার চিত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেন।

মহাশক্তি ও মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার কানে কানে "মাভৈঃ" বাণীর অভয় মন্ত্র প্রদান করেন।

এই অভয় মন্ত্রই মুক্তি পথের প্রথম সোপান। এই মন্ত্র ব্যক্তিগত ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলেও সমগ্র দেশ ব্যাপক ভাবে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়—এবং বৈদান্তিক মুক্তির আলো চোখে পড়িলে তদ্দ্বারা—রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে সহজেই অগ্রসর হওয়া যায়। দেশের এবং দশের স্বার্থে নিজের স্বার্থ অস্বতন্ত্র ভাবে মিলিয়া যায়—প্রাণ পরার্থপরতায় পরিপূর্ণ হয়।

এই যে নিজেকে জানা,—নিজের সঙ্গে, নিজের সত্তা ও শক্তির সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ পরিচয়—যাহার পারিভাষিক শব্দ হ'ল—'আত্মজ্ঞান' ইহাই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার মানসে মৈত্রেয়ীকে বললেন তাঁর বিষয়ে প্রাপ্যাংশের 'পাওনা গণ্ডা' বুঝে নিতে,—তখন মৈত্রেয়ী বললেন—

"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?"

কথাটা আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হ'তে পারে—কারণ—

বৈরাগ্য প্রচার করতে আমরা বসি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষা এবং সে শিক্ষার—বিশিষ্টতা এই যে—এখানে 'অনাসক্তি' বস্তুটা বৈরাগীর যেমন প্রয়োজন,—গৃহীরও তেমনি প্রয়োজন।

এবং এই আদর্শের দ্বারা আমাদের ধর্ম সমাজ এবং সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করতে হ'বে। নইলে আজ ইংরাজ-মহিলা শীত-প্রধান দেশে অর্ধাঙ্গ নগ্ন ক'রে যদি সমাজে বিচরণ করেন তাহা হইলে আমাদের গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের মহিলাগণ বারো আনা নগ্ন না হইবেন কেন?—এ যুক্তি যদি আশ্রয় করা যায় এবং— ইংলণ্ডের সহিত ত্রৈরাশিক করিয়া ভারতবর্ষকে কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হয়, তাহাতে ভারতের—না আছে কল্যাণ—না আছে আত্মসম্মান।

ইংলণ্ডের আদর্শ—ভোগ। সুখের জন্য ভোগ। ভারতের আদর্শ ত্যাগ। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়জ সুখের প্রতি আসক্তিত্যাগ।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

এখানকার যা ভোগ তা'ও ত্যাগের মুখে ভোগ—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" —কারণ—"ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্"। সাধারণতঃ যে সুখকে আমরা সুখ বলি— তাহা বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগফলে, 'মাত্রাস্পর্শ' জনিত। আমাদের প্রার্থনীয় যে সুখ,—তাহা "সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।"

"নাল্পেসুখমস্তি"—"ভূমৈব সুখং।"

সেই ভূমার প্রধান ভূমি এই ভারতবর্ষ।

মুক্তির আদর্শও এখানে দ্বিবিধ। এক ব্যক্তিগত ব্রহ্মজ্ঞান জনিত "নির্গতং বাণং গমনং যস্মিন্ প্রাপ্তে ব্রহ্মণি তন্নির্বাণং"—অথবা নির্বাণ মুক্তি—ইহা মায়াপাশ হইতে জীবের মুক্তি—আর এক সমষ্টিগত মুক্তি ইহা কোনও বহিরাগত প্রতিকূল শক্তির প্রভাব হইতে সমগ্র দেশের মুক্তি।

ভারতবর্ষ এই উভয় প্রকার মুক্তির সাধনা সমকালে করিতে বলেন এবং আরও বলেন যে এই উভয় প্রকার মুক্তি অন্যোন্যাশ্রয়ী অর্থাৎ উভয়ে উভয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে—উভয়ে উভয়ের সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাকে। কারণ আত্মজ্ঞান ব্যতীত শুধু রাজনৈতিক মুক্তিতে যদি সুখ থাকিত, তবে পাশ্চাত্ত্য জাতিই সুখের আদর্শ হইত—পাশ্চাত্ত্য নরনারী লালসার বহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছায় দগ্ধ হইয়া অবিরত আর্তনাদ ও হাহাকার করিত না এবং সুখের স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিত না। আবার কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবন্মুক্তি —যাহা একের দুঃখ নিবৃত্তি করে—কিন্তু একতার বন্ধনের মধ্যে—মহানন্দময়

মুক্তির স্বাদও জানেনা, সন্ধানও রাখে না,— তাহা দেশের ও দশের আদর্শ হইতে পারে না। এই জাতীয় মুক্তির অভাবে - স্মৃতির বিধি মিথ্যা, নিষেধ মিথ্যা, রাজার আইন কানুন মিথ্যা,—কারণ তাহারা থাকে পুঁথির পাতায়। নরনারীর আচারে এবং রাজপুরুষদের ব্যবহারে তাহারা অঙ্গীকৃত হয় না,— অস্বীকৃত হয় প্রতি পদে পদে। কথায় বলে—a handful of might is better than a bagful of rights—অর্থাৎ এক বস্তা—আইনের সর্তের চেয়ে এক মুঠো সর্ত সাব্যস্ত করবার শক্তি অধিকতর মূল্যবান,—কারণ পুঁথির আইন যতই কড়া হউক না কেন, তা'র সম্মানের শেষ কথাটা চিরদিনই জনশক্তির সহযোগিতার উপর নির্ভর করে।

আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের সবপ্রকার সৃষ্টিস্থিতিলয় থেকে এই বিশ্বের জন্মস্থিতিভঙ্গ পর্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটা নির্ভর করে এই শক্তির সঙ্গে সংযমের মিলন সম্পাদনে। সৃষ্টি শক্তির অশ্বের মুখে এই সংযমের বল্গা লাগিয়ে চলেছেন কালের কারক পুরুষ।

"সর্ব্ব ভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্"

এই প্রকৃতি—জীব-জীবনের সহিত ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান। এই প্রকৃতির প্রকাশ দ্বিবিধ। এক মিত্র-প্রকৃতি বা অনুকূল-শক্তি (accelerator) অপর অমিত্রশক্তি (Inhibitor) বা প্রতিকূল শক্তি—ইহাকে সহজে পরাজয় করা যায় না সত্য, কিন্তু তাই বলে চাহিবামাত্র ইহাকে জয় পত্রও লিখে দেওয়া যায় না। ইহাকে জয় না করা গেলেও মিত্র-শক্তির দ্বারা পিছু হঠান যায়, এ মোকর্দমায় ডিক্রী না মিলিলেও যথেষ্ট পরিমাণে দিন লওয়া যায়,— সেইজন্যই আপৎকালে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ, প্রলোভন কালে পরধর্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ধর্ম হইতে স্বধর্ম অর্থাৎ আত্মধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ, এবং দেহনাশকারী ব্যাধির আক্রমণে দেহ রক্ষার জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন। নচেৎ সকল শাস্ত্রের অনুজ্ঞা এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের 'লোট্' ও 'বিধিলিঙ্' প্রত্যয় নিতান্তই নিরর্থক হইত।

প্রবন্ধের প্রথম ভাগে—এই শক্তির উদ্বোধনের জন্যই আধুনিক তথাকথিত নারী প্রগতির বিরুদ্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাই ব'লে কেহ যেন মনে না করেন যে আমাদের নারীর আদর্শ হবে পুঁটুলীবদ্ধ অলঙ্কার,—লজ্জার গুরুভার, এবং অশিক্ষার অন্ধকার,—এই ত্রিসমন্বয়ের ঘনীভূত পরিণাম। এরূপ নারী নিজেও হয় অচলায়তন এবং যে পুরুষ একে বিশেষরূপে বহন করবার জন্যই 'বিবাহ' করে, সে পুরুষও ইহার ভারে হয়ে থাকে পঙ্গু।

চণ্ডীর মধ্যে যে নারীশক্তি পুরুষ শক্তিকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন তিনিই বলেছেন—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি।

অর্থাৎ যে আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করবে. যে আমার দর্প চূর্ণ করবে, এমন প্রতিদ্বন্দ্বীকেই আমি স্বামীত্বে বরণ করবো।

সেই নারীশক্তিকে আজ শুধু 'নমস্তস্যৈ' বললে চলবে না। আজ তার প্রতিবল—প্রতিদ্বন্দ্বী হতে হবে -পুরুষকে হতে হবে অগ্রণী,—নারী থাকবেন বাম পার্শ্বে। পশ্চাতে থাকার যুগ আমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছি—তাতে ক্ষোভ নাই—আমরা লাভবানই হয়েছি। যে আদর্শে নারী, পূরুষের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করেছেন—যে আদর্শে এখনও পল্লী ভিখারীরা গান ক'রে যায়—

"শুক বলে,—আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল
সারী বলে—আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল
নইলে পারবে কেন ?"

সেই আদর্শই আমাদের নিতে হবে।

এই শক্তি—অন্তর্মুখী—ইহা লালসার বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া—নিজে পুড়িয়া অপরকে পোড়ায় না—ইহা ভোগের বুভুক্ষা নয় ইহা "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব" —উত্তরোত্তর ভোগাকাঙ্ক্ষাকে বাড়াইয়া চলে না—ইহা নিজেও চায় শক্তি এবং পুরুষকেও যোগায় শক্তি—বলে :—

'বক্ষে মোর জাগে রুদ্রবীণা'— * * *
'নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার' ?

আজ আমাদের দেশের তরুণ নর নারীদের—নব জাগরণের দিনে—নূতনের সঙ্গে পুরাতনের এই সঙ্গত যোগসূত্র টুকু রাখতে বলি, কারণ—

পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্বং
* * *
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পর-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধিঃ।

অর্থাৎ

পুরাণ বলিয়া যাহা কিছু সব—
নহে সমাদর-যোগ্য নহে।
নবীনের বেলা শুধু অবহেলা—
তাই বা কাহার বিচারে সহে?
যেজন সুজন সুধী সজ্জন—
মজে সে গুণের বিচার করি
পরের জিহ্বায় যেই জন খায়—
মূঢ় পরীবাদ তাহারি করি। (স্বকৃত অনুবাদ)

প্রেমের স্বরূপ ও রূপ

প্রেমের 'স্বরূপ' অর্থে তার স্বকীয় রূপ বা সত্তা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্তা। আর রূপ অর্থে তার বহিঃপ্রকাশ বা ব্যাবহারিক প্রকাশ, যেরূপে তাকে আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি জীবনের বিবিধ সম্পর্কে ও সম্বন্ধে, আদানে এবং প্রদানে।

আত্মার সহিত আত্মার— প্রীতির ও আত্মীয়তার সর্ববিধ সংস্পর্শ এবং সম্পর্কই প্রেমাত্মক।

এই প্রেমের গতি হয় তিন পথে। জীবের প্রতি, "আত্মোপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ"—অথবা "সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"। শ্রীমন্মহাপ্রভু, তুলসীদাস, নানক,—সকলেই জীবে দয়াকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন —"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন,—ইহা বই ধর্ম নাই শুন সনাতন"। ইহাই প্রেমের প্রথম প্রকার বা প্রকাশ।

প্রেমের দ্বিতীয় প্রকারে,—মানুষ পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় এবং গভীর প্রীতিতে আবদ্ধ হয়।

তৃতীয় প্রকারে মানুষ সেই প্রেমকেই সগুণ ব্রহ্মে বা শ্রীভগবানের নরোত্তম বা পুরুষোত্তম রূপে অর্পণ করে। তাকেই লক্ষ্য করে মহাকবি বলেছেন:

"সেই সুধা স্রোতে
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে

কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু আপন কুটীরে
আপনার তরে।" (রবীন্দ্রনাথ)

কারণ,— "আমাদেরি কুটীর কাননে—
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা চরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে"
* * * "এই প্রেমগীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী মিলন মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে,—কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি,—দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে,—আর পাবো কোথা
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।" (রবীন্দ্রনাথ)

এই প্রেম যাঁর ধন তিনি অসীম ঔদার্যে এবং অপার সন্তোষে বসে নর-নারীর এই প্রেমের আদান-প্রদান দেখেন, কবি বলেছেন—"যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে, অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।" তাই পাই ব্রহ্মসূত্রে এরই প্রতিধ্বনি "লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্।" এই প্রেমই সেই প্রেম এবং সেই প্রেমই এই প্রেম—মধ্যে কেবল একটু অগ্নি সংস্কারের প্রয়োজন হয়,—যাকে বলা হয় 'Baptism of fire'—সেই অগ্নি সংস্কারের ফলে অসম্ভব সম্ভব হয়। 'প্রথম রমণী দরশ মুগ্ধ' তাপস-কুমার ঋষ্যশৃঙ্গ—যখন 'ধরার নরক সিংহদুয়ারে' যারা নিত্য সন্ধ্যা-বাতি জ্বালায়—এমনই এক বারাঙ্গনার মুখের পানে চেয়ে বলে উঠেন—

"আনন্দময়ী মুরতি তুমি
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"

তখন তার অন্তরের সুপ্ত দেবতা জেগে ওঠেন—কারণ সুন্দরের স্মরণে ধ্যানে এবং দর্শনে এমন কলুষিত বা কলঙ্কিত কেউ নেই যে অন্তরে বাহিরে শুচি সুন্দর হয়ে না ওঠে,—তাই আমাদের শুচিতায় মন্ত্রে পাই—

—"সর্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ"॥

তাই সেই পতিতা নারীর শুচি সুন্দর মুখে শুনি—

"আনন্দে মোর দেবতা জাগিল
জাগে আনন্দ ভকত প্রাণে
এ-বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।

*　　*　　*

শুনি সে-বচন হেরি সে-নয়ন
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি
নিমেষে ধৌত নির্মলরূপে—
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।"

(রবীন্দ্রনাথ)

আত্মার এই ঐকান্তিক নির্মলতার ফলে, পতিতা 'চিন্তামণি'কে বিল্বমঙ্গল গুরু সোমগিরির ও পূর্বে প্রণতি জানিয়ে বলেন—

"চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলা স্বয়ং বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥"

(কৃষ্ণ কর্ণামৃত)

মহাকবি এই অগ্নি-দীক্ষার প্রার্থনা করেই বলেছেন—

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন ধন্য কর—এ জীবন ধন্য কর দহন দানে।"

এই অগ্নিসংস্কারের মূল মন্ত্রটি হ'ল—কস্মৈচিৎ প্রিয়ায় বা দয়িতায় বা স্বাহা, এই সমর্পণের মন্ত্র—প্রেমযজ্ঞে আহুতির মন্ত্র। যিনি হোতা বা হোত্রী তাঁকে আত্মসুখ সহ আপনার বলতে 'যথাসর্বস্ব' অর্পণ করতে হবে সেই প্রেমস্বরূপের উদ্দেশে।

প্রথমে সে প্রেম থাকে 'পরশমণি'—তাকে লক্ষ্য করে পদকর্তা বলেন—

"সখি বঁধুয়া পরশমণি—সে অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার সোনার বরণ খানি," —বলেন, "তোমারি গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমারি রূপে"—সেই মিলনের

প্রেম, বিরহের আগুনে দগ্ধ হয়ে, চিন্তামণি হয়ে ওঠে। তখন পরশেরও প্রয়োজন থাকে না—

যখন "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

যখন বিরহিণী পথিকবধূর কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়ি-জন—আশার অতীত দূরদেশে অবস্থিত। প্রশ্ন ওঠে যে, এই অগ্নিসংস্কারে কি দগ্ধ হয়—কি হয় পবিত্র? কি হয় পরিবর্তিত? —উত্তর, —'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'-রূপ—'মহাশনো-মহাপাপ্মা'—মহাবৈরিরূপ যে কাম তাই দয়িতের প্রীতি ইচ্ছায় বা বৈষ্ণব কবির ভাষায় 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' রূপ,—প্রেমে পরিণত হয়। ফলে অন্ধতম যে কাম তাই প্রেমরূপ উজ্জ্বল ভাস্করে পরিণত হয়। তখন প্রেমই fire (অগ্নি), প্রেমই light (আলোক) এবং প্রেমই delight (আনন্দ), প্রেমই যুগপৎ সংস্কারের অনল, নয়নের আলো এবং হৃদয়ের আনন্দ।

ছেলেবেলায় যখন বড়'দের বৈঠকী গানের আড্ডায় আড়ি পেতে লুকিয়ে গান শুনতাম তখন একদিন শুনলাম—

"প্রেম অভিধানে মানে ভালোবাসা
যদি বল বুঝি না,—যদি বল বুঝি না,—
ন্যায়ের প্রমাণে তুমি চাষা।"

ন্যায়ের প্রমাণে তখন তাই প্রমাণিত হলাম! কিন্তু কৌতূহল সেদিন থেকেই বেড়ে চলল প্রেম কি,—তা জানবার জন্য। বয়সের বশে আরো বড় হতে লাগলাম —কবির মুখে শুনলাম "ভালো যারা বাসে শুধু তারা ভাল থাকে, প্রেমহীন সারা হয় বহি আপনাকে!" তখন মনে হয়েছিল বুঝি ভালোবাসতে পারলে আর অসুখ-বিসুখ জর-জারি হয় না, স্বাস্থ্যটা ভালো থাকে—তখনো নিধুবাবুর গান শুনি নি যে—

"বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হতে মরণ যন্ত্রণা ভালো
সে যে অনন্ত যাতনা—এ যাতনা অল্পকাল"।

তখনো কবিরাজ কবির মুখে শুনি নি—"এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে বিষামৃতে একত্র মিলন।" রূপ গোস্বামী তাই বলেছেন—'উত্তাপী পুট পাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণঃ।"

তা'র পর কবি সত্যেন্দ্রনাথের Victor Hugoর এই অনুবাদটি পড়ি—

'ভালবাসি নারী, পূজা করি দেবী—মুরতি তোর
বিধি তোরে দিয়ে পূর্ণ করেছে আমারে—
প্রেম দেছে শুধু তোরি তরে বিধি হৃদয়ে মোর
নয়ন দিয়েছে, দেখিতে কেবল তোমারে।"

অনন্যমুখী অনবদ্য এই প্রেম—একেই হয় পূর্ণ—এবং সেই এক না হলে বিশ্ব জগৎ হয় শূন্য।

কিন্তু কি এই প্রেম—কেন এই প্রেম না হলে চলে না? একজন ইংরাজ কবি লিখেছেন :—

"What is love, that all the world should
think so much about it ?
What is love,—that neither you nor
I can live without it ?
Love is a tyrant and a slave, a torment
and a treasure
Having it,—we know no peace and
wanting it no pleasure.
Should we lose it, if we could ? Sooth, I
almost doubt it
Faith—I w'd rather bear its sting than
live my life without it."

সুতরাং এই প্রেম না হলে কাহারও চলে না। সৃষ্টির প্রাক্কালে নির্বিশেষ—একমেবাদ্বৈতমেরও চলে নি—"স বৈ নৈব রেমে, সঃ অকাময়ত জায়া মে স্যাৎ তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ * * * ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্" ।—বৃহদারণ্যক ১।৪।৩ কিন্তু সে কথা এখন থাক, পরে বলা হবে। এই প্রেম সম্পর্কে শিশুকালে একটি গান শুনেছিলাম তা আজও মনে গাঁথা হয়ে আছে—

"লুকিয়ে ভালবাসব তারে জানতে দেবো না রে—
জানতে পারলে প্রাণ সে নেবে প্রাণ তো দেবে না রে—
বসিয়ে হৃদিসিংহাসনে,—হাসবো কাঁদবো আপন মনে,
মজেছি আপনি মজি তায় মজাবো না রে—॥

এই প্রেমে প্রেমতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে—নিজের সুখের প্রসঙ্গই থাকে না, কারণ প্রহ্লাদ বলেছেন : "যস্ত আশিস আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক!" একই অর্থে বাংলা গানে পাই :—

"যে দেয় প্রেম করে ওজন, সে জন প্রেমিক নয়কো কখন
সংসারের বণিক সেজন থাকে সংসারে।"

তাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা—
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ"

তখন কেবল—"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং—শূন্যং মন্যে জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।"

এ রাজ্যে যে দয়িত সেই দেব—যে শ্রেষ্ঠ সেই বরিষ্ঠ—যে বন্ধু সেই জগদেকবন্ধু এবং করুণৈকসিন্ধু—তাই কর্ণামৃতে লীলাশুক বলেছেন—"হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো *** হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে।"

লৌকিক গানেও পাই—

ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে—
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।

এই প্রেম তখন—প্রকৃতিগত—Constitutional বা অস্থিমজ্জাগত হয়ে পড়ে।

"আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও—যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে আর কিছু নাহি চাই গো।
যদি আর কারে ভালবাসো, যদি আর ফিরে নাহি এসো,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও আমি যত দুখ পাই গো॥
(রবীন্দ্রনাথ)

অন্যত্র ফরাসী mystic কবি Madame Guyon, প্রেমের মুখে, কানে কানে এই কথা শুনেছেন এবং বলেছেন—

"Love, this gentle admonition,
Whispers soft within my breast,—
'Choice befits not thy condition
Acquiescence suits thee best.'

অর্থাৎ 'তাই ভালো, যা তোমার ভালো'—'Thy Will be done.' "তাই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নাহি গোপিকার"—এবং—"রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কাম গন্ধ নাহি তায়"। এই 'রজকিনী প্রেম' অন্য অর্থেও সার্থকনামা—কারণ ইহাতে Dyeing এবং cleaning দুই-ই আছে। প্রথমে হয় 'Cleaning'—যখন তার ফলে 'নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে' বারাঙ্গনার অন্তর থেকে তার কুমারী সত্তা তার 'জাম্বুনদ হেম' সদৃশ পবিত্র অন্তরাত্মা আবির্ভূত হয়—বাহিরিয়া আসে—এবং তখন তার গায়ে অনুরাগের রঙের ছোপ লাগে—সেই অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে তখন সে গায় :

"যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা
চোখের দেখা দিতে এসো না—
ভালবেসে যদি দুখ পাও সখা
পায়ে ধরি ভালবেসো না।"

সে ভালবাসা সর্বত্যাগী বৈরাগী,—সে কিছু চায় না, কিছু রাখতেও চায় না,—তাই :

"যাহা চাও সখা দিব ফিরাইয়ে
স্মৃতিটুকু ফিরে চেও না"

জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ কি? এ বিষয়ে লৌকিক প্রেমের কবি Lord Byron যা বলেছেন, অলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক প্রেম প্রসঙ্গে গীতাও তাই বলেছেন। Byron তাঁর প্রিয়ার সম্বন্ধে বলেন :

To know her is to love her
Love but her for ever,—
For Nature made her what she is
And never made another!

গীতাতেও ঠিক তাই,—আমাদের সেই 'তাঁহার' বর্ণনায় বারংবার পাই 'পরমং পুরুষং দিব্যং'—'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ' যিনি ক্ষরাত্মক সর্ব্বভূতের অতীত, 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং' এরও উত্তম। ভগবত্তার কথা না তোলাই ভালো কারণ ঐশ্বর্য নিয়ে প্রেম হয় না—মাধুর্য ব্যতিরেকে।

গীতায় তাই 'এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা' বলবার পূর্ব্বেই শ্রীমান্ পুরুষোত্তম বলে দিয়েছেন—জ্ঞানের লক্ষণের মধ্যেই,—"ময়ি চানন্য-যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।" (১৩।১১)

তিনি যুগপৎ বিশ্বানুগ (immanent) এবং বিশ্বাতিগ (transcendent) 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' তাই ভাগবত বলেন 'আকাশবৎ অন্তরং বহিঃ' (১০।৩০।৪)।

তিনি অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব হলেও (১।২।১১) তিনি পুরুষোত্তম—(Infinite Individuality) মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ (উপনিষদ্) এবং 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী' (গীতা)। Infinite কেন, যেহেতু "তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং, তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং", রমণীয়, কেন না, "ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ"

প্রেমের রাজ্যে আকাশের মত অসীম অর্থে infinite বলা উদ্দেশ্য নহে।

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর। (চরিতামৃত)

অর্থাৎ

ঈশ্বরঃ পরমঃকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

তাঁহার দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন—স্বরূপ লক্ষণ এবং তটস্থ লক্ষণ।

আকৃতে প্রকৃতে জানি স্বরূপ লক্ষণ
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ॥

আমিও এই অর্থেই প্রেমের 'স্বরূপ' ও 'রূপ' ব্যবহার করেছি। বেদের ব্রহ্মোপাসনা কেমন করে ভাগবতের রাগাত্মিক প্রেমে পরিণত হয়—এবং কেমন করে সেই প্রেমই নরনারীর মিলন-মেলায় বিকৃত কামে পর্য্যবসিত হয় তার হেতুভূত এই নবসঙ্গরসায়ন অপূর্ব অনির্বচনীয় বস্তু।

বেদান্ত সৃষ্টিতত্ত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে বললেন :

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব ইতি।"

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"

তার পরের উপলব্ধি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", তার পরের কথা, "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—বেদান্তসূত্র।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।' আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,—আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'—যেহেতু সৃষ্টি করে ব্রহ্ম সৃষ্টির মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট (immanent) হয়েছিলেন সেহেতু ব্রহ্মকে শুধু আনন্দস্বরূপ বলেই শ্রুতি প্রতিনিবৃত্ত হলেন না,—বললেন আরও আগের কথা, সব কথার শেষের কথা মৌন নীরবতা কারণ 'যতো বাচো নিবর্তন্তে' এবং যেখানে আস্বাদন হয় 'মূকবৎ।' বললেন, 'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা নন্দী ভবতি স্বক্ষী ভবত্যমৃতীভবতি'। অর্থাৎ এইবার বেদান্ত করলেন কাব্যের সঙ্গে করমর্দন। যে বেদান্ত বলেন 'আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্ বেদান্তচিন্তয়া' সেই বেদান্ত স্বীকার করলেন যে উচ্চতর বেদান্ত এবং উচ্চতর কাব্যের বিষয়বস্তু একই। বলা যায় না বলেই বিল্বমঙ্গল তাঁর মধুরাষ্টকে 'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো—র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং॥ মধুগন্ধি মৃদু স্মিতমেতদহো—মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ বলেই শেষ করলেন। উপনিষদের 'মধুবাতা ঋতায়তে' ইত্যাদি মধুমতী সূক্তিও তাই।

কারণ কাব্যের লক্ষণ নির্ধারণ করতে গিয়ে আলঙ্কারিকরা স্বীকার করেছেন, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। কাব্যের মধ্যে পাণ্ডিত্য, বৈয়াকরণিক শুদ্ধি এমনকি নৈতিক শ্লীলতাও যে অবশ্য রাখতে হবে এমন কোনও আবশ্যিক বাধ্য-বাধকতা তাঁরা সেকালেও রাখেন নি, কিন্তু রেখেছেন তার জন্য শুধু রসের কষ্টিপাথর রেখেছেন তার জন্য রসিকদের চিত্তবিনোদনের এবং অনুমোদনের মানদণ্ড যার জন্য স্বয়ং কালিদাসও বলেছেন—"আপরি-তোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্"।

এই রসব্রহ্মের পরিচিতির পর, বেদান্ত' আর শ্রুতি স্মৃতি ন্যায়—অর্থাৎ উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদ্গীতার মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকতে পারল না। তখন স্বয়ং বেদব্যাসকেই বেদান্তসূত্রের বেদান্তের সঙ্গে কাব্যের পরিণয়ে ঘটকালি

করবার জন্ম এবং সেই প্রয়োজনে অভিনব ভাষ্য প্রণয়ন করবার জন্ম শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রণয়ন করতে হ'ল। তাই দেখি, ব্রহ্মসূত্রের মঙ্গলাচরণের পর প্রথম সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এবং ভাগবতেরও প্রথম শ্লোক—

"জন্মাদ্যস্যযতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্—
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

এই এক শ্লোকেই সমগ্র বেদান্তের মূলকথা আবৃত্তি করে রসশাস্ত্রের মঙ্গলাচরণ এবং রাসস্থলীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হ'ল। বৈদান্তিকরা যেমন বলেন, অবিদ্যাবশতঃ দড়িই হয় সাপ, রজ্জুতে সর্পভ্রম অধ্যস্ত হয় বলে। রসিকরাও বলেন, প্রেমই হয় কাম, দেহে আত্মবুদ্ধি অধ্যস্ত হয় বলে এবং সেই ভ্রমবুদ্ধিতে দেহের সুখে আত্মসুখ- কামনা হানা দেয় বলে। এই আত্মসুখাকাঙ্ক্ষা অধ্যস্ত যে-দেহের দেউলে 'আত্মা' বাস করেন—সে বাড়ীটাই কামরূপের হানাবাড়ি। তাই গীতা বলেন, "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্"। "দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্তের স্থান"—চরিতামৃত। প্রেমভক্তির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে শাণ্ডিল্য বলেছেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—অর্থাৎ ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই প্রেম। কিন্তু নারদ আরও সার্বজনীন এবং উদারভাবে বলেছেন—"সা কস্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা" অর্থাৎ তা কাহারও প্রতি পরমপ্রেমরূপ। মনে হয় তাই এই প্রেমযোগকেই স্বীকৃতি দান করে—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" বলে—মনঃসংযমের উপায় নির্ধারণ প্রসঙ্গে ঋষি পতঞ্জলিও উদারভাবে সূত্র প্রণয়ন করেছেন—"যথাভিমতধ্যানাদ্বা"। দুর্বাসা যখন দুষ্মন্ত-ধ্যানমগ্না শকুন্তলাকে অভিশাপ দান করেন তখন কি শকুন্তলা ঠিক এই সূত্রেরই প্রমাণস্বরূপে ধ্যানসমাধিস্থা ছিলেন না?

"অয়ি অতিথি পরিভাবিণি!—
বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তাং প্রথমং কৃতামিব॥"

বিপ্রপত্নী যাঁরা রাসস্থলীতে যেতে পাননি তাঁরা ধ্যানযোগে দেহের শৃঙ্খল কেটে

পিঞ্জরমুক্ত বিদেহ আত্মা নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন—"ধ্যানেন যামঃ পদয়োঃ পদবীং সখে তে" "তদনুস্মরণধ্বস্ত জীবকোষাস্তমধ্যগন্" ভাগবত (১০।৮২।৪৭)

"যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" তাই তাঁরা বলতে পারেন—

"সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও ?"

কারণ তখন—

"আঁখির নিমেষে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি
চণ্ডিদাস কয় পরশরতন গলায় গাঁথিয়া পরি।"

ভাগবতেও দেখি এই ধ্যানযোগে বিদেহমুক্তি অথবা মুক্তি কেন বলি, বলি প্রিয়সংযুক্তিলাভ যথা :

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥

এবং তারপর

দুঃসহ-প্রেষ্ঠ-বিরহ-তীব্র-তাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥

কামে হয় বিষয়-তৃষ্ণা এবং প্রেমে হয় বিষয়-বিস্মরণ। কাম আপনার সুখে সুখী, প্রেম প্রিয়ের দয়িতের বা দয়িতার সুখেই সুখী। কামে আত্মচিন্তা, প্রেমে সমর্পণ। আত্মহারা প্রেমের পরিণামে হয় একেবারে আত্মজ্ঞানশূন্যতা। কাম চায় ভোগ, প্রেম চায় ত্যাগ। কামের উদাহরণ ভ্রমর, প্রেমের উদাহরণ পতঙ্গ। তাই তাদের বর্ণনার পার্থক্য দ্রষ্টব্য :

"ভ্রমর গোলাপে কহে—'আমি তোরে কত ভালবাসি
রজনী প্রভাত হলে নানা ছলে তাই নিতি আসি'।
পতঙ্গ শুনিয়া কানে হাসিয়া বিদ্রূপ করি কহে—
'লম্পট কি জানে প্রেম মন তার মধুপানে রহে।
প্রিয়া মোর দীপশিখা আমি তার রূপে পুড়ে মরি
ভস্মীভূত প্রাণ মোর প্রেম তবু ফিরে হা-হা করি'।" (স্বরচিত)

এই কাম ও প্রেমের প্রভেদ প্রদর্শনে চরিতামৃতকার চিরস্মরণীয়।

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল।
** সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ—
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি অন্য দাগ।
অতএব কামে প্রেমে বহুত অন্তর
কাম অন্ধতমঃ প্রেম উজ্জ্বল ভাস্কর।
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ।

এ জন্যেই "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।" চণ্ডিদাসও মধুর ভাবে এই প্রেম বা পিরীতির বিশ্লেষণ করেছেন।

"বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে নিরমাণ কৈল 'পি'
সুখের সাগর মন্থন করিয়া তাহে উপজিল 'রি'
অমিয় ছানিয়া যে রস রহিল তাহে বিনাইল 'তি'
এ হেন পিরীতি লভিল যে জন তার অবশেষ কি ?"
** "কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর নিরমিল তার জল
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর প্রাণ করে টলমল।
গুরুজন জ্বালা জলের শিহলা পড়শী জিয়ল মাছে
কুল পানিফল কাঁটায় সকল সলিল বেড়িয়া আছে।
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছানিয়া খাইল যদি
অন্তরে বাহিরে কটু কটু করে সুখে দুখ দিল বিধি।
কহে চণ্ডিদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই।"

অন্য পদে বলেছেন—

চণ্ডিদাস বাণী, শুন বিনোদিনী পিরিতি না কহে কথা
পিরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পিরিতি মিলয়ে তথা

আর একটি সমস্যার সমাধানও কবিরাজ গোস্বামী করিয়াছেন—
সেটি এই—"গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ।
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়
তাহা হৈতে বহু গুণ গোপী আস্বাদয়।
তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ।
এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান
গোপীর সুখ কৃষ্ণসুখে পর্যবসান।
গোপীর দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা
সে মাধুর্য বাড়ে যার নাহিক সমতা।
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ।
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে
এই হেতু গোপী প্রেমে নাহি কাম দোষে।

তাই পাই আদিপুরাণে—

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥

প্রেম তত্ত্ববিদ্‌রা যৌন প্রেমকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। বলেছেন, প্রেম বা রতি তিন প্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা। ইহার উদাহরণ স্থলে 'সাধারণ' প্রেমকেই প্রথম ধরা যাক্।

প্রথম—

শুধু প্রেম শুধু মনের মিলন মিলনের ভালবাসা
বেগবান প্রেম প্রেমের আবেগে বিনিময় প্রত্যাশা।
প্রেমের মিতালী তালীয় রসের নিঃসৃত নির্যাস
জোয়ারের টান প্রবল তুফান ফেনিলোচ্ছল ভাষ।
'সাধারণ'-প্রেম সুখের প্রবাহ, আমার সুখের লাগি
আমি করি প্রেম তুমি কর প্রেম দেহের মিলন মাগি।

দ্বিতীয়—

দ্বিতীয় যে প্রেম সমন্বয়ের উভয়-'সমঞ্জসা'
অর্ধেক দিয়া অর্ধেক নিয়া আপোষে হিসাব কষা।

তৃতীয়—

প্রেমের তৃতীয় সমধিক প্রিয় উজলে মধুরে খাঁটি
উজাড় করিয়া দেয় যেই প্রেম 'সমর্থ' পরিপাটি।
তুমি সুখী হবে আমারে বাসিয়া—তোমারে বাসিয়া আমি,
দেহের গেহের গণ্ডী ভাঙিয়া অলকানন্দাগামী।
অবধির সীমা প্রেমের মহিমা পরিধি মানে কি কভু?
আরো আছে আরো দাও তবু আরো নাহি সে ফুরায় তবু।

বৈষ্ণব কবিতা পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে এই শেষোক্ত প্রেমে পরিপূর্ণ—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী এই মধুর রসের একখানি অপরূপ ছবি—

যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে
সে যে একলা কালা কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথপানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়—
(আমি) না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মানভরে।

মীরার প্রেমও এই প্রেম—

"মেরে তো গিরিধারী গোপাল দুসরা না কোই—"

গীতায় শ্রীভগবান "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" স্বীকার করেছেন—শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—

"অহং ভক্তপরাধীনোহ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।"
"নাহমাত্মানমাশংসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।"
"ময়ি নিবদ্ধ হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।"
"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।"

ঠিক অনুরূপ ভজনাত্মক মধুর রসের অভিব্যক্তি পাই Christan mystic ভক্তদের মুখে—

It is a passive & joyous yielding up of the virgin soul to its Bridegroom, a silent marriage vow. It is ready for all that may happen to it, all that may be asked of it, to give itself and lose itself, to wait upon the pleasure of its Love (Underhill, p. 391)

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'Theosophical Gleanings-এ God as Love শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন শ্রীরাধাই মহাভাবের অভিব্যক্তি বা acme তিনি 'মহাভাবময়ী'।

'Radha is the prototype of all lovers of God, male or female. Only her love is human love raised to the 'n'-th power."

প্রেমিক ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান ষড়ৈশ্বর্যময় নহেন—তিনি প্রেমময়—Dulce Amori বা Sweetest Love—ভক্ত যখন রাগমার্গে প্রবেশ করেন—ব্রজভূমিতে প্রবেশ করেন,—তখন তাঁর ভক্তি (devotion) প্রেম (love)এ পরিণত হয়।

F. W. Newman বলেন—If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness it must become woman—yes, however manly you may be among men. রাগমার্গকে তাঁরা বলেন, King's highway that leads man back to the country of his soul.

পূর্বরাগকে তাঁরা বলেন, The first flame of love.

প্রেমিক ভক্ত বলেন "Oh Love! I give myself to thee, Thine ever only thine to be." প্রার্থনা করেন—Please Thee to unite me to thyself, making my soul thy bride, I will rejoice in nothing—till I am in thine arms. St. Catharine-এর মুখে তাই শুনি—"Companionship with Love Divine-এর কথা।

প্রেমিক ভক্ত যখন নারী হয়ে পুরুষোত্তমে 'কাম' নিবেদন করেন তখন—'মহাশনো মহাপাপ্মা' এই কাম বর্জিত হয় না, নিগৃহীত হয় না—তার

suppression হয় না—,যার প্রতি লক্ষ্য করে গীতা বলেছেন—"প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" শাস্ত্রের শাসনবাক্যে তার কি করতে পারে? তবে কি হয়? হয় psychological sublimation বা পারদের স্থায় ঊর্ধ্বপাতন। Mystic (Osespeusky) বলেন—'Of all we know in life, only in love is there a taste of the mystical ecstasy. Consequently in true mysticism,—there is no sacrifice of feeling. Mystical sensations are sensations of the same category as the sensations of love,—only infinitely higher and more complex."

তাই দেবর্ষি নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলেছেন—"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধলোভাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ং তস্মিন্নেব করণীয়ম্।" তাহা পরিপূর্ণ sublimation ব্যতীত আর কিছুই নয়।

Christian mystic-রাও ঈশ্বর এবং জীবের প্রেমের পারস্পরিকতায় বা অন্যোন্যাশ্রয়িত্বে বিশ্বাসবান। এই প্রেম reciprocal অর্থাৎ when the love of God arises in the heart, without doubt, God also feels love for thee.

ভক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের অপূর্ব গান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

"কে বলে হরি রাজা হরি প্রেমের ভিখারী।
প্রেমের ভিক্ষা পায় না বলে চক্ষে বহে প্রেমের বারি।
ভিক্ষার ঝুলি ঝুলিয়ে কাঁধে দাঁড়িয়ে দ্বারে হরি কাঁদে,
হাসিমাখা বদনচাঁদে বিষাদ রেখা সারি সারি।
প্রেম না পেলেও কাঁদে, পেলেও কাঁদে,—
প্রেমেই পাগল প্রেমের হরি।"

আধ্যাত্মিক প্রেম রাজ্যের এই পরস্পরের প্রতি টান বা আকর্ষণ অবিচ্ছেদ্য। তাই শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশী—যার সুরে "ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ"—অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কটাহের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে ওঠে,— "লোকান্নুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্"—বেজে উঠে বিশ্বজয়ী বংশীনাদ। এই ব্রহ্মাণ্ডও আবার সংখ্যায় কোটি কোটি—"কোটি কোটি যুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি বৈ"। বিজ্ঞান বলেন, each star is a sun, —and as such the centre of a solar system,

প্রেমের আদি রসের আদিম কথাটি আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদেই পাই। ব্রহ্ম অবিভিন্ন নির্বিশিষ্ট ভাবে একান্ত একাকী ছিলেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু একাকী কোনও খেলা বা লীলা বা আনন্দ উপভোগ হয় না। অতএব স বৈ (একাকী) নৈব রেমে—তস্মাৎ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ সঃ অকাময়ত জায়া মে স্যাৎ। (বৃহঃ ১।৪।৩)। স হ এতাবান্ আস,—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ। স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্। (বৃহঃ ১।৪।৩)

বৈষ্ণব পরিভাষায় এই পরম পতি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং এই পত্নী পরা প্রকৃতি শ্রীরাধা।

যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপৌ বভূব হ
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গং বামার্দ্ধং প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥

অদ্বৈতের পর এই দ্বৈত ভাব বা দ্বৈতাদ্বৈত ভাব—অথবা অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ই 'লোকবৎ' দেবীলীলার দার্শনিক ভিত্তি। কারণ এই ভেদ ও অভেদ অচিন্তনীয় এবং অনির্বচনীয়।

আত্মা তু রাধিকা তস্য তৈয়েব রমণাদসৌ
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বাদিভিঃ। (স্কন্দ পুরাণ)।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও পাই—"মমার্দ্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূল প্রকৃতিরীশ্বরী" এই যে খেলা সুরু হ'ল এই খেলা এবং লীলা সম্পূর্ণ লৌকিক জগতের অনুরূপ,—তাই ব্রহ্মসূত্রে পাই "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। এবং এই খেলাও জমে না,—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য জ্ঞান নিয়ে তৃণাদপি তুচ্ছ জীবভাবাশ্রিত প্রেমিকার সঙ্গে। তাই কবিরাজ গোস্বামীর লেখায় পাই—

"ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।

* *

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি—
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন।

** মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন-পালন।
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ
'তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম।'
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥

চৈতন্য চরিতামৃত (আদি ৪র্থ)

তাই পদকর্তার মুখে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

প্রিয়ে। তুমি মহাজন কি কর ভৎর্সন
সুধাসম মোর লাগে।

এবং সে জন্যই,—কেবল যে রাগমার্গে—

ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে
তার কৃষ্ণমাধুর্য সুলভ॥

তাই Christian mystic-রাও বলেন—

Love raises the spirit above reverence into one of laughter and dalliance * * Lovers of God have a horror of solemnity * * They are not frightened with any amazement,—they are at home (Underhill's Mysticism).

তাই অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন এবং যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন সম্পূর্ণ পৃথক। অর্জুন স্তব করেন, 'সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য"—মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কেউ কোনও অভিচার করেছে ভেবে বুকে হয়তো মুখামৃত দিয়ে দুর্গানাম জপ করে আপন বক্ষে জড়িয়ে ধরেন।

প্রবাসী ভাদ্র ১৩৬৭।

কবিতিলক অক্ষয়কুমার বড়াল

বিগত ২রা এপ্রিল শনিবারে এবং ৩রা এপ্রিল রবিবারে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের শতবার্ষিক জন্মোৎসব পালিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এবং সাহিত্য তীর্থে। উভয়ত্রই কবিবর শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক সভাপতি ছিলেন। তিনি দুঃখ করিয়া মন্তব্য করেন যে, তাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসব রাজোচিতভাবে পালিত হওয়া উচিত ছিল, এবং দানসাগরের পরিবর্তে কবির এই তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ দেশবাসীর দুর্ভাগ্য এবং ঔদাসীন্যতার পরিচায়ক।

অধুনা দেশবাসী প্রতিভাবান কবি অক্ষয়কুমারকে এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পোজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল কবিদের নাম ও রচনাবলী ভুলিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্য-কীর্তিগুলি স্মরণ করা, রক্ষা করা, তুলনামূলক সমালোচনা ও অনুশীলন করা প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান এবং সাহিত্য সম্মিলনীর অবশ্য কর্তব্য।

কবির জীবনপঞ্জী: জন্ম ইং ১৮৬০, বং ১২৬৭, স্থান ৯নং শ্রীনাথ রায় লেন, চোরবাগান। কবি ১৭ বৎর বয়সে কবি বিহারীলালের সংস্পর্শে আসেন। ২৫ বৎসর বয়সে কবির পিতৃবিয়োগ হয়। ইং ১৯০৭, বং ১৩১৩, ১৯ মাঘ কবি-পত্নী সুবাসিনীর মৃত্যু হয়—কবির ৪৬ বৎসর বয়সে। কবির মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে বঙ্গধর্ম মহামণ্ডল তাঁহাকে 'কবিতিলক' উপাধি দেন। কবির মৃত্যু হয় ইং ১৯ জুন, ১৯১৯ বং ১৩২৬, ৪ঠা আষাঢ়।

গ্রন্থপ্রকাশ ১। প্রদীপ ২। কনকাঞ্জলি ৩। 'ভুল' ৪। শঙ্খ কবির ৫০ বৎসর বয়সে সঙ্কলিত। (১৩১৩, ১৯ মাঘ কবির পত্নীবিয়োগে তাঁহার দ্বিধাবিভক্ত জীবনের দ্বিতীয় বা শেষ পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। শঙ্খের 'বিপত্নীক, কবিতা হইতেই প্রকৃতপক্ষে 'এষার' আরম্ভ।) ৫। এষা ১৩১৯ শেষ কাব্যগ্রন্থ, ৬। বিবিধ (কবিতা ও গান) অপ্রকাশিত বা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতাগুলি মৃত্যুর পরে সঙ্কলিত হয়, ৭। চণ্ডীদাস নাটক অসম্পূর্ণ।

কবি অক্ষয়কুমার 'জাত কবি' ছিলেন অর্থাৎ সহজাত কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার কাব্য রচনা তাঁহার কবিমানসের এক মহতী অভিব্যক্তি।

তাঁহার দৃষ্টি উদার, তাঁহার কল্পনা বলিষ্ঠ, ভাব গম্ভীর, ভাষা ও ছন্দযোজনা সাবলীল এবং সুষমাপূর্ণ, তাঁহার বাস্তবদৃষ্টি ও কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সংযোগ সহজবোধ্য স্বচ্ছ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁহার হৃদয়াবেগ সুসংযত এবং প্রকাশ-ভঙ্গী মধুর ও মর্মস্পর্শী।

সমসাময়িক মনীষিগণের মধ্যে সুরেশ সমাজপতি, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, ডক্টর ব্রজেন শীল, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডক্টর সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, ম-ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রিয়লাল দাস বড়াল কবি সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সহিত সমালোচনা করিয়াছেন। সুরেশ সমাজপতি সমালোচনার শলাকা দিয়া কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রদীপে'র উজ্জ্বল শিখা উজ্জ্বলতর করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কবিতার যে উপাদানে কবির গূঢ় শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই ব্যঞ্জনা। কবিতা সুন্দর, ব্যঞ্জনা সুন্দরতর। প্রদীপের অধিকাংশ কবিতা এই ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের মত অক্ষয়কুমারও কবি বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবিত হন। তবে রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় শক্তিতে,—সে প্রভাব অতিক্রম করিয়া "স্বে মহিম্নি"—বা স্বকীয় মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিহারীলালের ভাবভঙ্গী ও ভাষা, রূপ এবং রীতি অক্ষয়কুমারেই পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার ১৭ বৎসর বয়সে তিনি বিহারীলালের সংস্পর্শে আসেন ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কাব্য সাহিত্যকে বিহারীলাল ভগীরথের মত এক অভিনব পবিত্র এবং গভীর খাতে প্রবাহিত করেন, কাব্যে একটি নূতন ধারা উৎসারিত করেন। কবির অন্তর থেকেই সে ধারার উদ্ভব, সে উৎসের উৎসরণ এবং গঙ্গাবতারণের মতই তাহা মহিমান্বিত এবং ঐশ্বর্যে মাধুর্যে পরিপূর্ণ। এই ধারা আত্মকেন্দ্রিক বা Subjective ভাব থেকে রূপে এবং রূপ থেকে ভাবে abstract to concrete & vice versa ক্রান্তির যে অনির্বচনীয় রীতি, প্রতীতি ও প্রকাশভঙ্গী,—তাহার পথ বাংলা কাব্যে প্রথম আবিষ্কৃত হইল, খাঁটি গীতিকাব্যের এই প্রথম সূত্রপাত। উপনিষদে পাই—

পরাঞ্চিখানিব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ স্তস্মাৎপরাং পশ্যতি নান্তরাত্মা
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥

আবৃত্তচক্ষু হয়ে অন্তরাত্মাকে দর্শন করার মতই বাংলার কবি আপনার ভাবসমুদ্রে অবগাহন করে ডুবুরির মত মুক্তাচয়ন সুরু করলেন।

প্রদীপের একটি কবিতা 'হৃদয় সংগ্রাম' পাঠে ডক্টর ব্রজেন শীল বলেন, এইখানে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের Romanticism-এর জন্ম হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কুরুক্ষেত্রে 'হৃদয় সংগ্রামে' ও 'জীবন সংগ্রামে' সকল আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন পরিজন যেন এক একজন 'যোদ্ধা বিচক্ষণ'!

কী ভীষণ চলেছে সংগ্রাম, প্রিয়জন সনে অবিরাম!
"পূজ্য বৃদ্ধ পিতামাতা, স্নেহের পুত্তলী ভ্রাতা,
সহোদরা বালিকা সুঠাম
তাহারাও জনে জনে, উন্মত্ত এ মহারণে,
হা জীবন! হায় ধরাধাম!
প্রাণাধিকা প্রাণেশ্বরী, তারো সনে যুদ্ধ করি
সেও শত্রুসেনা একজন
শত তপস্যার ফল, এই শিশু সুকোমল,
এও এক যোদ্ধা বিচক্ষণ!"

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কুরুক্ষেত্র—এ এক "দেবাসুর রণক্ষেত্র সর্বতীর্থসার"। ইহা পাপাসুর এবং পুণ্য দেবতার রণভূমি। কবি তাঁর মনোময়ী মূর্তিকে অন্তরের ছায়ালোক থেকে উদ্বোধন করে আহ্বান জানিয়েছেন নিজের অহং মমত্ব অভিমান নাশ করে—সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে—এই চিত্রে রূপক কাব্যের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। 'প্রদীপে' আদিরসাত্মক কবিতা আছে,—কিন্তু তাহার সংযম ও শুচিতাই তাহার বিশেষত্ব। সমাজপতি বলেন, "প্রথম বয়সের কবিতায় এমন সংযম প্রায় দেখা যায় না। উত্তরকালে কবি যে সুরুচি ও সুনীতির পরিচয় দিয়াছেন এই প্রদীপেই তাহার প্রথম সূচনা।"

বড়াল কবির গীতি কবিতায় দুঃখ আছে, দুঃখের কথা আছে কিন্তু তাহা দুঃখবাদ নহে,—Pessimism বা Cynicism নহে। এ দুঃখ তাঁহার 'বিষাদ যোগ'। ইহা হইতে যাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়, যাহা 'সুখমাত্যন্তিকম্' যাহা সুখের নন্দনকানন তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য দুঃখবাদের মত দুঃখেই তাহার উৎপত্তি এবং দুঃখেই তাহার নিবৃত্তি নহে। সে দুঃখবাদ নিরাশ্রয়,— নিরাশ্রয়ের কারণ নাস্তিকতা এবং তাহার ফল নাশ ধ্বংস মৃত্যু।

বড়াল কবির দুঃখবাদ গীতার বিষাদ যোগ,—তিনি দুঃখে অভিভূত হন কিন্তু নিষ্পিষ্ট হন না,—এই দুঃখবাদ আধ্যাত্মিকতার প্রথম তোরণ, সাধনদুর্গের প্রথম সিংহদ্বার, এই দুঃখ অতিক্রম করাই তাঁহার পরম পুরুষার্থ। এখানে

অবিশ্বাস নাই, নাস্তিকতার স্থান নাই। এ-দুঃখ যে তাপ দেয়, তা তপস্যার তাপ, পঞ্চতপা সন্ন্যাসীর সাধনার অঙ্গমাত্র,—ইহা আত্মজ্ঞানদায়ক আত্মনাশের কারণ নহে। মেঘের পশ্চাতে সূর্যালোকের ন্যায় দুঃখের পরপারে ভূমানন্দের আভাস। কেননা ইহার পিছনে গীতার আশ্বাসবাণী

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

কবি তাঁর অন্তর দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করেন এবং অনন্ত সান্ত্বনা লাভ করেন 'এষা'র সমাপ্তি পংক্তিতে :

ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেম ওহে দয়াময়
মরণে নহি ত ভিন্ন, প্রেমসূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়,
শোকে ধূ ধূ হৃদিমরু, আছে তার কল্পতরু
নেত্রনীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয়।

* * *

মরণে কি পুড়ে প্রেম অনলে কি পুড়ে প্রাণ
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্মদান ?

এই বেদনা তাঁহাকে আত্মহারা করে নাই, আত্মস্থ করিয়াছে, ভগবন্মুখী করিয়াছে তাই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন—

দাও প্রেম, আরো প্রেম চির প্রেমময়,
আরো জ্ঞান আরো ভক্তি আরো আত্মজয়শক্তি
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়।
জীবন মরণ পানে বয়ে যাক্ সুরে গানে
হোক প্রেমামৃত পানে অমর হৃদয়।

তিনি ঈশ্বরকে মানুষের সুখ-দুঃখ প্রণোদিত ভালো-মন্দ বিচারের ঊর্ধ্বে রাখিয়াছেন :

"অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার
আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ধরি কত ভাঙ্গি কত গড়ি
করি কত সত্য মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার—
নিজ সুখ দুঃখ দিয়া তোমারে গড়িয়া নিয়া
বসি কত ভালমন্দ করিতে বিচার।"

বড়াল কবির কবিতায় নারী পুরুষের ভোগবিলাসের উপাদান শিশিত-পুত্তলী মাত্র নহেন, যাহার বর্ণনায় শঙ্কর বলেছেন :

নারী স্তনভরণাভিনিবেশা মিথ্যামায়া মোহাবেশা।
এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারংবারম্॥

কবির চক্ষে নারী "এ নির্মম জীবন সংগ্রামে তুমি বিধাতার আশীর্বাদ", "বিধাতার মহাকাব্য তুমি, সসীমে অসীমে সম্মিলনী"—

অথবা—"অসম্পূর্ণ এ সংসারে, তুমি পূর্ণতার দীপ্তি, সান্ধ্য মেঘে স্বর্গের আভাস।"

এই কবি দৃষ্টি —Sees Helen's beauty in the brow of Egypt, কবি নারী প্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতির মতই উদার মুগ্ধ নেত্রে দর্শন করেছেন" "আহা প্রাণারাম কিবা, নির্মল উজ্জ্বল বিভা, চারিদিকে খেলিছে তোমার, ছড়াইছে সৌন্দর্য অপার।"

অথবা—"একবার নারী তব প্রেমমুখ হেরি
আর বার প্রকৃতির শ্যামবুক হেরি
মনে হয় দুই জনে দুখানি মেঘের মত
রহিয়াছে জগতেরে ঘেরি,—
আমি তোমাদের মাঝে একটি বিদ্যুৎসম
চকিতে জ্বলিয়া
মিশায়ে মিলায়ে যাই মিশিয়া মিলিয়া।"

কবির দৃষ্টি এখানে সসীম হইতে অসীমে—শান্ত হইতে অশান্তে—গৃহাকাশ হইতে অন্তরীক্ষে মহাকাশে পরিব্যাপ্ত।

অক্ষয়কুমার সাধক এবং ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ রূপসাগরে ডুব দেন 'অরূপ রতন আশা করি'। বড়াল কবিও রূপে নিমগ্ন হয়ে অরূপের এবং অপরূপের সন্ধান পান।

তিনি সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী'র সৌন্দর্যের আভাস পান, যাহা দেখিতে দেখিতে, সুরেশ সমাজপতির ভাষায় বলি :—কবি অনুভব করেন যে, "তাঁহার দৃষ্টি অপরূপের সৌন্দর্যে মগ্ন হইয়া যায় বাসনার তরঙ্গ প্রেমের বিক্ষোভহীন পারাবারে মিশিয়া লুপ্ত হইয়া যায়।"

তাঁহার প্রেমের কবিতায় লালসার পঙ্কিলতা নাই,—"সে প্রেম সর্বত্র অগ্নিপূত শুদ্ধ হেম। তাহা ভোগতৃষ্ণার হাহাকার নহে, আত্মবিস্মৃত ভক্তের আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।"

অক্ষয়কুমারের কবিতা মানবিকতা (Humanism) ধর্মে এবং মানবিক সমবেদনায় সমৃদ্ধ। তিনি মানুষকে ভালবাসেন, মানুষের সুখে তিনি হাসেন, দুঃখে কাঁদেন, আর্তি এবং সহানুভূতি প্রকাশ করেন। সমাজপতি বলেন—"এই জন্যই তাঁহার কবিতার ঝঙ্কারে আমাদের প্রাণের তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। তাঁহাকে এই বিপুল মানব পরিবারের একজন নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই মনে হয়।"

কবি মানবহৃদয়ের কাঙাল—তাই তাঁর কবিতায় পাই:

"কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়
ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয় হৃদয়।" (শঙ্খ)

'কনকাঞ্জলি' (১২৯২ বঙ্গাব্দ)-র ভূমিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, কবির "প্রেমে লালসা নাই, আত্মবিসর্জনও আছে। যাহা স্থায়ী রস তাহাই কাব্যের প্রকৃত রস, সেই রসে অক্ষয়-গীতিকাব্য চির-অভিষিক্ত।"

অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার অন্তরের আকুতি এবং দৈন্যের প্রকাশ লক্ষণীয়—

"ঘুমায়ে পড়েছে জগৎ সংসার
পত্রেপুষ্পে সমাবৃত মলয় নিশ্বাসে
বিমূঢ় হৃদয় ভাবে কোথা ভাষা তার,
কি দিয়া নবীন পিক্ বসন্তে সম্ভাষে?
জানি কি বলিতে চাই,—জানি না কি বলি
ক্ষম এই অক্ষমতা সত্যে নাহি ছলি।" (কনকাঞ্জলি)

'মহতো মহীয়ান্'কে 'অণোরণীয়ানে'র মধ্যে দর্শন করার দিব্য দৃষ্টি তাঁহার আছে:

ক্ষুদ্র বনফুল-বাসে, সারাটা বসন্ত ভাসে
ক্ষুদ্র ঊর্মিমূলে বুলে প্রলয় প্লাবন,—
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে চির ঊষা জেগে আছে
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।"

নন্দগোপাল বলেন :

"পদ্মাতীরে বেলকাঠ মাথায় দিয়ে চিতা-শয্যায় শায়িতা প্রিয়ার স্মৃতিতে উদ্‌ভ্রান্ত গোবিন্দ দাসের উচ্ছ্বসিত কান্না এ নয়,—আবার মৃত্যু মহোৎসবের ভেতর দিয়ে চিরন্তন অমরত্বে অভিষিক্তা প্রিয়ার স্মৃতিতে আশ্বস্ত রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তির তাত্ত্বিকতাও এ নয়—এই হ'ল সেই সুগভীর বেদনার অভিব্যক্তি যা আপামর সাধারণের নিত্যকার অনুভূতি।" বড়াল কবির আছে 'সমাহিত স্নিগ্ধতা'—যা গোবিন্দ দাসের 'বাঁধন ছেঁড়া ভাবোন্মত্ততার পাশে আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়।

'শঙ্খ' সম্বন্ধে ডক্টর সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন,

'ঝটিকার শেষে প্রকৃতির শান্ত প্রসন্নতা'ই 'শঙ্খের প্রধান সুর। ইহাতে আর···"যাতনার জ্বালা নাই ইহা একটি বিষণ্ণ মধুর আকার ধারণ করিয়াছে। ঊষার শুকতারাই সন্ধ্যার সন্ধ্যাতারা হইয়া দেখা দিয়াছে। সায়াহ্নের কোমল স্নিগ্ধতায় তাহার রূপ অপরূপ হইয়াছে।" (নানা নিবন্ধ, পৃঃ ২৭৯-৮১)

'বিপত্নীক' হইতে অল্প কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

বিশাল সংসার সেই পড়ে আছে হায়!
সেই দিন যায় বয়ে, আলোক আঁধার লয়ে
একা আছি শূন্যে চেয়ে এ শূন্য ধরায়।
সে-ই নাই হায়!

* * *

কতদিন গেছে চলে নাহি আর গৃহতলে
লুণ্ঠিত অঞ্চল চিহ্ন চরণের দাগ,—
নাহি আর এ শয্যায় সেরূপ আভাস হায়!
সে পবিত্র দেহগন্ধ সে স্বপ্ন সজাগ!

* * *

তার সে আদুরে মেয়ে দ্বারে বসে পথ চেয়ে
ঠোঁটে আর হাসি নাই মুখে নাই রব,—
কোলে তুলে নিতে গেলে অমনি কাঁদিয়া ফেলে
ঘরে যেন কেহ নাই পথে যেন সব!

দাস দাসী পরিজন সকলেই ভাঙামন
ফিরিয়া পলাতে পেলে প্রাণ যেন পায়—
আঁধারে দুঃস্বপ্ন সম কি দীর্ঘ জীবন মম
কারে কি সান্ত্বনা দিব কে দিবে আমায় ?

ডক্টর সাহা বলেন—অক্ষয়কুমারের প্রদীপ প্রভৃতি চারখানি গ্রন্থে তাঁহার কবি প্রতিভার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু "এষাতে"ই তাঁহার রচনামাধুর্যের ও কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি লক্ষিত হয়। পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী বা আত্মীয় বিয়োগের ফলে বঙ্গ-সাহিত্যে যে সমস্ত গদ্য ও পদ্য রচনা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে 'এষা' তাহাদের মুকুটমণি। কেননা 'এষা' বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের একখানি আলেখ্যকে অতি দক্ষতার সহিত কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপান্তরে পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছে।

শোক সাহিত্যে গদ্যে চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' মানকুমারীর 'প্রিয়প্রসঙ্গ' স্মরণীয় রচনা। পদ্যে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী-বিয়োগের কবিতাবলী, গিরিজাকুমারের 'পত্রপুষ্প', কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা', গিরীন্দ্র মোহিনীর 'অশ্রুকণা', যদুনাথ চক্রবর্তীর 'সতী প্রশস্তি' শোকাত্মক কাব্য সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। তন্মধ্যে 'এষা'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোহিতলালের বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য হইতে সারাংশ উদ্ধৃত হইল।

সমগ্র 'এষা' কাব্যখানি বাঙালী কবির দাম্পত্য প্রীতির একটি মহিমময়ী মূর্তি। বিহারীলাল যাহাকে আপন ইষ্টদেবতার আসনে বসাইয়া ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ যাঁহাকে সংসারে ও সমাজে তাঁহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ভাব-ভোলা কবিত্বের আবীর কুঙ্কুমে যাহার অর্চনা করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার তাহাকেই বাঙালীর গৃহপ্রাঙ্গণে নিত্য লক্ষ্মীপূজার উৎসবে বাস্তব সুখ দুঃখের গন্ধপুষ্প ও সুগভীর স্নেহ রসের আলিপনায় হৃদয়েশ্বরীরূপে বন্দনা করিয়াছেন। ...যেরূপ একাধারে রাধিকা ও অর্পণা আত্মবিগলিত অথচ 'আত্মস্থ'—গ্রহণে দুর্বল, ত্যাগে রাজরাজেশ্বরী, যেরূপ যুগল প্রেমের রসাবেশে ও দাস্য সখ্য বাৎসল্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণে প্রাণে ভাবের ঘোর সৃষ্টি করে—অক্ষয়কুমার জীবনে সেইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সেই নারীবিগ্রহের আরতি করিয়াছেন।"

অর্থাৎ যে দেবী "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" বিরাজ করিতেছেন, কবি

তাঁহারই গৃহীণাং গৃহদেবতারূপকে অন্তরের সমস্ত আকৃতি দিয়া প্রেমের পঞ্চপ্রদীপে আরতি করিয়াছেন।

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল—সর্ব সংস্কারশূন্য হইয়া কবির 'এষা' কাব্যখানি সর্বপ্রথম পড়িয়া মন্তব্য করিয়াছেন: আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমার এই শোকাত্মক গীতি কাব্যে এক অপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে এই এষাখানি বিশ্বসাহিত্যেও অতি উচ্চস্থান পাইতে পারে, ইহাতে বিন্দুমাত্র অতিশয় উক্তি আছে বলিয়া আমি মনে করি না।"

শোক সঙ্গীতের মধ্যে 'এষা',—"একটি অনন্যলব্ধ সত্তা ও সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে।" "অক্ষয়কুমার এষাকে যে শোকের উপর গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা বিশ্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে…কবি এখানে সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া সমগ্র মানবপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গতি মিলাইয়া আপনার শোকগাথা গাহিয়াছেন, তাই তাঁহার এষার মধ্যে প্রত্যেক শোকার্ত পাঠক আপনাকে দেখিতে পাইয়া আপনার অন্তরের শোকের বা শোকস্মৃতির বিশ্বজনীনত্বটুকু উপলব্ধি করিয়া চকিত স্তম্ভিত ও পুলকিত হইয়া উঠেন।"

"দর্পণে লোকে যেমন আপন আপন মুখ দেখিয়া থাকে সেইরূপ এই প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল রসচিত্রের মধ্যে বিশ্বজন আপন আপন অন্তরের অদৃষ্টপূর্বরসের, রূপের ও স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিস্মিত পুলকিত মুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়। এইরূপ কাব্য সৃষ্টিই রসবিচারে সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়। শোকচিত্রের মধ্যে, এই গুণেই এষাখানি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।"

"এষার প্রথম ও প্রধান গুণ—এই কাব্যের অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা। কবি আপনার জীবনের, বাহিরের ও ভিতরের অতি ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত অভিজ্ঞতার উপর এই কবিতাগুলি গড়িয়াছেন…এষার চিত্রগুলিতে কোথাও অস্পষ্টতা দেখিতে পাই না, ইহার মধ্যে কোথাও কিছু দুর্বোধ্য বা অবোধ্য নাই। অক্ষয়কুমার সুকুমার গোধূলিলগ্নে তাঁহার কবিতাসুন্দরীর অবগুণ্ঠনখানি ঈষদপসৃত করিয়া সেই আলো আঁধারের ইন্দ্রজালের মধ্যে তাহার অপ্রাকৃত মাধুর্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন নাই।

"সুললিত শব্দ সাজাইয়া ইন্দ্রসভার অনিন্দ্য সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া কবিতার নামে কেবল মোহিনী হেঁয়ালির রচনা করেন নাই।"

তিনি প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃত উপলব্ধিলব্ধ অভিজ্ঞতা-প্রসূত সুস্পষ্ট এবং সুবিন্যস্ত একখানি প্রাণবন্ত কাব্যের আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন।

টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' ইংরেজী শোকাত্মক কাব্যের একটি অনবদ্য শিল্প, ইহার সহিত তুলনা করিয়া বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন যে, উহা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছেন শোকার্ত হৃদয়ে মৃত্যুর অন্ধকারে বসিয়া দিবানিশি পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহা জীবনমৃত্যুর সমস্যাকে এষার মত ফুটাইতে পারে নাই, যদিও তাহাতে অতি সুন্দর অতি গভীর অতি মধুর অনেক কথা আছে। কারণ, টেনিসন বহু বর্ষ ধরিয়া বিবিধ বিষয়-কর্মের বিক্ষেপের মধ্যে ইহার এক একটি অংশ রচনা করিয়াছিলেন, যোগস্থ হইয়া রসানুভূতিতে বিভোর হইয়া লেখেন নাই, সেজন্য তাহাতে অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথা আছে। একটি রসঘন ভাব দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। তাই বিপিনচন্দ্র বলেন, "এ বিষয়ে এষা 'ইন মেমোরিয়ম' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন মেমোরিয়মের বুনুনি আলগা, এষার বুনুনি ঠাসা। শোক কাব্যের মূল লক্ষ্য করুণ রসের অভিব্যক্তি। টেনিসনের কাব্যে সে গভীর কারুণ্য কোথায়? অক্ষয়কুমারের এই কাব্যখানি প্রতিছত্রে নিদারুণ মর্মস্পর্শী কারুণ্য অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।" কারুণ্যের অভিব্যক্তিতে একমাত্র প্রাচীন পদকর্তাদের বিরহ গাথা ভিন্ন এষা বাংলার অন্য সকল কবিতাকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা। 'এষা'র কবি 'এষা'য় নিপুণভাবে যে অপূর্ব কারুণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন সে নৈপুণ্য—"টেনিসনের ইন মেমোরিয়মে নাই, কালিদাসের 'রতিবিলাপে' নাই 'বেহুলার গানে' নাই, আছে কেবল কোথাও কোথাও বৈষ্ণব পদকর্তাদের বিরহ বর্ণনায়।"

এষার পদসমাবেশ কৌশল কৃত্রিম নহে, কষ্টসাধ্য নহে, নিতান্ত সহজ সরল এবং স্বাভাবিক। মনস্তাত্ত্বিকতার বিচারেও কাব্যখানি শ্রেষ্ঠ। পত্নীশোকাতুর কবির মর্মের স্তরে স্তরে যে আর্তি যে বিয়োগ-বেদনা জাগিয়া উঠে—"তাহার একখানি পরিষ্কার প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাসরূপেও এষা অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।"

এই শোকচিত্রপটে কবি শুধু নিজের শোকচিত্র আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার সমস্ত শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের মর্মবেদনা যেন একটি উজ্জ্বল তৈলচিত্রের রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"এই কবিতাগুলিতে যেন বিশ্বের সার্বজনীন দাম্পত্য বিরহের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, আলেখ্যটির প্রতি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহা যেন

কবিতা নহে, ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাবের তরঙ্গমাত্র নহে—ইহা যেন আমাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতালব্ধ পুরাতন পরিচিত বস্তু। বিপিনচন্দ্র বলেন—

"চক্ষে যাহা দেখিয়াছি এই শব্দ চিত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রাণে যাহা ভুগিয়াছি তাহাই এখানে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। পড়িতে পড়িতে সেই পুরাতন বিস্মৃত ভাবগুলি প্রাণের অন্তস্তলে যেন নড়িয়া চড়িয়া উঠে।"

এবার কবিতাগুলি ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ, কবির ইঙ্গিতে তাঁহার কথিত অর্থের আভাসে পাঠকের অন্তরে নিগূঢ় অনুভূতি তাঁহার নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চারিত হয়—তাঁহার সমস্ত মর্মদেশ টনটন করিয়া উঠে। "কবি একটি দুইটি কথার ইঙ্গিতে এক-একটি বিশাল রসরাজ্য পাঠকের মনশ্চক্ষে খুলিয়া দিয়াছেন।"

বিপিনচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন যে, "এবার কবিতাগুলির দৃশ্য সাধারণ এবং উপকরণ সামান্য কিন্তু এই কবিতাগুলির উপজীব্য যে কারুণ্য—তাহা অলোক-সামান্য। এই সামান্য উপকরণ লইয়া অক্ষয়কুমার যে এমন সজীব উজ্জ্বল রসমূর্তি গড়িয়াছেন ইহাই তাঁহার অলোকসামান্য কবি প্রতিভার পরিচয়।"

পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীল সমালোচকের মন্তব্য মনে পড়ে—'A poet creates a Lear or a Hamlet···to show the working of the human heart' কারণ the substitution of the concrete for the abstract is an aid to the untrained. অর্থাৎ ভাবকে রূপায়িত করলে বা মূর্তি পরিগ্রহ করালে সহজে সাধারণ জনের গ্রহণযোগ্য হয় নচেৎ "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।"

তাই কবি দাম্পত্যের বিয়োগ বেদনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। মনস্তাত্ত্বিক বলেন: In the arithmetic of life the smallest unit is a pair—এবং এই pair-এর একটি আর একটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই আদি কবির প্রথম কবিত্ব ভাষায় ব্যক্ত হইয়া উঠে, নিষাদের প্রতি অভিশাপে প্রযুক্ত হয় সেই অমর শ্লোকে—

মা নিষাদ। প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

কবি অক্ষয়কুমার দুঃখের কবি নন দুঃখবাদী তো ননই—তিনি বেদনার সংবেদনশীল কবি, যিনি সাময়িক স্বকীয় শোকের বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাশ্বতিক সার্বজনীন ভাবের হর্ম্যনির্মাণ করেছেন। যেন সেটি শোকের আলেখ্যের চারুচিত্রশালা।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের তিনি এক বৎসর পুরোবর্তী ছিলেন—তাই মনে হয় যেন তিনি উদয়রবির রথাগ্রে অরুণের মতই সার্থক অগ্রগামী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাই অক্ষয়কুমারের স্মরণে মনে হয়:

"অপরূপ আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্দ্ধ শিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ॥"

* এই প্রবন্ধটি বিগত ১০ই এপ্রিল ১৯৬০ তারিখে বৈষ্ণবঘাটে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর কাব্যশাখার অধিবেশনে পঠিত।

প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

মানব জমি

সাহিত্যের পাঠশালায় মহাশয়-বৃত্তি করবার মত না আছে জ্ঞান, না আছে অভিজ্ঞতা, তথাপি আমাদের পাঠক পাঠিকাদের কাছে এই দৈন্যটুকু স্বীকারের এবং এই দৈন্যের কারণ কি তা' বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ কচ্ছি।

প্রয়োজন এই যে, আমাদের আজ বনে যাওয়ার বয়স নিকট হ'য়ে আসা সত্ত্বেও পিছন ফিরে তাকালে যে তৃপ্তির চেয়ে আফ্‌শোষই হয় অধিক,—তার কারণ প্রথম বয়সে শেখাবার এবং সাবধান করবার লোক ছিল কম নয়তো শিখ্‌বার এবং সাবধান হবার প্রবৃত্তি ছিল আরও কম। তাই আজ বর্ত্তমান সময়ের কিশোর কিশোরীদের, যুবক যুবতীদের ভবিষ্য জীবন সম্বন্ধে এমন দু'টো কথা বল্‌তে চাই যা'তে আমাদের বয়সে তাদের আফশোষের কারণ অন্ততঃ আমাদের অনুপাতে কম হয়।

ছেলেবেলায় পল্লী ভিখারীর কণ্ঠে রাম প্রসাদের গান শুনেছিলাম—

"এমন মানব জমি রইল পতিত
আবাদ কর্‌লে ফ'লতো সোনা—
মন, তুমি কৃষি কাজ জানো না।"

সেই কথাই পরে প্রকারান্তরে পড়লাম—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে,

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।"

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, এই শরীর হ'ল জমি, এ'কে যে জানে সেই প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ চাষী বা প্রকৃষ্ট কৃষক।

ইংরাজীতে পড়েছি—

"Sow an act and you reap a habit

Sow a habit and you reap a character

Sow a character and you reap a destiny."

অর্থাৎ এই দেহ আর মনের মাটি নরম থাকতে থাকতে একটি 'কাজ' যদি বীজের মত যথাকালে যথাপদ্ধতিতে বপন করা যায় তো জন্মায় একটি 'অভ্যাস'; একটি 'অভ্যাস' যদি চারার মত লালন পালন করা যায় তো ফলে একটি 'চরিত্র'—এবং এই চরিত্রকে যদি বৃক্ষপক্ক রসাল ফলের মত বাদুড়, বানর এবং পোকা মাকড় থেকে রক্ষা করা যায় তো সেই ফল আস্বাদনেও দেয় সুখ এবং পরে পুনর্বপন করা হ'লে উৎপাদন করে সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য,—যার আনন্দে—

"মোদন্তি পিতরো, নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথাচেয়ং ভূর্ভবতি।"

আমাদের স্বর্গের পিতৃপুরুষগণ আমোদিত হ'ন,—দেবতাগণ আনন্দে নৃত্য করেন এবং অভিভাবকহীনা এই ধরিত্রী নূতন নির্দেশনা ও পরিচালনা পা'বার আশায় হন উৎফুল্লা। ইহার মধ্যে অত্যুক্তি নাই। ইতিহাসের পটক্ষেপ ক'রে মানমন্দিরের কাঁটা যখন বুদ্ধদেবের সময় থেকে মহাত্মা গান্ধির সময় পর্য্যন্ত কয়েক চক্র বেষ্টন করে আসে তখন আমরা অবাক হয়ে দেখি এবং শুনি—এই দুই শতাধিক কোটী নরনারীর মহামেলায় নেতৃত্ব করবার জন্য প্রতি শতাব্দীতে কয়টি মহামানবের নাম স্মরণীয় তালিকায় আমরা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখ্‌তে পারি। কদাচ ২।৪ জন, যিশু মহম্মদ, নানক, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের মত মহামানব দেশের জন্য ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হন। অথচ পরম কারুণিক পরমেশ্বর জীব মাত্রকেই সকল সদ্‌গুণের বীজ বা সম্ভাবনা দিয়ে পাঠিয়েছেন।

সৌরজগৎ এত বড় যে তার তুলনায় পৃথিবীকে ধরা হয় একটি বিন্দু,—যা'র অস্তিত্ব আছে কিন্তু পরিমাণ নাই। পৃথিবী এত বড় যে তার তুলনায়

গৌরীশঙ্করের মত গিরিশৃঙ্গকে ভৌগোলিক বলেন ঠিক যেন বিদ্যালয়ের কাষ্ঠফলকে (Black Board) এক প্রলেপ বার্ণিশ মাখানো আছে—যা'র অসমতায় একটি পিপীলিকা হয়তো হোঁচট খেতে পারে বটে কিন্তু মানুষের স্পর্শশক্তি তা'কে মসৃণ বল্‌তে বাধা পায় না, তাই পৃথিবীকে গোলাকার বলা হয়, কারণ তাহার বিরাট কলেবরের তুলনায় অতি উত্তুঙ্গ পর্বতও তাহার গাত্রত্বকে উচ্চাবচতার সৃষ্টি ক'রতে পারে না। এই হিমালয়ের কাছে মানুষ কত ক্ষুদ্র আবার এই মানুষেরই এক বিন্দু রস রক্তে কোটী কোটী বীজাণু বা কীটাণু বাস করছে।

অণুর সঙ্গে অনন্তের যে পার্থক্য তা' কেবল দৃষ্টিগত,—তত্ত্বগত নয়। তাই দার্শনিক বলেন—The small world is equal to the great world—the microcosm is equal to the macrocosm, the infinitely small is equal to the infinitely great.

উপনিষদ বলেছেন—

"বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ—
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।"

অর্থাৎ কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ এই যে জীব তা'তে অনন্তের বীজ নিহিত আছে—সে অনন্ত হ'তে পারে। এ বিষয়ে আমার নিজের উপলব্ধি নাই, তাই বিজ্ঞের বচন ওজনে ভারী হলেও ঋণ করতে হল প্রমাণের জন্য। বক্তব্য এই যে অতি ছোট ও অতি বড় হ'তে পারে। এ বিষয়ে বটের বীজের চেয়েও মানব শিশু ঢের বেশী শক্তি এবং সম্ভাবনার অধিকারী। প্রশ্ন উঠতে পারে—"তবে হয় না কেন?" আমার মনে হয় সময়ের সদ্ব্যবহার, যত্ন-প্রচেষ্টা, লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, পরিস্থিতি, সঙ্গ-সাহচর্য্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এবং বীজগত বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য। এক কথায় এই মানব জমির বপন, রোপণ, সেচন প্রভৃতি পরিচর্যার অভাব এবং আবহাওয়ার প্রাতিকূল্য।

এই মানব জমি সকল সময়ে সমান উর্বর থাকে না।

At twenty time is golden, at thirty it is silveren, at forty it is leaden. শিক্ষার উপযোগিতা হিসাবে বয়সের এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ হয়,—ক্রমান্বয়ে সোনা, রূপা এবং সীসা দ্বারা। কারণ বিংশ বৎসরে যে কিছু শিখিল না, ত্রিংশ বৎসরে যে কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনিল না, চত্বারিংশ বৎসরে তা'র ঘরে মা লক্ষ্মী বাড়ন্ত হবেন বৈ কি!

Who at twenty learns nothing, at thirty earns nothing at forty has nothing.

উর্ব্বরতার কথা বলছিলাম। বাইবেলে ও এই মানব জমির রূপকটী বেশ পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে।

মানব জমিতে যে বীজ পড়ে, তার পরিণাম নির্দ্ধারিত হয় নিম্নলিখিত রূপে।

"Some seeds fell by the way side and the fowls of the air came and devoured them up"—বীজ বপন হ'ল বটে কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণে অঙ্কুরোদ্গম কাল পর্য্যন্ত ভূমিসংলগ্ন থাকতে পেলে না। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, শিক্ষক, গুরুজন ও নীতিবাক্য সকলেই একবাক্যে বলছেন—Catch the moments as they fly and make them yield the treasures they contain, ere they escape for ever—অর্থাৎ মুহূর্ত্তগুলি চোরের মত তোমার রত্ন অপহরণ ক'রে পালাচ্ছে—তাদের এখুনি ধর নইলে পিছু ফিরলে তারা কারও নয়, অতীত হ'য়ে যাবে—'ভূত' হ'য়ে আরব্যোপন্যাসের সিন্ধুবাদের গল্পের বুড়োর মত অনুতাপের বোঝা হ'য়ে ঘাড়ে চ'ড়ে বসবে চিরকালের জন্য। কিন্তু বললে কি হয়—পরীক্ষা পড়ে থাকে কালকের জন্য, আজকের দিন ধন্য হয় বন্ধু সাহচর্য্যে, সিনেমা গগনের উজ্জ্বল রঙীন নক্ষত্র আবিষ্কারে। উপদেশ? আহা—"সর্ব্বত্রৈব বিচারে ন ভোজনেঽপি প্রবর্ত্তনম্।" The fowls devoured them up—উপদেশ বীজ তখন পাখীর পাকস্থলীতে পরিপাক হ'য়ে গিয়েছে।

"এক কানে প্রবেশিল যদি কোনো রূপে
অন্য কানে বাহিরিয়া যায় চুপে চুপে।"

এইরূপে উপদেশ যায় মাঠে মারা।

"Some fell upon stony places. Some fell upon thorns and the thorns sprang up and choked them." পাথরে বা কাঁটায় উপদেশের বীজ নিরুপায়ে নিহত হয়—তবে সৌভাগ্যক্রমে এমনও হয় যে তাদের মধ্যে কতকগুলি বীজ "fell on good ground and sprang up and bare fruit an hundredfold" তারা উর্ব্বর ভূমিতে অনুকূল মুহূর্ত্তে পড়ে অঙ্কুরিত হয়, বিকাশের আনন্দে পত্রে পুষ্পে মুকুলিত হয়ে শত সহস্র গুণ ফল প্রসব করে থাকে এবং সেই অনুপাতে মানবের শিশু বীজগুলিরও পরিণত বয়সে মন্দ, মাঝারি ও ভালো বলিয়া শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

তাই যখন—সময়ের সঙ্গে আমাদের শুধু বয়সটাই বেড়ে চলেছে তখন মনে হচ্ছে যে আমাদের না হয় 'কথাও ফুরুল' নটে গাছও প্রায় 'মুড়ুল' ব'লে—কিন্তু যাদের কথা সবে ফুটছে—জীবনের প্রথম বীজদলে সবুজকণার প্রথম সঞ্চার হচ্ছে, তাদের জন্য প্রার্থনা করি তারা যেন "উৎসবাদুৎসবং ··· সুখাৎসুখম্"—ক্রমবিকাশের পথে উত্তরোত্তর আনন্দের সহিত অগ্রসর হ'তে পারে।

'উদয়াচল' জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণে শাস্ত্র এবং যুক্তি

'প্রবাসী'তে 'শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা', 'গীতা ও 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' ও 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধে (যথাক্রমে প্রবাসী মাঘ ১৩৬৩, বৈশাখ ও আষাঢ় ১৩৬৪ দ্রষ্টব্য) যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রের মীমাংসার চেষ্টা করা হ'য়েছে, এইরূপ চেষ্টা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী এবং তা'র প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। প্রবাসী, আষাঢ় সংখ্যায়, এ বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ আর ছাপিবেন না বলেছেন। সুতরাং তা অন্যত্র মুদ্রিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। যাঁরা প্রশ্ন করেন—শাস্ত্র বড় না যুক্তি বড় এবং যাঁরা উত্তর দেন যে "শাস্ত্রই বড়" তাঁদের উভয়কেই চিন্তা করতে অনুরোধ করি যে যদি বলা যায় 'শাস্ত্রই বড়' তা হ'লেও তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে যুক্তিই বড়, অথবা উভয়েই অন্যোন্যাশ্রয়ী।

কোন গ্রন্থ শাস্ত্রের মর্য্যাদা লাভ করবে,—এবং শাস্ত্রের মধ্যেও আবার কে 'তর'—'তম' সম্মান লাভ করবে, তাও যুক্তির দ্বারাই নির্ণীত হবে। নইলে "শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী"র কোন অর্থ হয় না। সত্যের ছোট বড়—বয়সের বিচারে স্থির হয় না। বৈজ্ঞানিক সত্যের বয়স কি? বৈজ্ঞানিক বিষয় বা তথ্য নিয়ে বেদ, বাইবেল, কোরাণের সঙ্গে বিজ্ঞানের বহু সংঘাত ঘটেছে, ঘটছে—এবং ঘটবেও। পৃথিবী গোল, পৃথিবী ঘুরছে।—ঠিক ছ' দিনে পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে ভগবান সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিলেন—কিম্বা তিনি 'ঈক্ষণ' মাত্রেই সৃষ্টি করেছিলেন—তাই নিয়ে এক ধর্ম্মের সঙ্গে অপর ধর্ম্মের এবং এক ধর্ম্মের ভগবৎ পরিকল্পনার সঙ্গে অপর ধর্ম্মের ভগবৎ পরিকল্পনার তুলনা করা নিষ্ফল।

মানুষ পুণ্য ক'রে চিরকাল স্বর্গে বাস করে, কিম্বা পাপ ক'রে চিরকাল নরকে দগ্ধ হয়, এ-প্রশ্নের মীমাংসা কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে না থাকলেও আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, যুক্তি বিচারেও পাওয়া যায়। যদিও স্বর্গ ও নরক নামে রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মত পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে কিনা তা অনুমান সাপেক্ষ! চির শব্দের অর্থ দীর্ঘকাল, অশেষ অনন্তকাল নয়, তাই চিরজীবী মানে দীর্ঘজীবী। কৃতকর্ম্মের ফল আমরা ভোগ করি—এবং ভোগ কাল কর্ম্মানুযায়ী চির বা অচিরকালস্থায়ী হয়।

শাস্ত্রের অর্থ নিরূপণ হয় যুক্তির দ্বারা—তা'তেও সাহায্য নিতে হয় আবার ব্যাকরণ অভিধান ন্যায় ও বিচার শাস্ত্রের। শাস্ত্র ও যুক্তি অন্যোন্যাশ্রয়ী; যুক্তি কখনো শাস্ত্রের রূপ নিয়েছে, আবার কখনো শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও গবেষণার ফলে স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত বা পরিত্যক্ত হয়েছে।

বেদান্ত দর্শনের সকল ভাষ্যকারই শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় রূপ বেদান্তের তিনটি প্রস্থানকেই মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তবুও যুক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নিয়ে অনুধাবন করলে প্রত্যেকের যুক্তি যুক্তির দ্বারা গ্রহণ করা যায়। যতক্ষণ 'আমি' আছি, মমত্ব সমন্বিত অহমহমিকা বোধ আছে ততক্ষণ 'ভেদ' আছে 'নানা' আছে বহুবিধ বিশেষ্য বিশেষণের ব্যবচ্ছেদ্য-ব্যবচ্ছেদকত্বও আছে—এবং ততক্ষণ শঙ্করের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ আমাদের বুদ্ধির নাগালের বাইরে। ততক্ষণ নিম্বার্ক মধ্বাচার্য্য রামানুজের সবিশেষ ব্রহ্মই আমাদের কিয়ৎ পরিমাণে অধিগম্য হয়, যদিও শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ।

পাখীর দুটী ডানার মত জ্ঞান এবং ভক্তি সমন্বিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ ভগবান শ্রীচৈতন্য স্থাপন করেন বুদ্ধ, নিম্বার্ক, শঙ্কর রামানুজের অনেক পরে। নিম্বার্ক ভেদাভেদ বাদ স্থাপন করেন শঙ্করের বহু পূর্ব্বে। শ্রুতি বলেন :—

স্রষ্টা সৃষ্টিতে নিজেকে পরিণত করেও ফুরিয়ে যান নাই,—তদতিরিক্ত পৃথক সত্তায় অব্যক্ত অচিন্ত্যরূপে বর্ত্তমান আছেন. "যো লোকান্ সকলান্ ব্যাপ্য অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্" অর্থাৎ তিনি যেন সমস্ত সৃষ্টজগৎকে অঙ্গীভূত এবং ব্যাপ্ত করেও দশ আঙ্গুল অতিক্রম করে আছেন, এর উল্লেখমাত্র করলাম যদিও সে প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়।

শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প-ভ্রম বা শুক্তিতে রজত-ভ্রম বাদকে,

অন্যান্য দার্শনিক, জগৎ-সৃষ্টির দিক থেকে পরিহার করলেও,—দেহাত্ম ভ্রম বা দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ভ্রমকে বিবর্ত্তবাদের উপরেই স্থাপন করেছেন।

প্রক্ষিপ্তবাদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই—যে শুধু প্রক্ষিপ্তকে প্রক্ষিপ্ত বলেই হেয় করা যায় না। গোদুগ্ধে গোমূত্র প্রক্ষেপ করলে নষ্ট হয় বটে কিন্তু তাকে শর্করার দ্বারা স্বাদু এবং কর্পূরের দ্বারা সুবাসিত করলে তাকে প্রক্ষিপ্তের অপবাদ দেওয়া চলে না। "যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি"—যুক্তির দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণ হলে, বালকের নিকট থেকেও তাকে গ্রহণ করা সমীচীন।

মন্বন্তরের হিসাবে স্বায়ম্ভুব থেকে সাবর্ণিক পর্য্যন্ত বিভিন্ন মন্বন্তর কালের হিসাব করে, যে যত পুরাতন তার যে তত সত্যতার দাবী হবে, এ-যুক্তি গ্রাহ্য হতে পারে না। তাই—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে—
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥

অর্থাৎ পুরানো হলেই সব সাধু হয় না, নূতন হলেও সব হেয়, বা ত্যাজ্য হয় না। সজ্জন পরীক্ষা করে সত্যকে গ্রহণ করেন—মূঢ় জনেই পরের মুখে ঝাল খায়।

সকলেই বোঝেন বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বিষয় এবং বস্তু প্রবেশ করেছে। বেদের বহু শাখা আজও নিখোঁজ, —বহু পুরাণ লুপ্তপ্রায় এবং বহু গ্রন্থই প্রক্ষিপ্তের ব্যাধিতে শোথগ্রস্ত। মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় হাতে-লেখা পুঁথিতে সমকালীন লেখকদের মতবাদ অবাধে প্রবেশ করেছে। তাই আজ বেদকে ঋষিবাক্য ব'লে গ্রহণ করলেও তার প্রত্যেকটি কথাকে সত্যের স্বীকৃতিদান করা সম্ভব নয় বেদের অর্থও অনেকক্ষেত্রে দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য। বেদ সত্য এবং পুরাণ অসত্য, একথা বলাও যা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ সত্য, কিন্তু বেদব্যাস, শুক, সৌতি মিথ্যা একথা বলাও তাই। ব্রহ্ম (বেদ) এবং ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি সমান আসনে সমাসীন। বেদের ঋষি পুরাণের ঋষি এবং বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মজগতের ঋষি এবং বিজ্ঞান জগতের নিউটন আইনষ্টাইন প্রভৃতি ঋষির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় স্থাপন করার সশ্রদ্ধ, সরল ও নিরপেক্ষ চেষ্টাই আমাদের অবলম্বন করা উচিত।

দুধ নিজে নিজে দধিতে পরিণত হয় না, Lacto bacillus নামক বীজাণু না থাকলে—তেমনি গোময় থেকে কোন বৃশ্চিকাদি কীট উৎপন্ন হতে পারে না

তার প্রাণবীজ বা কীটাণু আগে থেকেই নিহিত না থাকলে,—কিন্তু তার দ্বারা বেদান্ত সূত্রকে অবজ্ঞা করা চলে না। হৃদয়দেশে ঠিক গোণাগুণতি ১০১টা নাড়ী না থাকলেও এবং তার একটী মাত্র নাড়ী শীর্ষাভিমুখী না হলেও উপনিষদকে অশ্রদ্ধা করা বিজ্ঞতার পরিচয় নয়।

এসকল জ্ঞান নিতান্তই বস্তুবিজ্ঞানের আপেক্ষিক জ্ঞান। কাচের অণুবীক্ষণ থেকে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্‌কোপের যন্ত্রোন্নতির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে আমরা নিজেরাই বহু জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগান্তর ঘটতে দেখছি। কিন্তু সেজন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিচারে Logical reasoning-এর প্রভাব এবং পন্থা ক্ষুণ্ণ বা ব্যাহত হচ্ছে না।

আজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আদিম গীতা Proto Gita-র মূল্য খুব বেশী নয়,—প্রকৃত মূল্য বক্তব্য বিষয়ের এবং প্রতিপাদ্য তত্ত্বের। আসল কথা গোপালনন্দন গীতায় উপনিষদের কামধেনু দোহন করে সুধীগণকে অমৃত পরিবেশন করেছেন কিনা।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, সত্যনির্দ্ধারণ বিষয়ে, বয়সের মাত্রা মান নির্ধারণ ক'রে—বেদ, ত্রিপিটক, পুরাণ, বাইবেল, তন্ত্র, কোরাণ এবং গৌড়ীয় কড়চা সন্দর্ভাদিকে উঁচু নীচু আসন দেয় না। তার দৃষ্টি—সমন্বয়, সংশ্লেষণ বা synthesis এর দিকে এবং নেতি-নেতি বিচারের analysis বা বিশ্লেষণ এর দিকে,—সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের উক্তির 'গতি সামান্যের' দিকে (বেদান্তসূত্র—১।১।৪, ১।১।১১) অর্থাৎ সকল স্বীকৃত জ্ঞানের সমন্বয়—এর দিকে—' যাতে তারা বিধৃত হয়েছে। 'পয়সামর্ণব ইব।'

আকারে ম্লেচ্ছ, কিন্তু প্রকারে পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে শাস্ত্র স্বীকার করেছেন এই সত্যের কষ্টি পাথরে, তাই—

"অষ্টবিধাহ্যেষা ভক্তি র্যস্মিন ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ।

শ্রীচৈতন্য বলেছেন—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয় ? যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।"

একথা সত্য যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুরাণাদিতে বিভিন্নরূপে দেখানো হয়েছে। তাঁকে একাধারে আদর্শ মানব, আদর্শ আশ্রিত-বৎসল বীর যোদ্ধা, আদর্শ

ক্ষত্রিয় রাজা,—আদর্শ যোগী ও শাস্ত্রবক্তা, আদর্শ জ্ঞানী,—ঈশ্বরের অংশাবতার বা পূর্ণাবতার হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

ঈশ্বরকে যাঁরা মানেন, এবং অবতার বাদ মানেন, তাঁরা অংশে এবং পূর্ণে ভেদ অল্পই দেখেন।

কারণ, বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।

এই সাধারণ সূত্রে সব জীবই ব্রহ্মের কণা বা স্ফুলিঙ্গ এবং সব কণাই অনন্তস্বরূপ।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা
তত্তদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্।

তাঁর 'উর্জ্জিত'—অর্থাৎ তেজোবীর্য্যবান আবির্ভাবের তো কথাই নেই।

পৃথিবীর পাত্রটী ছোটই, জ্যোতির্বিজ্ঞানে এ'কে একটী জ্যামিতির বিন্দুবৎ ধরা হয়, অর্থাৎ যার অবস্থিতি আছে কিন্তু পরিমাণ নাই,—has position but no magnitude—এবং এই হিসাব ধ'রেই Astronomy-র সব হিসাব মিলছে। সৌরমণ্ডল, ভূমণ্ডলের বড় ভাই, অর্থাৎ আর একটু বড় বিন্দু (!) বিরাট খ-গোল (Celestial sphere) এর তুলনায়। সুতরাং আমরা কত ছোট তা সহজেই অনুমেয়।

এই দৃষ্টিতে বিশ্বরূপ দর্শন করলে এবং ভাগবতের ব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তব পড়লে পাঠক কিছুটা সত্যের রশ্মি দেখতে পাবেন! 'বিশ্বরূপ'-দর্শন একটী factual বা বাস্তব ঘটনা নয়, হতে'ও পারেনা, ইহা প্রতীতি বা উপলব্ধি বা interpretation of the phenomenal world; বহুর মধ্যে যাঁরা এক কে দেখেন, তাঁদের কাছে, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—"একমেবাদ্বিতীয়ম্",—প্রতীতি হয়।

যাঁরা তা দেখেন না, তাঁরা বিশ্বেরই বহু এবং বিচিত্র রূপ দেখেন, তাঁরা একের বিশ্বরূপ দেখেন না; বহুর মধ্যে এই এককে দেখায় চক্ষুই দিব্যচক্ষু। শুকদেব বলেছেন "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বম্ আত্মানমখিলাত্মনাম্। অর্থাৎ কৃষ্ণই পরমাত্মা।

গীতায় ১১।৪৬ শ্লোকে যে চতুর্ভুজের কথা আছে, তার মানে এ নয় যে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ ছিল। অর্জ্জুন চতুর্ভুজ নারায়ণের ধ্যান করতেন। তাঁর যখন প্রতীতি হল যে ইনিই তিনি, তখন তিনি সেই সহস্রবাহু বা অসংখ্যবাহুকে তাঁর ধ্যানের রূপে দেখতে চাইলেন। ১১।৫১ শ্লোকে যে 'মানুষং রূপং' তা

"সর্ব্বত: পাণি পাদং তৎ···সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি (গীতা ১৩।১৪)

"তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা" (গীতা ১৩।৩১)

কিন্তু এই বিশ্বরূপ দর্শনই শেষ কথা নয়,—এরও আগে আছে। মুণ্ডক শ্রুতি "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"—গীতা বলেছেন—স তং পরং পুরুষমুপৈতি' দিব্যম্ (৮।৮, ৮।১০,)

Immanent বা সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ দর্শনের পর Transcendent বা সর্ব্বাতীত সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তমের দর্শন। যা মুণ্ডক শ্রুতির 'পরং পুরুষম্'—তাই গীতার অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ' এই পুরুষোত্তমকে জানলে আর অন্য পথ নাই—To Know Him is to love Him and Love but Him for ever. (Byron থেকে she এর বদলে he করা হয়েছে)।

শ্রুতি বলেছেন ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হ'য়ে যান। কিন্তু গীতা বলেছেন—পুরুষোত্তমকে জানলে জীব পুরুষোত্তম হয়ে যান না, হ'তেও চান না, তাঁকে ভজনা করেন। চিনি হওয়া ভাল নয় বুঝে, জীব চিনি খেতে ভালবাসেন।

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্—
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত (গীতা ১৫।১৯)

অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে জানলে তাঁকে ভজনাই করতে হয়, সর্ব্বভাবে—সর্ব্বতোভাবে।

বাসুদেব নামের মধ্যেই তো বিশ্বরূপ রয়েছে—(বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি—গীতা ৭।১৯) সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতস্ ততোঽসৌ বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিগীয়তে (বিষ্ণুপুরাণ)।

নারায়ণেও তাই—(নরাণাং সমূহো নারঃ)

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্নবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

ভাগবত ১০।১৪।১৪ শ্রীধর ভাষ্য।

বিষ্ণু ও বিশ্বব্যাপী (বিশ্বং বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি)

বিশন্তি সর্ব্বভূতানি যস্মাত্তস্মিন্মহাত্মনি
অতো বিষ্ণুরিতি প্রাহুর্বিশে র্ধাতোঃ প্রবেশনাৎ॥

পাণিনি বসুদেবস্য অপত্যং পুমান্ বাসুদেবঃ বলেছেন, মানুষী তনু আশ্রিত বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে লোকে সংশয়ের চোখে দেখবে, অবজ্ঞার চোখে দেখবে, একথা তিনি নিজেও বলে গেছেন—

(গীতা ৯।১১) তা'র কারণ কোন লৌকিক সাধারণ নিন্দা, গর্হা বা বিদ্বেষ নয়। অসাধারণ অলৌকিক জ্ঞান লাভ ক'রে, আমরা যতদিন তাঁর মহান্ ঈশ্বর ভাব উপলব্ধি করতে না পারি ততদিন 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং' আমরা কিছুতেই গ্রহণ করবার সামর্থ্য লাভ করতে পারিনে। 'অলৌকিকানামপি লৌকিকত্বম্ অলৌকিকত্বপ্রথনায় নূনম্।'

শ্রীকৃষ্ণ, তথা ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষিগণ যখন উত্তম পুরুষ ব্যবহার ক'রে 'দেশনা'—দিয়েছেন তখন তাঁদের 'আমি' শব্দের বাচ্য ক্ষেত্রাত্মা বা জীবাত্মা নয়, পরমাত্মা। তা'র সুষ্ঠু মীমাংসা রয়েছে বেদান্ত সূত্রে এবং উপনিষদে।

প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের কাছে গিয়ে উপদেশ চাইলেন ইন্দ্র বললেন 'আমিই প্রাণ, প্রাণই আনন্দ অজর এবং অমৃতরূপী।' এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ জীব ইন্দ্র নয়, এই 'আমি' পরমাত্মবাচক। (প্রাণস্তথানুগমাৎ, বেদান্ত সূত্র ১।১।২৯) পরের সূত্রে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে যদি সংশয় হয় যে ইন্দ্র 'আমাকে উপাসনা কর', ব'লে নিজেকেই উপাস্য বলেছেন তবে তার মীমাংসা কেনোপনিষদে 'উমা-র আবির্ভাব এবং ব্রহ্মশক্তির পরিচয় প্রসঙ্গেই বোঝা যাবে। এই 'আমি', জীবাত্মার 'আমি' হতে পারে না,—কারণ ইহা পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ প্রসঙ্গেই স্পষ্টত: প্রযুক্ত হয়েছে। সুতরাং ইন্দ্র সম্বন্ধে পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বা ভগবানকেই বুঝতে হবে। কারণ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, স আত্মা, তত্ত্বমসি" (ছাঃ) 'ছোট আমি'র সঙ্গে বড় আমি'র ভেদ বোঝার জন্য বেদান্ত সূত্রে বারম্বার—"ভেদব্যপদেশাৎ" বলা হয়েছে (১।১।১৮, ১।১।২২) এবং চতুর্থ পাদে ৪।৪।১৭—২২ সূত্রে—মুক্ত জীব যে Lord God ন'ন Mr God মাত্র তাও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। বৈষ্ণব কবির ভাষায় "তোমার গরবে গরবিণী হাম রূপসী তোমারি রূপে"—এই মুক্ত পুরুষের উক্তি। অথবা কখনো হয়তো নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে তার সকল বলার অবসান হ'য়ে যায় "ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্মে লীন হ'য়ে গিয়ে ('স্বাপ্যয়াৎ' বে সূ ১।১।১০)।

একটা সংশয় লোকের মনে আসতে পারে যে যাঁরা রাম কৃষ্ণ শিব দুর্গা প্রভৃতিতে ঈশ্বর বুদ্ধিতে উপাসনা করেন তাঁরা কি ঈশ্বরের অবমাননা করেন, তাঁরা কি মূর্ত্তিপূজক—পুতুলপূজক idolator মাত্র? দর্শনে বা বিজ্ঞানে এ

সন্দেহের কোনও অবকাশ-মাত্র আছে বলে আমি মনে করিনে। তাই রামপ্রসাদ বলেন,—"ঘুচে যাবে ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ, (ওরে) শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা।" তারা কখনো ভক্তের নয়নতারা, তারা কখনো তিমিরে তিমির-হরা,—কখনো "আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" কখনো শালগ্রামরূপী, বাইরে জ্যোতির বেষ্টনী (শালগ্রামের রূপার পৈতে) ভিতরে কূটস্থ কুহর। ভারতবর্ষের অসংখ্য নরনারী নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু তারা এবিষয়ে অজ্ঞান নয়। অসংখ্য পল্লীগ্রামে এইরূপ নিরক্ষর নরনারীর সঙ্গে মিশবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে,—বহু বৎসর ধরে। তারা সকলেই জানে সব ঠাকুরই সমান এবং দেবতা দুই নয়, এক। ভ্রম তাদের হয়, অশিক্ষিতের হবারই কথা, আমার কিন্তু মনে হয় তথাকথিত শিক্ষিতদের ভুল আরও ঢের বেশী হয়, কারণ তাঁরা ডুব দিয়ে জল খেতে আরও বেশী শিখেছেন, ফলে হয় হাবুডুবু খাওয়া এবং ভাবের ঘরে ফাঁকি।

চোখবুজে অন্ধকারের ধ্যানে হাঁপিয়ে ওঠার চেয়ে বিগ্রহের রূপের ধ্যান, গুণের ধ্যান মনোবিজ্ঞানের সমর্থিত যেহেতু তার পরে, পাওয়া যায় মহাকবির ভাষায় 'রূপসাগরে ডুব দিয়ে' অরূপের বা অপরূপের সন্ধান। যে কোনও রূপই পুরুষোত্তমের রূপ, তাই সে অরূপ এবং অপরূপ।

সবিশেষ, নির্বিশেষ, মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত পূজার কথা ছেড়ে দিয়ে আজ সমস্যা হচ্ছে নিরীশ্বর, নাস্তিক বা নাস্তদস্তীতি-বাদীদের। এঁরা অশিক্ষিত নন, অর্ধ শিক্ষিত। ভয়ঙ্করী অল্পবিদ্যা অথবা চলতি কথায় 'দুষ্টা সরস্বতী' এঁদের পণ্ডিতম্মন্য করে, পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে অন্ধ করেছেন,—অন্ধ হয়েও অপর অন্ধকে পথ দেখাবার মত দুঃসাহস এবং দুরাগ্রহ এঁদের পূর্ণ মাত্রায় আছে তাই তার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তাতে সকল ধর্ম্মেরই চিন্তার কারণ হয়েছে। Dialectic Materialism অথবা যুক্তিনিষ্ঠ জড়বাদের মিথ্যা যুক্তি দিয়ে, দেহের যন্ত্রটী পেট্রল ইঞ্জিন বলে সাব্যস্ত করবার অপচেষ্টা, তরুণ তরুণীদের বিহ্বল বিভ্রান্ত করে তুলছে।

তাই এ কথা বলা প্রয়োজন যে শুধু খণ্ড এবং অসংলগ্ন 'যুক্তি' নিরাশ্রয়, যুগে যুগে সঞ্চিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাই 'শাস্ত্র' নামে পরিচিত এবং এই শাস্ত্র শুধু বেদ বাইবেল আদি ধর্ম্মশাস্ত্র নয়। জগতের যা কিছু পরীক্ষিত জ্ঞান বিজ্ঞান নীতি শীল এবং সদাচার তার সার গ্রহণ করে শ্রদ্ধাসহকারে বিবেকের প্রদীপে যুক্তির আলো জ্বালিয়ে দেখে নিতে হবে। সত্যকেও বিবেক বিচারে

চিনে নিতে হয়। কতকগুলি আপেক্ষিক সত্য আছে—যেগুলি নদীর মত পরম সত্যের সমুদ্রে পৌঁছিয়ে দেয়। বিশ্বনাথ বিশ্বরূপী,—যে কোন রূপে আমাদের অন্তরের সকল বৃত্তি আশ্রয় পায়, সেই রূপেই তাঁকে আত্মনিবেদন করা যায়। অব্যক্তরূপের অধিকারী বিরল, ক্লেশ ও বেশী—(গীতা ১২।৫) ব্যক্তরূপে মন সহজে নিবিষ্ট হয়।

সত্যের আর একটা দিক আছে—যাকে বলা যায় কবি-কল্পনার সত্য বা Poetic truth। এতে তথ্যমূলক সত্য হয়তো অল্পই থাকে কিন্তু তবু অনুমান, উপমান ও যুক্তির সাহায্যে সে শাস্ত্র প্রমাণ বা মহাজনী প্রমাণে পরিণত হয় এবং মনকে যুক্তিগর্ভ বিশ্বাসের আশ্রয় দান করে। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ঘটে যা তা' সব সত্য নহে,'—তাই তিনি নারদের মুখে বাল্মীকিকে অভয় দিয়েছেন 'কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

এইরূপ সত্যে গঠিত হয় কাব্য মহাকাব্য পুরাণ রামায়ণ মহাভারত এমন কি পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ এবং ঈশপের গল্প পর্য্যন্ত। সুন্দর কুৎসিত সকল বা বিকল অঙ্গ সমন্বিত মানব-দেহের মধ্যে যেমন তার মানব-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে এই সমস্তের খোলসে ও তেমনি সত্য থাকে শিল্পের অন্তরালে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিবিধ বর্ণনা শাস্ত্রে প্রবেশ করেছে। কোথাও দেখি রাসস্থলীতে, যত গোপী তত কৃষ্ণ হয়েছেন "তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ"— কোথাও তাঁদের সঙ্গে ক্রীড়া করছেন "যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" বালক যেমন দর্পণে নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে ক্রীড়া করে। কোথাও তিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করছেন, কোথাও বা তাঁকে বা তাঁর উদ্দেশে গোপীরা বলছেন—

"ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।"

ইহারই প্রতিধ্বনি পাই—"মন্যমানান্—স্বপার্শ্বস্থান্ স্বং স্বং দারান্ ব্রজৌকসঃ।" মূল কথাটী একই।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণে চরম স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না,— কেননা তিনি আদর্শ মনুষ্য। যে জন্য বৃন্দাবনে ব্রজলীলা,—পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্র বিহার, যমুনা-বিহার, রৈবতক বিহার তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক পরেই বলছেন—"কৃষ্ণ আদর্শ

মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি অবতীর্ণ,—তাঁহার ভক্তির স্ফূর্তি দেখিলাম—কই? কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাঁহার এই ভক্তির পাত্র কে?—তিনি নিজে। নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন করিলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। গীতা ৫।২৪)। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহা এইরূপ কথিত হইয়াছে—"এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্বান এবং বিজানন্—আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতীতি"—অর্থাৎ যে ইহা দেখিয়া,—ইহা ভাবিয়া,—ইহা জানিয়া আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর) আত্মাই যাহার আনন্দ সে স্বরাট্"—

উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন—তাই তাঁর সিদ্ধান্তবাক্য কৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে—"উপসংহারে বক্তব্য কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব গুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ পুণ্যময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ, ধর্ম্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র অলৌকিক অতিমানুষিক। এই প্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কিনা, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধির বিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন তিনি অন্ততঃ Rhys David শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন;—

"The wisest and greatest of the Hindus."

আর যিনি বুঝিবেন যে এই কৃষ্ণ চরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়—তিনি যুক্ত করে বিনীতভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম্॥"

শেষ দুটী পংক্তি গীতারই অনুরূপ উক্তি—

"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

—অবতার-বাদের স্বীকৃতি। পুরাণ, মহাভারত ও ভাগবত পাঠ করলে

ভগবানের অংশাবতারে অংশ বিকাশ এবং পূর্ণাবতার পূর্ণ বিকাশ বুঝতে বিশেষ ক্লেশ পেতে হয় না।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি কেন,—সমস্ত ইতিহাস পুরাণ থেকেই দেখা যাবে যে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগৎকে জীবনে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন এবং যুগপৎ পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন,—নিস্তরঙ্গ চিত্তে,—'আপুর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ"—। তিনি ছিলেন—"অন্তঃসুখোঽন্তরারাম স্তথান্তর্জ্যোতিরেব" তিনি একাধারে 'অব্যক্ত' এবং 'ব্যক্তিমাপন্ন' তাই তাঁর পরম ভাব গ্রহণ করা সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে সুদুষ্কর। তাই মানুষী তনু আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ,—Son of God এবং Messiah of Godকে আমরা আমাদেরি মত মনে করি, ব্যক্তিমাপন্নের অব্যক্ত পরম ভাবটী ধরতে পারিনে বলে।

মানুষের মধ্যেও যাঁরা ঐতিহাসিক মানুষ,—যাঁরা সাধারণ মানুষকে অতিক্রম করেছেন,—তাঁদের এক একজন এক একটী বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে ভরাডুবি করেছেন, যেমন—"Anthony sought for happiness in love,—Brutus in glory,—Caesar in dominion",—কিন্তু ফলে কি হয়েছিল?—"The first found disgrace—the second disgust,—the last ingratitude—and each destruction." (Colton : Lacon or Many Things in Few Words) অপর পক্ষে তুলনা করে দেখা যায় যে—

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে থেকেও যা',—আর না থেকেও তা',—গোপীদের তিনি বলছেন—

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া।

বিরহ বিনা প্রেম গম্ভীর হয় না, ধ্যান একতান হয় না,—এ বিষয়ে কবীর সাহেবের কথা প্রণিধাযোগ্য—

'কবীর! বিরহ বিনা তন্ শূন্য হ্যায়
বিরহ হ্যায় সুলতান
যো ঘট বিরহ না সঞ্চারে
সো ঘট জনু মশান।

অর্থাৎ বিরহ বিনা তনু শূন্য, বিরহই রাজা, যে শরীরে বিরহের সঞ্চার হয়নি, সে শরীর মশানের ন্যায়।

কবীর ! হাসে প্রিয় না পাইয়ে,
যিন্ হ পায়া তিন্ হ রোয়
হাসি খেল যো প্রিয় মিলে তো কোন্
দোহাগিন্ হোয় ?

অর্থাৎ হাসতে হাসতে স্বামীকে (ভগবানকে) পাওয়া যায় না,—যিনি পেয়েছেন তিনিই কেঁদেছেন,—হেসে খেলে যদি তাঁকে পাওয়া যেত তবে সাধ ক'রে কোন দুর্ভাগিনী বিরহ বিধুরা হ'ত ?

শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে নিয়ে রঙ্গভূমিতে মল্লবেশে উঠে দাঁড়িয়েছেন,—ভাগবত তা'র বর্ণনা করছেন—

মল্লানামশনি নৃ ণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যু র্ভোজপতে র্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।

ভাগবত ১০।৪৩।১৭

একরূপে একই জনকে দশজনে দশরকম দেখেছেন। যাঁরা ভক্ত তাঁরা তাঁকে যে চোখে দেখবেন, সে-চোখ যার নেই, সে লৌকিক চোখে তাঁকে অলৌকিক রূপে দেখেছে। বৈজ্ঞনিক,—unit বা ঐকিক মাত্রামান—ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করতে পারেন না, তাই এইরূপ লৌকিক চরিত্রের দ্বারা তিনি অলৌকিকের yardstick বা মাপকাঠি পান। নইলে,—'লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ? তাই "অলৌকিকানামপি লৌকিকত্বম্ অলৌকিকত্বপ্রথনায় নূনম্" অলৌকিকের লৌকিক লীলা অলৌকিকত্বই প্রমাণ করে।

এই অলৌকিক চরিত্রকে যখন লৌকিক দেহ পরিত্যাগ ক'রে যেতে দেখি—"finally waiting for death with a cheerful mind, as being nothing else than a dissolution of elements of which every

living being is compounded" তখনকার দৃশ্যও ভাগবতকার বর্ণনা করেছেন—

"সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ।"

অর্থাৎ তিনি আত্মায় আত্মসংযোগ ক'রে পদ্ম নেত্র নিমীলন করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনদর্শনে আমরা দেখতে পাই বেদান্ত সূত্রের "লোকবত্ত লীলাকৈবল্যম্"—এর যেন জীবন্ত নিদর্শন। এই লীলাই অবতার-বাদের প্রমাণ এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারই সেই লীলার পূর্ণতার পরিচায়ক।

বুঝবার কথা এই যে,—লীলাবতরণের পূর্ব্বে এবং লীলাসংবরণের পরে.—তিনি পুরুষোত্তম—বা 'x' অনামী বা সর্ব্বনামী,—লীলাকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণ। এবং এই লীলা লোকবৎ, লৌকিকবৎ হয়েও নিত্য দিব্য এবং শাশ্বত। "তদ্ধাম পরমং মম"। লীলাই তাঁহার নাট্য এবং ইচ্ছাই তাঁহার নেপথ্য। তাঁর ধামেও যা, লীলাজগতেও তাই,—অথবা তারই প্রতিচ্ছবি।

"পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ",—এই বিচিত্র শক্তি এবং আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা শক্তিই সর্বত্র সর্বদা তাঁর লীলা-সহচরী,—জগতে, লীলা-জগতে, এবং নিত্যধামে।

সত্য শিব সুন্দর পুরুষোত্তম প্রভৃতি শব্দ কবির কল্পবাক্যেই থাকতো, যদি এই আনন্দ বিগ্রহকে আমরা মহাভারত ভাগবত বিষ্ণুপুরাণাদিতে বর্ণিত না দেখতাম।

প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈত সিদ্ধি রচনা করেও তাঁর খেদ মিট্‌ল না,—তাই তিনি বললেন—

ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরম্
কালিন্দী-পুলিনেযু যৎ কিমপি তন্নীলং মনো ধাবতি।

শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসন্তদাসজী প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলে, এই কথারই প্রতিধ্বনি করে গেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও তাঁর অবতারত্ব, সোপাধিক ঈশ্বরত্ব এবং উপাস্যত্ব স্বীকার করেছেন।

মহাভারতে বারংবার নর নারায়ণ এবং নরোত্তমের উল্লেখ প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয়:

নর'ই ব্যষ্টি মানব বা ক্ষর পুরুষ

'নারায়ণ',সমষ্টির মানব-'নার', এর অয়ন বা আশ্রয় বা অক্ষর পুরুষ। এবং নরোত্তম বা পুরুষোত্তমই Transcendental God, যা সকল ধর্মেরই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় Lord God, বা গীতার 'পুরুষোত্তম'—উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ * * যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ" (গীতা ১৫।১৭)—"অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" (গীতা ১৫।১৮)। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্"—তাঁকে বলেছেন শ্রুতি।

প্রবন্ধের উপসংহারে ভক্ত প্রহ্লাদকে স্মরণ করে আমরাও বলি—

ওঁ নমো বাসুদেবায়, তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি, ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১.১৯।৭৮)

'হিন্দু' শারদীয়—১৩৬৪

দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা—সংস্কৃত

ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহিত যে সংস্কৃত ভাষা ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত তাহা সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং স্বাধীনতালাভের পরও যদি ভারত তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষসাধনে বদ্ধপরিকর না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের বিজলীবাতি জ্বলা সত্ত্বেও ভারতীয়েরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু বিগত ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পরাধীন থাকার ফলে বর্তমানে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, যাহাকে স্বীকার করিয়া মহাকবি গাহিয়াছেন—

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল একদেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

এখানে যাঁহারা আসিয়াছেন,—তাঁহারা এই তীর্থের যাত্রীহিসাবে আসিয়া তীর্থবাসীতে পরিণত হইয়াছেন। ফলে আজ ভারতীয় সংস্কৃতিকে নিছক হিন্দু সংস্কৃতি মনে করিলে আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র এবং সংবিধানকেই ভুল বুঝা হইবে। সুতরাং আমাদের চিন্তার ধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কলনমূলক হইতে হইবে, ব্যবকলন বা বর্জনমূলক নহে। মহাকবি তাই আহ্বান জানাইলেন :—

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধর হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।"

কারণ এই তীর্থ —নদীতীর্থ নহে, সকল স্যন্দমানা নদী নামরূপ ত্যাগ করিয়া লীন হয় যে সাগরতীর্থে, ইহা সেই ভারতের মহামানবের সাগরতীর্থ—যেথানে সকল নরনারীর পরিচয় জাতিধর্মনির্বিশেষে 'ভারতবাসী' বলিয়া। মহাকবি তাই রচনা করিলেন বিশ্বভারতী 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

সুতরাং এই বিস্তৃত, বিশাল, বহুজাতি অধ্যুষিত, বহুসংস্কৃতিসমন্বিত দেশে আজ কোনও বিশেষ একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্ভব নহে। "কুইট ইণ্ডিয়া" বলিয়া ইংরাজকে ভারত পরিত্যাগ করানো হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেজন্য ইংরাজীকে বর্জন করার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ইংরাজ আসিয়াছিল বাণিজ্য করিবার জন্য। ইংরাজ ভারতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে পারে নাই। পারিলে যাহারা ভারতে বাস করিত তাহাদের আভিজাত্য ও মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হইত,—তাহারা ব্রাত্য বলিয়া গণ্য হইত। ইংরাজ আসিয়াছিল বণিকের মত, কিছুদিন শোষণ করিয়া গিয়াছেও বণিকেরই মত। কিছুসংখ্যক ইঙ্গ-ভারতীয় অবশ্য এখন ভারতেরই অঙ্গীভূত। তাহাদের ভাষা ইংরাজী। কিন্তু ইংরাজী অল্পসংখ্যকের ভাষা হইলেও ইংরাজী ভাষা এখানে আসিয়াছে থাকিবার জন্য। ইংরাজীকে যদিও ভারতের জাতীয় ভাষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, তথাপি কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত প্রদেশগুলির ভাষাগত সংযোগ ইংরাজীর মাধ্যমেই চলিতেছে এবং আরও দীর্ঘকাল চলিবে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রতান্ত্রিক বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ কোন ভারতীয় ভাষাতেই সম্পূর্ণ রচিত হয় নাই, এখনও নির্মীয়মাণ অবস্থায় রহিয়াছে।

শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক অভিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন—তাহার বিশেষ কিছু এখনও হয় নাই। কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে ইংরাজী অভিধান আছে তাহা সাধারণ যে কোনও চলিত ইংরাজী অভিধান অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড়। Gould, Newmann Dorland, Stedman প্রভৃতি প্রত্যেকটি অভিধানের পত্রসংখ্যা প্রায় ২০০০ হইবে। এদেশে এইরূপ একখানিও অভিধান প্রণয়ন সম্বন্ধে অদ্যাপি কোনও যত্ন বা চেষ্টা হয় নাই।

'বৈদ্যক শব্দসিন্ধু' বা কোনও ভাল একখানি পারিভাষিক অভিধান পাইবার কোন উপায় নাই।

ভারতবর্ষকে সর্বতোভাবে উন্নীত এবং অগ্রগতিপরায়ণ হইতে হইলে—পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের সহিত ভাষার সংযোগ অবশ্যই রাখিতে হইবে। জগতের সকল ভাষার মধ্যে বর্তমানে ইংরাজী-ই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। মুখে মুখে সহজে শিক্ষা করা যায় বলিয়া ইহা জনপ্রিয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। ভারতেও ইহা প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। আমাদের রাষ্ট্রিয় সংবিধান ইংরাজীতেই লিখিত। জাতীয় মহাসভার যাবতীয় আন্দোলন এবং স্বাধীনতালাভের জন্য যাহা কিছু প্রচার-বিবৃতি তাহাও ইংরাজীর মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পরিচালিত হইয়াছে।

সুখের বিষয় ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের চৌদ্দটি প্রদেশের প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষাকেই আঞ্চলিক ভাষারূপে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বাঁটোয়ারার আন্দোলন সম্প্রতি সেই স্বীকৃতির ফলে কিছুটা শান্ত হইয়াছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে, উত্তর ভারতীয়দের বিরুদ্ধে, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রবর্তন করা সম্পর্কে এক উগ্র আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। তত্রত্য প্রবীণ বিচক্ষণ এবং বিদ্বান জননেতারাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়া ভারতের সামগ্রিক ঐক্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছেন।

অহিন্দীভাষী প্রদেশগুলির আশঙ্কা এই যে, যদি প্রাদেশিক ভাষা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে হিন্দীর প্রবর্তন হয় তো প্রাদেশিক ভাষা দুর্বল এবং কোণঠাসা হইয়া পড়িবে। দক্ষিণ ভারত কিন্তু হিন্দীকে স্বীকৃতিদানে একান্ত পরাঙ্মুখ, কারণ ইহার সহিত দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলির অক্ষরমালা এবং শব্দাবলীর কিছুমাত্র সমতা নাই। তাঁহারা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ইংরাজীর অধিকতর পক্ষপাতী।

একথাও সত্য যে ভারতের রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্বাহের জন্য সরকারী ভাষা চিরদিন ইংরাজী থাকিতে পারে না এবং থাকাও উচিত নহে। কতদিনে এবং কি পরিমাণ প্রস্তুতি ও পরিশ্রমের ফলে ভারতীয় ভাষাই ভারতের সর্বত্র,—কেন্দ্রে তথা প্রদেশে,—প্রবর্তিত হইবে সে বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিগণ গবেষণা করিবেন।

জোর করিয়া হিন্দীকে, উত্তর-দক্ষিণ নির্বিশেষে সর্বত্র চাপাইয়া দিলে অপ্রীতিকর ঐক্যবিরোধী প্রতিক্রিয়া হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা। পাঞ্জাবেও এই অস্বাস্থ্যকর ঐক্যবিরোধী শক্তির উগ্ররূপ দেখা যাইতেছে।

কেবলমাত্র ধীর স্থির শান্ত বিবেচনার দ্বারাই এ বিষয়ে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। বিভেদমূলক আস্ফালনে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না। নি সংশয়ে এইটুকু বলা যায় যে, হিন্দীর প্রতি যে প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে—সেরূপ বিদ্বেষভাব কোনও প্রদেশ সংস্কৃতের বিরুদ্ধে দেখাইতেছেন না বরং সংস্কৃতের অনুকূলেই চিন্তাশীল মনীষিগণ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

শব্দসৃষ্টি করিতে সংস্কৃতের সম্ভাবনার সীমা নাই। ইংরাজীর পারিভাষিক শব্দসমূহ ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা হইতে প্রত্যয়যোগে গঠিত। এই সমস্ত শব্দকে ভাষান্তরিত করিয়া ভারতে আমদানী করিতে হইলে সংস্কৃতেই তাহা সম্ভব।

কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আবার অপরিবর্তিত আকারেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আরও ভাবিবার বিষয় এই যে, ইউরোপে এবং আমেরিকায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা আছে, এবং সেখানে সংস্কৃতে নিয়মিত পঠন-পাঠন ও গবেষণাদিও হইয়া থাকে। সুতরাং এককালে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করার সম্ভাবনা হিন্দী অপেক্ষা সংস্কৃতের অনেক বেশী। সংস্কৃতের সম্মান এবং মর্য্যাদা, পাশ্চাত্ত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ মাত্রেই, শ্রদ্ধার সহিত দিয়া থাকেন।

ইন্দো-ইউরোপীয়ান (কেহ কেহ বলেন ইন্দো-জার্মানিক) ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই সকল ভাষার প্রসূতিস্থানীয়া। এই গোষ্ঠীকে 'Aryan family of languages' বলা হয়। এই প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড রিচার্ড মরিস—'Historical Outlines of English Accidence'-এ বলেন—"The word Aryan is a Sanskrit word, meaning 'honourable,

noble'—It was the name by which the old Hindus & Persians, who at a very early period had attained a high degree of culture & civilization,—used to call themselves in contra-distinction to the uncivilized races or non-Aryans of India, whom they conquered.'

আর্য শব্দের এইরূপ উন্নত অর্থ সংস্কৃতেও গৃহীত হইয়াছে :—

"কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ ॥

আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (ঋ-ণে-ঘ্যণ ; অর্যা+ষ্ণ, আরাৎ পাপ কর্মভ্যো যাতঃ) মানী, শ্রেষ্ঠ, গুরু, সজ্জন।

এই ইন্দো ইউরোপীয়ান গোষ্ঠীর দুইটি প্রধান বিভাগ :

(ক) এশিয়াটিক (খ) ইউরোপীয়ান (ক) এশিয়াটিক বিভাগে পড়িয়াছে—

(১) সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃতোদ্ভব ভাষা—যথা হিন্দী, হিন্দুস্থানী, বাংলা, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি।

(২) ইরাণীয় গোষ্ঠী—

জেন্দ (আবেস্তার ভাষা), পহ্লবী, পার্সী বা পাজেন্দ্ প্রভৃতি।

(খ) ইউরোপীয়ান বিভাগে পড়িয়াছে—

(১) টিউটনিক ভাষাবর্গ

(২) কেল্টিক ভাষাবর্গ—যথা Welsh, Cornish, Irish, Gaelic (স্কটল্যাণ্ডের ভাষা), Manx (Isle of Man-এর ভাষা)

(৩) ইটালীয় ভাষাবর্গ

(৪) হেলেনিক ভাষাবর্গ—যথা প্রাচীন গ্রীক, আধুনিক গ্রীক ইত্যাদি।

(৫) স্লাভোনিক ভাষাবর্গ—যথা বুলগেরিয়ান, রাশিয়ান, বোহেমিয়ান, পোলিশ ইত্যাদি।

(৬) লেট্টিক ভাষাবর্গ—যথা ওল্ড প্রুশিয়ান, লেট্টিশ ইত্যাদি।

টার্কিশ, হাঙ্গারিয়ান, বাস্ক, ল্যাপিস, ফিনিশ এবং এস্থোনিয়ান ভাষা এই ইন্দো-ইউরোপীয়ান গোষ্ঠীর বহির্ভূত।

ইহা হইতে বোধগম্য হইবে—সংস্কৃতের ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত মর্য্যাদা কত উচ্চ এবং জগতের ভাষাসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম ভাষা সংস্কৃতের দান কি পরিমাণ!

এই পরিপ্রেক্ষিতের যুক্তিতর্কবলে আমরা নিঃসংশয়ে দাবি করিতে পারি যে সংস্কৃতকে দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদে ভারতের সরকারী ভাষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—The official language of the Union shall be Hindi in Devanagri script. অর্থাৎ—রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হইবে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী। সংস্কৃত কমিশন বলেন—পূর্বোক্ত হিন্দী শব্দটির পরে 'এবং সংস্কৃত' এই শব্দ দুইটি যোগ করিতে। অর্থাৎ, "রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হইবে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী এবং সংস্কৃত।"

সংস্কৃতের গৌরব এবং মর্যাদা ইতোপূর্বেই সংবিধানে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। সংস্কৃতকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দান করিলে ভাষার সম্পর্কে যে সংঘর্ষ উষ্মা এবং তিক্ততা উদ্ভূত হইয়াছে তাহার অবসান ঘটিবে। যে সকল রাজ্যে হিন্দী ব্যবহারে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে তাহারা স্বচ্ছন্দে ইংরাজী এবং সংস্কৃত উভয় ভাষা ব্যবহারের সুযোগসুবিধা লাভ করিতে পারে।

রাজ্যের বিভিন্ন আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানে ও নৈমিত্তিক ব্যাপারে সংস্কৃতের প্রয়োগ করা হইলে তাহার গাম্ভীর্য্য এবং গৌরব বাড়িবে।

শপথগ্রহণ, সভার উদ্বোধন,—সমাপ্তি-ভাষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর উপাধিদান,—বিভিন্ন বিদ্যাশিক্ষার অন্তে সমাবর্তন এবং রাষ্ট্রীয় সম্মান ও উপাধিদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে কমিশন সঙ্গত ভাবেই সংস্কৃতের প্রয়োগ দাবি করিয়াছেন।

কবিগুরু, এই মর্যাদা, সংস্কৃতকে ইতোপূর্বেই দান করিয়াছেন। যখন তিনি অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটির পক্ষ হইতে মরিস গ্যায়ারের নিকট ডক্টর উপাধি গ্রহণ করেন তখন তাঁহার সসম্মান স্বীকৃতি সংস্কৃত ভাষাতেই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষা যে মৃত নহে মুমূর্ষু ও নহে তাহার প্রমাণ,—এখনও ভারতবর্ষে ন্যূনকল্পে ত্রিশ চল্লিশখানি সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই কলিকাতায়ই বহু বিদগ্ধ মনীষী বাগ্মিতার সহিত সংস্কৃতে ভাষণ দিয়া থাকেন—নাটক, মহাকাব্য রচনা করেন।

সমগ্র শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি—পণ্ডিতপ্রবর স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী মহোদয় প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠায় সুললিত সংস্কৃত শ্লোকে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা নিয়মিতভাবে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় গত

তিন-চার বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। এখন সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, অধ্যাপক অমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ প্রমুখ সুধীবৃন্দ সংস্কৃত নাটক ও কাব্য প্রণয়ন করিতেছেন—পণ্ডিত গোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাগ্মিতার সহিত সংস্কৃতে ভাষণ দিতেছেন। হুগলী সংস্কৃত পরিষদের বালকবালিকাগণও কৃতিত্বের সহিত সংস্কৃত নাটকের অভিনয়াদি করিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন ও পত্রাদি ব্যবহার অবশ্যই অভ্যাসসাপেক্ষ। ভুলের ভয় করিলে কোনও ভাষাই শিক্ষা করা যায় না,—সংস্কৃতের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবেই প্রযোজ্য। নির্ভয়ে ভাষার ব্যবহার, অভ্যাস ও অনুশীলন করিলে, অচিরেই তাহা সহজ সাবলীল ও বিশুদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

(ভারত জ্যোতি— চৈত্র :, ১৩৬৪)

এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্মেলন

ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লীতে রবিবার ২৩শে মার্চ্চ ১৯৪৭ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্মেলনের বিরাট অধিবেশন আরম্ভ হয়। বত্রিশটি দেশের প্রায় আড়াই শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি দর্শকের আসনের প্রবেশপত্র পাইয়া এই সম্মেলন প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত দেখিয়াছিলাম। তাহার বিবরণ এই প্রবন্ধে স্বীয় মন্তব্যসহ লিপিবদ্ধ করিলাম।

এই সম্মেলনে যুদ্ধোত্তর জগতে এশিয়ার নিজস্ব অধিকার এবং স্থান সম্বন্ধে বিবিধ পর্য্যালোচনা, এশিয়ার দেশগুলির সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে মত-বিনিময় এবং এশিয়াবাসীদের মধ্যে পরস্পরকে বুঝিবার ও পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান দ্বারা মৈত্রী ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিবার উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে প্রতিনিধিগণের মধ্যে প্রায় এক পক্ষ কাল ধরিয়া হৃদ্যতাপূর্ণ কথোপকথন ও গবেষণা চলে।

রবিবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় পুরাতন কিল্লায়—বিশেষভাবে নির্মিত এক বিশাল মণ্ডপে অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

মনে হয় ইতিপূর্ব্বে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের পাটলিপুত্র, অথবা শাহান-শাহ আকবর, শাহজাহান প্রভৃতির সময়ে দিল্লীতেও এরূপ সুদূরস্থিত বিভিন্ন দেশ হইতে প্রেরিত প্রতিভূস্থানীয় প্রতিনিধিবর্গের এবং সদস্যবৃন্দের—জনবহুল সভা আর কখনও সমাহূত হয় নাই।

তিব্বতের প্রতিনিধিবর্গকে দিল্লী পৌঁছিতে ঘোড়া, মোটর-কার, রেল এবং বিমানযোগে,—পূর্ণ ২১ দিন সময় লাগে, আবার চীনের প্রতিনিধি মিঃ চেঙ্গ ই উ ফুন প্রভৃতি নানাকিঙ হইতে নয়া দিল্লী মাত্র ৩ দিনে বিমানযোগে আসিয়া পৌঁছান।

সভারম্ভে—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার শ্রীরাম—তাঁহার স্বাগত-সম্ভাষণ পাঠ করেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সভা উদ্বোধন করেন এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন।

আমন্ত্রিত দেশসমূহ

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ—যথা: সোভিয়েট রিপাব্লিকসমূহ, চীন, ইন্দোচীন, কোরিয়া, মোঙ্গোলিয়া, তিব্বত, ভুটান, আফগানিস্থান, ইরাক, ইরান, আরব, তুর্কি, প্যালেষ্টাইন, আর্ম্মেনিয়া,—ব্রহ্ম, মালয়, ভীয়েটনাম,—ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিংহল প্রভৃতি এশিয়ার সমস্ত দেশকেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়। মিশর এবং আফ্রিকার অন্যান্য স্থান হইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকেও পর্য্যবেক্ষক (Observer) হিসাবে আমন্ত্রণ করা হয়।

বেসরকারী এবং অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড্ অ্যাফেয়ার্স এই সম্মেলনের আয়োজন করেন।

এই সম্মেলনে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলোচনা বর্জ্জন করিয়া এশিয়ার দেশসমূহের সাধারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী আলোচিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

প্রতিনিধিবর্গের অনেকেই জাতীয় এবং সামাজিক বিশিষ্ট পরিচ্ছদ পরিহিত থাকায় সভামঞ্চের দৃশ্য বহু বর্ণে বিচিত্র এবং মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ঐতিহাসিক জনতা দেখিয়া শরীর কণ্টকিত, মন কৌতূহলান্বিত এবং আত্মা জাগ্রত ও উন্নীত হইয়া উঠে। দৃশ্যের পর দৃশ্যে মুগ্ধ চক্ষু যেন ক্যামেরার মত আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়া স্মৃতির পটে অবিস্মরণীয় চিত্রাবলী চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখে।

সভা-মণ্ডপ

সভামণ্ডপের উচ্চ মঞ্চের উপর সভানেত্রীর উভয়পার্শ্বে এসিয়ার প্রধান প্রধান ১৮টী দেশের প্রতিনিধি আসন গ্রহণ করেন। এই ১৮টী দেশের প্রতিনিধিবর্গের আসনের পশ্চাদ্ভাগে তত্তদ্দেশের ১৮টী বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত জাতীয়-পতাকা আলম্বিত থাকে। সভানেত্রীর দক্ষিণ দিকে: ১। আফগানিস্থান ২। সিংহল ৩। মিশর ৪। ইরান ৫। মোঙ্গোলিয়া ৬। শ্যাম ৭। ভীয়েটনাম ৮। ইরাক ও ৯। সিরিয়া এবং তাঁহার বাম দিকে: ১। ব্রহ্ম ২। চীন ৩। ইন্দোনেশিয়া ৪। লেবানন্ ৫। ফিলিপাইন ৬। তুরস্ক ৭। সাউদি আরব ৮। ট্রান্স্-জর্ডানিয়া ও ৯। ইমেন থাকে।

ইহাদের ঠিক একস্তর নিম্নে একদিকে আর্মেনিয়া, ভুটান, আজার-বাইজান, তাজাকি-স্থান, নেপাল এবং অপরদিকে—কোচিন-চায়না, কাজাকি-স্থান, মালয়, উজবেগিস্তান এবং তিব্বতের প্রতিনিধিবর্গের ৫ টী করিয়া ১০ টী আসন করা হয়।

মঞ্চের পটভূমির সর্ব্ব-পশ্চাতে এশিয়ার প্রকাণ্ড মানচিত্র এবং তাহার উপরে ইংরাজিতে A S I A নামটী নিও-লাইট আলোক-অক্ষরে ঝলমল করিতে থাকে।

সম্মেলনের সভানেত্রী এবং প্রতিনিধিদলগুলির নেতৃবৃন্দকে লইয়া কার্য্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। প্রথম দিন দ্বিপ্রহরেই এই সমিতির প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে সম্মেলনের জন্যে গোলটেবিল গঠন ও বিশদরূপে কার্য্য-তালিকা নির্দ্ধারণ করা হয়।

জাতীয় আন্দোলন, লোক-বিনিময় ও জাতি-সমস্যা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়, সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং নারী সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনার জন্য পাঁচটী বিভিন্ন গোলটেবিল গঠিত হয়।

এশিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীন ইন্দ্র-প্রস্থ হস্তিনা-পুরের ধ্বংসস্তূপের উপর এই সম্মেলনের মণ্ডপ স্থাপন করা হইয়াছে। ইতিহাসের

সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে মনে হয় এই সম্মেলনের জন্য এই স্থানই যোগ্যতম—যেখানে দাঁড়াইয়া ইতিহাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠে 'যদুপতেঃক্ক গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃক্ক গতোত্তরকোশলা ?' শুধু তাই নয়, তাহার পর—বৌদ্ধ-জৈন পাঠান মোগল সংস্কৃতির কত বিজয়-বৈজয়ন্তী এই মহানগরীর উপর বিক্রম প্রকাশ করিয়া অবশেষে ইহারই ধূলায় মিলাইয়া গেল তাহার কে ইয়ত্তা করিবে! যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যাইত না আজ সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্চতম চূড়াও সেই মহানগরীর পবিত্র ধূলায় আপন সত্তা বিলীন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

লীগের অসহযোগিতা

দুঃখের বিষয় এই বিরাট আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্মেলনে মুসলীম লীগ সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করেন, যদিও মুসলিম এবং অ-মুসলিম বহুদেশ হইতে বহু মুসলিম প্রতিনিধি আসিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রশস্ত এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করিয়া কেন যে তাঁহারা কূপ-মণ্ডূকের আদর্শ গ্রহণ করিলেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সকল মুসলিম দেশই তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন।

মিশর হইতে মুস্তাফা মোমিন, মিস্ করিমা সৈয়দ, ইরাণ হইতে ডাঃ গোলাম হোসেন সাদিকি আসিয়াছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার সকল প্রতিনিধিই মুসলিম ছিলেন, কেবল দুইজনমাত্র ক্রীশ্চান,—তাঁহাদের অগ্রণী হইয়া আসিয়াছিলেন ডাঃ আবু হানিফা। মালয়ের প্রতিনিধিও মুসলিম—ডাঃ বর্হামুদ্দীন। আরব-লীগের পক্ষে—মিঃ ঠাও্ কিরুদ্দীন। ভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিও বহুসংখ্যক ছিলেন—তাঁহারা আলিগড় ও নিজামের ষ্টেট হইতে আসিয়াছিলেন। ডাঃ জাকির হোসেনের নামও ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের অবদান

স্থান কাল পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং অভিনবত্ব অনুধাবন করিয়া এশিয়ার এই আন্তর্জাতিক মহা-সম্মেলনে—এই সাংস্কৃতিক ভাবধারার ভগীরথ এই মহাযজ্ঞের প্রধান হোতা এবং অধ্বর্য্যু—রবীন্দ্রনাথের মহাবাক্যই ইহার উদ্বোধন মুহূর্তের প্রথমেই মনে পড়িল—

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

জগতের লোক-সংখ্যার অর্দ্ধেক সংখ্যক নরদেবতাকে একত্র করিবার সাধনায় যে সিদ্ধি আজ লাভ হইল 'উদারছন্দে পরমানন্দে',—মহাকবিই তাহার প্রথম বন্দনা-বাণী গান করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—

'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে'—***
'হে রুদ্র বীণা, বাজো বাজো বাজো,—
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে',
'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।

ঋষি-চেতনার উদ্ভাসিত হইয়া কবি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—

'দুঃসহ ব্যথা হবে অবসান, জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ,
পোহায় রজনী জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

আজ তাই 'সবার পরশে পবিত্রকরা তীর্থনীরে'—মা'র অভিষেকের মঙ্গলঘট পূর্ণ করিবার সময়—মহাকবিকেই প্রথমে স্মরণ করি। অতীতের দিকে চাহিয়' তাঁহারই ভাষায় মনে হইল, এতদিন যেন—

"অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্য সম পুঞ্জ মেঘ ভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্য্যের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্চ্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমি পানে
অবসাদে অবনত ক্ষীণবাস চির প্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা
ক্লান্তি ভারে আঁখি পাতা বন্ধপ্রায়। শূন্যে হেন কালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

*　*　*

মনে ভাবি—
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবী
নূতন বাহিরি এল"।

এই প্রাচীনের জীর্ণ উত্তরীয় ত্যাগ করিয়া নূতনের বিজয়-কেতনের চীনাংশুক উড়াইয়া যে মুক্তি মন্ত্র তিনি গান করিয়াছিলেন সেদিন, তাহাতে

নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে আজ দিল্লীর পুরাণো দুর্গের দ্বারে—এই অনাদি কালের জীবন্মৃতকে যে মুক্তিমন্ত্রে সঞ্জীবিত করা হইল তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই তপস্যায়।

বিশ্বমানবের বৃহত্তর জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার সাধনায় তিনি সৃষ্টি করিলেন তাঁহার মহাকাব্য, তিনি গড়িয়া তুলিলেন তাঁহার বিশ্বভারতী (The International University) বিশ্বের সকল সংস্কৃতি একত্র করিয়া,—এবং তাঁহার সেই একত্রীকরণের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল এতদিনে এই সাংস্কৃতিক মহা সম্মেলনে। তাঁহার বিশ্বভারতী তাঁহারই ভাষায়:—"Represents India, where she has her wealth of mind which is for all. Visva-Bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best."

দীর্ঘ নিদ্রা ও দীর্ঘসুপ্ততার জড়িমাযুক্ত এশিয়ার—নবযুগের সূত্রপাত ও নূতন প্রাণ-স্পন্দন শুরু হইল মহাকবির তপস্যায় এবং ভারতবর্ষই এই মহা সম্মেলনের আতিথেয়তার গৌরবময় কর্তব্যভার গ্রহণ করিল। যে কোন কারণেই হউক, মহাকবি সম্বন্ধে এই কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ না করায়—দিল্লীর সম্মেলনের একটি মহান ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রও ভিন্ন পথে ও ভিন্ন প্রণালীতে এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একসূত্রে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অবদানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্তব্য ছিল।

বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিকতার অগ্রদূত হিসাবে বোধহয় রাজা রামমোহনের নাম উল্লেখ করা সর্বপ্রথমেই কর্তব্য ছিল এবং তাহার পরেই স্বামী বিবেকানন্দের। তাহার পর দেশবন্ধু ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম Pan-Asiatic Conference এর পরিকল্পনা করেন।

অন্যূন দ্বাদশ সহস্র প্রতিনিধি ও দর্শকের সম্মুখে সদ্য-নির্মিত সুন্দর ও সুসজ্জিত এক বিরাট পটমণ্ডপে অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

সম্বর্দ্ধনা

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার শ্রীরাম সর্বপ্রথমে সকল প্রতিনিধি ও সদস্যবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন:

সমগ্র এশিয়ায় এক বিশাল কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। তাহার অন্তর্ভুক্ত দেশ ও

জাতি সকলের অভাব, অনটন, উদ্দেশ্য এবং বিধেয় অনেকটা একই রকমের সুতরাং সেই সকল জাতি ও দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী স্থাপিত হইলে সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে।...এই সম্মেলন ভিন্ন ভিন্ন জাতির গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সরকারীভাবে হইতেছে না, পরন্তু এক অবিভক্ত মহাদেশের হিতৈষণায় তত্তদ্দেশের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রজাপুঞ্জের সম্মিলিত ইচ্ছায় সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু বে-সরকারীভাবে হইলেও এই সংঘবদ্ধ সম্মেলনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সকলকে সকল গভর্ণমেণ্টই সম্মান করিতে এবং সম্ভব হইলে কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য হইবে।

পরিশেষে তিনি বিদেশীয় প্রতিনিধিবর্গকে সম্মেলনের কার্য্য শেষ করিয়া আরও কিছুদিন থাকিয়া এই দেশের শিল্পী, লেখক, দার্শনিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে ও দ্রষ্টব্য স্থান সকল পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার অভিভাষণ দান করিতে উঠিলে সমগ্র সভামণ্ডপের অন্যূন দ্বাদশ সহস্র সদস্য এবং লোহিত সাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র এশিয়ার প্রায় আড়াইশত প্রতিনিধিবৃন্দ তুমুল হর্ষধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থিত করেন।

তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন :

বিজ্ঞানের এই মারাত্মক আণবিক বোমার যুগে শান্তিরক্ষার জন্য এশিয়াকে একযোগে এক সংঘবদ্ধ মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ করিতে হইলে এশিয়াকে শান্তিপূর্ণ এবং একতাবদ্ধ করিতে হইবে। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ শূন্যে উবিয়া যাইতেছে। যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা দ্রুতবেগে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

তিনি 'এক জগৎ' (One-World) এর আদর্শের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলেন :—

এই আদর্শকে আমাদিগকে বাস্তবে পরিণত করিয়া রূপ এবং অবয়ব দান করিতে হইবে। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সহিত এই আদর্শ ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাহাকেই আমরা সমর্থন করি। আমরা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ চাহি না।

জাতীয় মুক্তি এবং স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের পোষকতা করা প্রত্যেক দেশেরই অবশ্য কর্তব্য হইলেও স্বাধীনতা লাভের পর ইহাকে আক্রমণশীল ও আন্তর্জাতিক উন্নতির পরিপন্থী হইতে দেওয়া চলিতে পারে না।

এশিয়ায় ইউরোপের প্রভুত্ব

এশিয়ার গৌরবময় ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়া পরে পণ্ডিত নেহেরু বলেন :

গত দুইশত বৎসরের মধ্যে এশিয়ার বহু অংশে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং বহু অংশ ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলির সহিত ভারতের যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল তাহা ছিন্ন হইয়াছে এবং ভারতে ইংরাজ আগমনের ফলে প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত তাহার আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছে।

বর্তমানে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের সহিত আমাদের চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িতেছে। জলপথ আবার উন্মুক্ত হওয়ায় এবং বিমান চলাচলের প্রসার হওয়ায় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার আমরা পুরাতন বন্ধুরূপে মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। আমাদের গভীর মিলনাকাঙ্ক্ষা এই সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শান্তি, অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিনিময়

সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পণ্ডিতজি বলেন :

অন্য কোন দেশ বা মহাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ বা আক্রমণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেহ কেহ সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়া এই সম্মেলনকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে এশিয়ায় মিলিত আন্দোলন বলিয়া কল্পনা করিতেছেন। কাহারও বিরুদ্ধে এরূপ কোনও দুরভিসন্ধি আমরা পোষণ করি না। আমরা চাই সমগ্র জগতে শান্তি ও প্রগতির পথ প্রশস্ত করিতে এবং ইহাই আমাদের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা। আমরা চাই আত্মনির্ভরশীল হইতে। পাশ্চাত্ত্য দেশের দরবারে আমরা বহুদিন ধরিয়া আবেদন নিবেদন করিয়া অরণ্যে রোদন করিয়া আসিয়াছি। আমরা চাই যে এখন হইতে ইহার অবসান হউক। আমাদের সহিত যাহারা সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সহিত আমরা সহযোগিতা করিব—কিন্তু অন্যের ক্রীড়নক হইয়া আমরা আর থাকিব না।

জগতের আন্তর্জাতিক ব্যাপারে—এশিয়া আর অন্যের কথায় উঠিতে বসিতে ইচ্ছুক নহে সে তাহার স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং নিজস্ব নীতি পালন করিয়া চলিবে।

তিনি বলেন :

যদিও বর্তমান সম্মেলন এশিয়ার দেশগুলিকে একত্র করিবার একটি সামান্য প্রয়াস মাত্র তথাপি এইরূপ অনুষ্ঠান এই প্রথম বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অনন্যসাধারণ। এই সম্মেলনে ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু সম্ভাবনার ভিত্তি স্থাপন করা হইল। আমাদের সময়ের ইতিহাস যখন বিরচিত হইবে তখন এই সম্মেলন এশিয়ার ইতিহাসের এই অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি সীমারেখা টানিয়া দিবে। এই ইতিহাস রচনায় আমাদের সহযোগিতা থাকায় আমরাও সেই ঐতিহাসিক গৌরবের কিয়ৎ পরিমাণে অংশভাগী হইব।

এক গোষ্ঠী

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু তাঁহার আবেগময় এবং উদ্দীপনাপূর্ণ অভিভাষণে সম্মেলনের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বলেন :—

"আমরা চাঁদ ধরিয়া দিবার জন্য শিশুর মত আব্‌দার করিব না। আমরা স্বীয় শক্তিবলে জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে আমাদের আদর্শ আমাদের লক্ষ্যের চাঁদকে উৎপাটন করিয়া, করতলগত করিয়া, এশিয়ার স্বাধীনতার বেদীমূলে সমর্পণ করিব। মহামারী, মৃত্যু, বিপ্লব ও বিপর্যায়ের কবল হইতে এই জগত যাহাতে শান্তিসুখময় সুস্থ এবং সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে তাহার জন্য তিনি সমাগত প্রতিনিধিমণ্ডলীকে সমগ্র এশিয়ার পক্ষ হইতে সংকল্প করিবার জন্য আহ্বান করেন।

প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠাই এশিয়ার আদর্শ, এশিয়ায় শাশ্বত এবং মহান্ আদর্শ। এশিয়ার বিভিন্ন জাতিকে, নানা ভাষা, নানা আচার এবং নানান্ পরিষদেয় সত্ত্বেও এক গোষ্ঠীতে পরিণত করিতে হইবে, এক যোগসূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে। এই আদর্শ 'নেতি'—বাদ-মূলক নহে, সংগঠনমূলক সৃষ্টির প্রেরণা প্রাণশক্তি ও আনন্দ হইতেই ইহার উৎপত্তি এবং আনন্দেই ইহার প্রতিষ্ঠা।

অতঃপর ভারত ও বিদেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে প্রেরিত অভিনন্দনবাণী সম্মেলনে পঠিত হয়। তন্মধ্যে জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব, ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী সুলতান শারীর, আরব লীগের সেক্রেটারী আজম পাশা ও স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর পত্র পঠিত হয়।

তারপর কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডাঃ আবদুল মজিদ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন: যদি আমাদের বাঁচিতে হয়,—তাহা হইলে বর্তমান পরিস্থিতিতে একতাবদ্ধ হওয়া ব্যতীত বাঁচিবার উপায়ান্তর নাই। তাহার পর সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত আর্মেনিয়া ও আজার-বাইজানের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন।

ভুটানের প্রতিনিধি এবং নেতা মিঃ ডরজি বলেন—আমি ভুটান হইতে সরল শুভেচ্ছাপূর্ণ হিমালয়ের পার্বত্য বাতাসের অভিনন্দন আনিয়াছি। তাহার পর ব্রহ্মের প্রতিনিধি জেনারেল আউঙ্গ সাঙ্গ ভাষণ দান করেন। অতঃপর ইন্দোচীনের প্রতিনিধি, চীনের প্রতিনিধি—চেন্ ইন্ ফান্—সিংহলের প্রতিনিধি মিঃ বন্দরনায়ক বক্তৃতা করিলে পর মিশরীয় প্রতিনিধি মিঃ মোস্তাফা মোমিন্ বলেন, এশিয়াই মানব সভ্যতার শৈশবের দোলনা স্বরূপ। তিনি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়াকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন।

এই মহাসম্মেলনে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষ হইতেও প্রেক্ষাকারী (Observer) উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ হইতে অধ্যাপক ক্যাটলিন এবং ডাঃ পি, এন্, এস মানসের্গ (লণ্ডনের Royal Institute of International Affairs হইতে) উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পক্ষে মিঃ ও মিসেস্ রিচার্ড অ্যাডলফ্ (Institute of Pacific Relations হইতে) উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিনের সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বেশভূষা, নরনারীর বিভিন্ন মুখাবয়ব, মহিলাদের বিচিত্র সাড়ী,—পশ্চাদ্ভাগে বিবিন্ন বর্ণালীসমন্বিত এশিয়ার সম্মিলিত দেশ সমূহের জাতীয় পতাকা,—তিব্বতের প্রবহমাণ পরিচ্ছদ, বর্মার শিরোপিধান প্রভৃতির সমবায়ে যে বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম তাহাতে মনে হইল যে পৃথিবীর অন্য কোনও ভূভাগে এইরূপ কোনও মহতী সভা আহুত হইলে তাহাতে বেশভূষা, ভাষা এবং মুখাবয়বের এত বিভিন্নতার ও বৈসাদৃশ্যের মধ্যে—এত গভীর আন্তরিকতা, হৃদ্যতা ও চিন্তাধারার সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়া বোধ হয় কোনমতেই সম্ভব হইত না। কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা সকলকে একছাঁচে ঢালিয়া এক করিতে চায়! এশিয়ার সভ্যতা সর্বপ্রকার আপাত বৈষম্য ও বিভিন্নতাকে মানিয়া লইয়া এক বিরাট কন্সার্ট পার্টির মত ঐকতান বাদন করে, যাহাতে প্রত্যেকের আপন আপন বৈশিষ্ট্য অটুট এবং

অক্ষুণ্ণ থাকিলেও মানব-সভ্যতার মৈত্রীর মূল সুরটির ছন্দ ও শ্রুতিমাধুর্য্যের কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে না।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

মহা-সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রথমে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীত্ব করেন। শরীর অসুস্থ বোধ করায় সভা শেষ হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে সভাপতির পদে বসাইয়া শ্রীযুক্তা নাইডু চলিয়া যান। পরে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আসিলে স্যার রাধাকৃষ্ণণের অনুরোধে তিনি সভার কার্য পরিচালনা করেন।

উজবেগিস্তানের প্রতিনিধি, তাঁহাদের জাতীয় প্রথা অনুযায়ী, সভাপতি পণ্ডিত নেহরুকে একটী জমকালো লাল-সোনালী সিল্কের গাউন, একটী নীল সিল্কের উত্তরীয় ও একটী লাল টুপি (ইহাই উজবেগী জাতীয় পরিচ্ছদ) তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিলে সভায় কৌতুক ও আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, ইহুদি ও আরব প্রতিনিধিরা স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের মধ্যস্থতায় তাঁহাদের সভার কলহ সভাতেই মিটাইয়া. পরস্পরের সহিত করমর্দন করেন এবং পণ্ডিত নেহরু তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানান। তখন সভাস্থ সকলেই সভার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তুমুল হর্ষধ্বনি করেন।

আজ প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে প্রথমে, মিশরীয় মহিলা সম্মেলনের পক্ষ হইতে মিস্ করিমা সৈয়দ বলেন :

এই সম্মেলন প্রাচ্যদেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা গড়িয়া তুলিবে। ভারত এবং মিশর জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তন্নিবন্ধন রাজনৈতিক উৎপীড়নে পরস্পরের সহিত মৈত্রী ও সহানুভূতির দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। তাহারা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া পরস্পরের স্বাধীনতা লাভের জন্য একতাবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির নিকট তাহাদের যোগ্য মর্য্যাদা দাবী করিবে। মিশর এবং ভারতবর্ষের সাহায্য না পাইলে গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে গত যুদ্ধের বিজয় গৌরব লাভকরা কদাপি সম্ভব হইত না।

ডাঃ তাই চি তাও (President of the Executive Yuan of China) পণ্ডিত নেহরুর নিকট যে বাণী প্রেরণ করেন শ্রীযুক্তা নাইডুর অনুরোধে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাহা পাঠ করেন।

মানব সভ্যতা আজ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হইতেছে। এশিয়ার প্রাচীন ঋষিদের উপদেশ ভুলিয়া যাইবার ফলেই এই সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কেবল মাত্র পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিলেই যথেষ্ট হইবে না, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যেও শুভেচ্ছার মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

জর্জিয়ান্ সোভিয়েট রিপাবলিকের প্রতিনিধি মিঃ কুপরাজ দে জর্জিয়ার জনগণের পক্ষ হইতে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি ডাঃ আবু হানিফ বলেন :

এই সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিগণের উপস্থিতি এই হিসাবে বিশেষ অর্থপূর্ণ যে এই প্রথম আমরা আমাদের তথাকথিত অভিভাবক ও উপদেষ্টাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশীরা ইন্দোনেশিয়ায় আসিয়াছে।···ইহাদের মধ্যে ভারতীয়গণ এবং তাঁহাদের ন্যায় অপর কেহ কেহ সদুদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে। আবার ওলন্দাজগণ এবং জাপানীরা স্বার্থপরবশ হইয়া শোষণ করিবার জন্য আসিয়াছে এবং ইন্দো-নেশিয়ার যাহা কিছু মূল্যবান সম্পদ তাহা নিজেদের দেশে চালান করিয়াছে। ইন্দোনেশীয়গণ চিরদিনই শান্তিপ্রিয়। যদি ইন্দোনেশীয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তবে তাহারা ওলন্দাজদের সহিতও বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্তা নাইডুর অনুরোধক্রমে ডাঃ হানিফ সুলতান শারীয়ারের বাণীর কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনান। সুলতান শারীয়ার বলিয়াছেন :

এই সম্মেলন যে মহান উদ্দেশ্য ও নীতি লইয়া আহূত হইয়াছে ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণ তাহা পরমাগ্রহে সমর্থন করে। আমরা বিশ্বাস করি যে এই সম্মেলন এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র ও তাহাদের জনসাধারণকে একত্র করিয়া ইহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী করিয়া তুলিয়াছে। এই সম্মেলন যুদ্ধের পরে ঠিক উপযুক্ত মুহূর্তেই আহ্বান করা হইয়াছে। যুদ্ধে আমাদের সকল দেশই বিশেষভাবে ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, এবং এখন এই সকল দেশই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। এই সমস্ত দেশের উন্নয়ন এবং পুনর্গঠন সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাদের সমাধান করিবার জন্য এই সম্মেলন বিশেষ উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই।

ইরাণের প্রতিনিধিগণের নেতা ডাঃ গোলাম হোসেন সাদিগি বলেন—

এশিয়াবাসী আজ মূলতঃ পাঁচটী বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অভ্যুদয় এবং মহিলা-আন্দোলন যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত ও প্রগতিশীল হইয়া উঠিতে পারিবে না,—এই দেশগুলিও সর্ব্বোচ্চ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবে না। আজ এশিয়ার জাগরণের মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। আজ আমাদের জাতি ধর্ম্ম, বর্ণ প্রভৃতি সকল বৈষম্য ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে যাহাতে এশিয়ার প্রত্যেক নরনারী এবং শিশু, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বৈজয়স্ত ধারণ করিয়া নিজেদের এবং উত্তরকালের বংশধরগণের অভ্যুদয় সম্পাদন করিতে পারে।

কাজাকিস্তানের প্রতিনিধি মিঃ শাহরিকার শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পর মালয় প্রতিনিধিগণের নেতা ডাঃ বরহানুদ্দীন বলেন :

এই সম্মেলন এশিয়াবাসিগণের সংঘবদ্ধ হইবার আন্তরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এশিয়ার অধিকাংশ দেশের আভ্যন্তরীণ জটিল সমস্যা সমূহ এতদিন এশিয়াবাসিগণকে সংঘবদ্ধ হইতে দেয় নাই। ভারতবর্ষই এশিয়াকে সম্মিলিত করিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে-- এই সম্মেলন এশিয়ার আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী ও একতার প্রথম ধাপ স্বরূপ।

নেপালী প্রতিনিধিগণের নেতা মেজর জেনারেল স্যার বিজয় সামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা বলেন—

আমার দেশটী ক্ষুদ্র এবং হিমালয়ের পার্ব্বত্য নীড়ে লালিত। দেশবাসীরা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অন্তঃকরণে বলিষ্ঠ এবং স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প। আমরা সরল ও সাদাসিধাভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তবুও আমাদের দেশে নানাবিধ সমস্যা আছে। আমরা এই সম্মেলনে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিব তাহা যে আমাদিগকে ঐ সমস্ত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। নেপাল ও ভারতের মধ্যে সখ্যের বন্ধন শাশ্বতিক। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। এই বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। কালক্রমে এই বন্ধন আরও দৃঢ়, আরও ঘনিষ্ঠ হইবে। এই সভ্যতার বন্ধন এই সম্মেলনে আমাদের প্রতিবাসী এবং অন্যান্য দেশবাসী-জনগণের সহিতও তেমনি ঘনিষ্ঠভাবে আমাদিগকে সম্মিলিত করিবে এই আশা পোষণ করিয়াই আমি এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছি।

প্যালেষ্টাইন ইহুদীগণের প্রতিনিধি অধ্যাপক স্যামুয়েল বার্গম্যান বলেন যে তিনি প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্মের এবং এশিয়ার এক প্রাচীনতম ভূখণ্ডের শুভেচ্ছা লইয়া আসিয়াছেন। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্বে তাঁহারা আপন মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন—এই সম্মেলনের বিবিধ বিচিত্র সমস্যা ও তাহাদের সমাধানের উপায় কৌশল অবগত হইয়া তাহা তাঁহাদের নিজ দেশে লইয়া যাইবার জন্য।

ইউরোপ বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সদিচ্ছাপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপন করিতে অক্ষম হইয়াছে। ইহুদীগণ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ এবং সর্ব্বত্রই নির্য্যাতিত। বিগত যুদ্ধে তাহাদের বহুলক্ষ নরনারীকে গ্যাস চেম্বার প্রভৃতি পাশবিক উপায়ে হত্যা করা হইয়াছে। ইহুদীগণ তাহাদের বৈজ্ঞানিক ও যৌথ কৃষি-শিল্পের বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য ও সহযোগিতা দান করিতে ইচ্ছুক। তাহারা তাহাদের প্রাচীন হিব্রু ভাষা আধুনিক প্রয়োগপদ্ধতির উপযোগী করিয়া ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার দেশের আরও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গের উল্লেখ করিবার সময় সভাপতি স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁহাকে সেই বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন, কারণ তাহা এই সম্মেলনের বিষয়ীভূত নহে। অতঃপর উপসংহারে অধ্যাপক বার্গম্যান সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করিয়া ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

এই সময়ে ম্যাদাম করিমা এল্ সইয়দ (মিশরীয় প্রতিনিধি) সভাপতির অনুমতি লইয়া ইহুদী প্রতিনিধি অধ্যাপক বার্গম্যানের বিরুদ্ধে প্যালেষ্টাইনের ঘরোয়া বিতর্ক মূলক কথা সম্মেলনে উপস্থিত করার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, প্যালেষ্টাইনের ইহুদীগণের সহিত আরবদিগের কোন বিরোধ নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহারা পরস্পরের সহিত প্যালেষ্টাইনে বন্ধুভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহারা চাহেন না যে ইউরোপীয় ইহুদীগণ বৃটিশের বাহুবলে জোর করিয়া আসিয়া প্যালেষ্টাইনে বসবাস করেন। ইহাতে অধ্যাপক বার্গম্যান তাহার প্রত্যুক্তি করিতে চাহিলে সভাপতি তাঁহাকে অনুমতি দিতে অক্ষম হইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে তাহা হইলে তর্কের জটিলতা বাড়িয়া যাইবে এবং সভার মূল উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটিবে। ইহাতে অধ্যাপক বার্গম্যান মঞ্চ হইতে অবরোহণ করিয়া সভামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাহার দুই মিনিটকাল পরেই, স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর তাঁহার অনুসরণ করিয়া ও তাঁহাকে শিষ্ট বাক্যে

বুঝাইয়া সহাস্যমুখে পুনরায় সভামণ্ডপে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। তখন আরব এবং ইহুদী প্রতিনিধিগণ হর্ষভরে পরস্পরের পাণিপীড়ন করিলে সভার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তুমুল হর্ষধ্বনিতে আলোড়িত হইয়া উঠে। প্রত্যেক দ্রষ্টার মনের মধ্যে তখন এই কথাই বিশেষভাবে প্রতীত হয় যে স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের সুমীমাংসা করিয়া যে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন তাহা না হইলে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত এবং প্রথম সম্মেলনের ইতিহাসে একটা দুঃখের এবং ক্ষোভের গভীর ক্ষত থাকিয়া যাইত। এই তুমুল হর্ষধ্বনি স্যার ভাটনগরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

প্যালেষ্টাইনের ইহুদী প্রতিনিধি অধ্যাপক বার্গম্যানের প্রতি নিরপেক্ষ ব্যবহার করা হয় নাই বলিয়া তিনি মনে করায় পণ্ডিত নেহরু দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন:

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলোচনা এড়াইয়া চলাই আমাদের অভিপ্রেত ছিল। সকলেই জানেন যে ভারতের জনসাধারণ গত বহু বৎসর ধরিয়া ইউরোপের এবং অন্যান্য স্থানের ইহুদীদের দুঃখদুর্দশায় সহানুভূতি জানাইয়া আসিয়াছে। যখনই ক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে তখনই ভারতবাসীগণ তাহাদের পক্ষসমর্থন করিয়াছে এবং তাহাদের দুঃখের অবসান কামনা করিয়াছে। সেই সঙ্গে বিতর্কের মনোভাব বর্জন করিয়া আমাদিগকে ইহাও বলিতে হইবে যে নানা কারণে ভারতের জনসাধারণ মনে করে যে প্যালেষ্টাইন মূলতঃ আরব দেশ সুতরাং আরববাসীদের সম্মতি না লইয়া কোনও সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। আমরা বরাবর আশা করিয়াছি এবং এখনও আশা করিতেছি যে প্যালেষ্টাইন হইতে তৃতীয় পক্ষ যদি চলিয়া যায় অথবা অপসারিত হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট দলগুলির পক্ষে নিজেদের মধ্যে সকল সমস্যার মীমাংসা করা সহজসাধ্য হইবে।

তৃতীয় অধিবেশন

সম্মেলনের উপসংহার:—শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর অনুরোধে ২রা এপ্রিল আন্তঃএশিয়া সম্মেলনে গান্ধীজী বক্তৃতা দিতে উঠিলে বিংশ সহস্রাধিক দর্শক, প্রতিনিধি ও পর্য্যবেক্ষকগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। তিনি বলেন:

পশ্চিমে যাইয়া খৃষ্টধর্ম বিকৃত হইয়া পড়ে। প্রাচ্যের বাণী প্রেমের বাণী সত্যের বাণী। আণবিক বোমা সৃষ্টি করিয়া পশ্চিম আজ হতাশ হইয়া পড়িতেছে। উহার ফলে শুধু পশ্চিম নহে সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংস হইতে পারে। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইলে শীঘ্রই মহাপ্লাবন হইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তাহা না হয়।

বক্তৃতার সময় হর্ষধ্বনি করা তিনি সমর্থন করেন না, তাহাতে বক্তৃতার বাধা সৃষ্টি করা হয়। অখণ্ড বিশ্ব গড়িয়া তোলার তিনি পক্ষপাতী, সত্য ও প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া তাহা সম্ভব করিতে হইবে।

২রা এপ্রিল, প্রাতে সম্মেলনের অধিবেশনে একটি স্থায়ী আন্তঃএশিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহার গঠন প্রস্তাব এই যে প্রতিদেশে একটী করিয়া জাতীয় ইউনিট থাকিবে। ঐ সকল ইউনিট কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের একটী পরিষদ থাকিবে। প্রতি সদস্য-দেশের প্রতিনিধি লইয়া এই পরিষদটী গঠিত হইবে।

আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে হইবে স্থির হয়।

পরিচালনা-কমিটির পক্ষ হইতে ডঃ ওয়েন উয়ান মিং প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন। পণ্ডিত নেহেরু ও রাণী রাজওয়াদী উল্লিখিত অস্থায়ী পরিষদে ভারতীয় সদস্যরূপে থাকিবেন।

অপরাহ্নে আন্তঃএশিয়া প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী সাধারণ পরিষদের যে সভা হয় তাহাতে পণ্ডিত নেহেরু সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। সম্মেলনে যোগদানকারী ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিসহ মোট ৮৫ জন সদস্য লইয়া এই অস্থায়ী পরিষদ গঠিত হয়।

ভারতের প্রতিনিধি মিঃ বি, শিবরাও এবং চীনদেশের প্রতিনিধি মিঃ হাম লিউ সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হ'ন। যে-পর্য্যন্ত না একটী নিয়মতন্ত্র রচিত হয় সে পর্য্যন্ত সাময়িক ভাবে পরিষদের কার্যালয় পরিচালনের নির্দেশ-নামার খসড়া প্রস্তুতের জন্য একটী সাব-কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতি, দুইজন সম্পাদক, এইচ, ই আলি আসগার হেকমৎ (ইরাণ) মিঃ বন্দর নায়েক (সিংহল) বিচারপতি মিঃ কাইয়ো মিন্থ্ (ব্রহ্ম) এবং ডাঃ আবু হানিফা (ইন্দোনেশিয়া) কে লইয়া এই সাব-কমিটি গঠিত হয়।

কোরিয়া হইতে আগত মহিলা প্রতিনিধি, কোরিয়াবাসী স্ত্রীলোক ও

বালিকাদের পক্ষ হইতে উপহারস্বরূপ প্রেরিত দুইটী পুতুল পণ্ডিত নেহেরু ও শ্রীযুক্তা নাইডুর হাতে অর্পণ করিলে সমবেত জনমণ্ডলী তুমুল হর্ষধ্বনি করেন।

ভিয়েৎনাম রিপাব্লিকের সভাপতি ডাঃ হো চি মিনের বাণী তথাকার প্রতিনিধি পাঠ করেন, সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে না পারায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি জানাইয়াছেন,—"সম্মেলনের অধিবেশনকালে আমার মন ও চিন্তাধারা আপনাদের সহিতই যুক্ত থাকিবে। সম্মেলনের সাফল্যে আমাদেরই জয় সূচিত হইবে। কারণ উহা এশিয়াবাসী নরনারীর জয় ঘোষণা করিবে।"

উপসংহারে পণ্ডিত নেহেরু বলেন :

মানবতার নিকট এশিয়ার শাশ্বত শান্তির বাণী মহা মূল্যবান। পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল শক্তি করায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও এই কল্যাণপূর্ণ শান্তির অভাব রহিয়াছে। তাই উক্ত সভ্যতাই আমাদিগকে পশুর স্তরে অবনমিত করিয়াছে। এশিয়ার অন্তর্নিহিত ভাবসত্তা ও প্রজ্ঞা সে অভাব পূরণ করিতে পারে।

ডাঃ শারীয়ার (ইন্দোনেশিয়া) ঘনঘন হর্ষধ্বনির মধ্যে ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন :—

এশিয়াবাসীদের পুনর্গঠন করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। আমাদের সকলকে সমদর্শিতা ও আদর্শবাদের পথে চলিতে হইবে। ইহার ফলে অখণ্ড এশিয়ার সৃষ্টি হইবে এবং পরিণামে অখণ্ড জগৎও সৃষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্তা নাইডু উপসংহার বক্তৃতায় বলেন :

বিভিন্ন প্রতিনিধির মুখে একই দাবী ধ্বনিত হইয়াছে—ইহার প্রেরণা হইতেই স্বাধীন ও সম্মিলিত এশিয়া গঠিত হইবে। আজ ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্থাপনা করিলাম। এই ভ্রাতৃত্বের ফলে কাহারও শক্তি প্রভুত্বপরায়ণ হইবে না।

মহাসম্মেলন সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য

এশিয়াই জগতের সকল ধর্ম এবং সংস্কৃতির মাতৃভূমি স্বরূপ। এই মহাদেশেই জগতের সকল মহাধর্ম জন্মলাভ করিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, তাও, কনফ্যুশীয়, জরথুস্ত্র, ক্রীশ্চান ও ইসলাম এই মহাদেশেই জন্মলাভ করিয়া জগতে ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকবিস্তার করিয়াছে।

প্রথম দুই দিনের সাধারণ-সভার এবং পরবর্তী সব কমিটির কার্য্য বিবরণী হইতে ও তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলি হইতে আমাদের মনে হয় যে এশিয়াবাসী সকলেই আজ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কামনা করে।

এশিয়াবাসীগণ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উভয় গোলার্দ্ধের মধ্যে যাহাতে মৈত্রী ও শান্তি স্থাপিত হয় তাহার জন্য ব্যগ্র এবং সচেষ্ট। জগতের মানব সাধারণের স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতে স্বাধীন মানবজাতির মধ্যে যে সহযোগিতার যুগ সমাসন্ন,—এশিয়ার এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনকে আমরা তাহারই সূচনা বলিয়া মনে করি।

এশিয়া আজ নিরপেক্ষভাবে সকল নাগরিককে সমান চক্ষে দেখিতে চায়। সকল ধর্মের জন্য তত্তদ্ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে। জাতি হিসাবে কেহ কাহাকেও গরিষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বলিয়া কোনও ভেদবাদের সমর্থন করেন না।

এই মহাদেশের ভারতবর্ষই যেন স্বতঃসিদ্ধ মিলনক্ষেত্র। এশিয়ার পূর্ব দিকে বৌদ্ধ জগৎ,—পশ্চিম দিকে মুসলিম জগৎ,—অধোদিকে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও মালয় হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধের মিলনক্ষেত্র, উর্দ্ধে সোভিয়েট রুশিয়া—মানব সাধারণের সমান সামাজিক অধিকারের গৌরবময় পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এশিয়ার আদর্শ—মিলনের আদর্শ, একত্রীকরণের আদর্শ—প্রতিদ্বন্দ্বিতার আদর্শ নহে। ইহার বাণী শান্তির বাণী—বুদ্ধ হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত মৈত্রী ও শান্তির বাণী বহন করিয়া চলিয়াছেন। রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র এই সম্মেলনের পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন, যাহা পণ্ডিত নেহেরু ও শ্রীযুক্তা নাইডু কার্য্যে পরিণত করিলেন।

এই সম্মেলন জগতের সমগ্র জাতির মিলনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকিবে—সকল জাতির সহিত—সমান অধিকারে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার সহযোগিতায় আবদ্ধ হইবে। কাহাকেও শোষণ করিবে না, কাহাকেও শোষণ করিতেও দিবে না। জগতের মানব সাধারণের জীবন যাপনের অর্থনৈতিক স্তরকে উন্নত পর্য্যায়ে সংস্থাপিত করিবে। বৈজ্ঞানিক কৃষি ও শিল্প সমবায়ের সাহায্য তাহা গ্রহণ করিবে।

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতির পরিসমাপ্তি করিয়া তাহারা স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবে। শিক্ষা প্রসারণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এই দুইটী সমস্যাই প্রধান সমস্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এশিয়ার জাতির মধ্যে যাহারা আজিও পরাধীন তাহাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য এশিয়ার সকল জাতিই ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগতভাবে সাহায্য করিবে। মহিলা প্রগতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতাকে জগতের বর্তমান স্তরে উন্নীত করিতে হইবে।

এখন এশিয়ার স্বাধীনতা—শৈশবের দন্তোদ্গমের বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র

—আর একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই এশিয়া হইতে সাম্রাজ্যবাদের চরম অবসান ঘটিবে।

এশিয়ার সামাজিক আদর্শ হইবে 'Casteless and Classless', সর্বপ্রকার ভেদ ও অসাম্য দূর করিয়া সে খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহাবীর, মহম্মদ, কনফ্যুসিয়াস ও শ্রীচৈতন্যের আদর্শকে জগতে স্থাপিত করিবে এবং অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা, দ্বেষ হিংসা, গৃধ্নুতা, পরস্বাপহারিতাকে বিদূরিত করিয়া জগতের মানব সমাজে মনুষ্য সভ্যতার চরম এবং পরম আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

এশিয়ায় এই নব জাগরণ নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিবে। উহা পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। পাশ্চাত্ত্য জগৎ আজ গৃহ-কলহে নিমজ্জিত। আণবিক বোমা দ্বারা জগৎকে ধ্বংস করিতে উদ্যত। পাশ্চাত্ত্যের আজ একান্ত প্রয়োজন প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারা। এই মৈত্রী-সম্মেলন শুধু যে বিশ্বশান্তির অনুকূল তাহা নহে পরন্তু ইহা অখণ্ড বিশ্বশান্তির ভারবাহী স্তম্ভ-স্বরূপ। বিভেদ-জর্জরিত পৃথিবী যখন আজ উন্মত্তবেগে ধ্বংসের দিকে ধাবমান হইতেছে, তখন যে সম্মেলনে পৃথিবীর অর্ধাধিক লোক একত্র হইয়া শান্তি ও কল্যাণের হিতবাদ প্রচার করিতেছে তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে অতি বিপুল তাহা প্রশ্নের অতীত। পৃথিবীর উভয় গোলার্ধ ইহার প্রভাবে প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্মেলন এশিয়ার জাতিসমূহের সম্মুখে এক নূতন যুগ আনিয়াছে। বিশ্বমানবের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইহার বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। ভারতবর্ষ অদ্যাপি স্বাধীনতালাভ না করা সত্ত্বেও এশিয়ার স্বাধীন জাতিসমূহ ভারতের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়া ভারতের আধ্যাত্মিক গৌরবকেই শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। তাই ভারতবর্ষের শান্তির মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি :—

পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ
শান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ
সা মা শান্তি রেধি শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভি স্তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ
শময়াম্যহম্ যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরংতচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

'বর্তমান'—বৈশাখ ১৩৫৪

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে মানুষের স্থান

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে মানুষ। মানুষের সুখদুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয় পরাজয়ের সহিত তাঁর নিবিড় যোগ এবং গভীর পরিচয়। ভগবান মানুষকে তাঁর নিজের ছাঁচে সৃষ্টি করেছেন—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীব ভূতঃ'—মানুষ তাঁর অংশাবতার। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই রূপ যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং কাব্যে মানুষই যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ সৃষ্টি—তা স্বীকৃত, গীত এবং প্রচারিত হয়েছে। এই স্বীকৃতি মোহাবিষ্ট মনের ক্ষণিক ভাবোচ্ছাস নয়—ইহা তত্ত্বদর্শী মনের সত্যকার উপলব্ধি। তুলসীদাসের 'সব ঘট বিরাজের রাম', উপনিষদের—'সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', বিবেকানন্দের—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন পূজিছে ঈশ্বর।' সত্যেন্দ্রনাথ এই চরম সত্য এবং পরম সত্যকে তাঁর অনিন্দ্য ভাষায় এবং ছন্দে রূপ দিয়েছেন—'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি। এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত এক রবি শশী মোদের সাথী।

'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবারি সমান রাঙা।'

তাঁর 'কুহ্মানাদপি' কবিতায় বারাঙ্গনা-বন্দনা, সাম্য-সাম, শূদ্র, মেথর, জাতির পাঁতি, প্রভৃতি কবিতাগুলি ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে এই অতলস্পর্শ, অপরিমেয় মানব-তত্ত্বের রহস্যোদ্ঘাটনেই বিনিযুক্ত হয়েছে।

এই মানবতত্ত্বই কাব্য-সাহিত্যের ভিত্তি বিধায়—Matthew Arnold কাব্যকে Criticism of Life বলেছেন। Lyall ও এই দিক দিয়াই কাব্যকে minute mental dissection আখ্যা দিয়েছেন।

এই মানবতত্ত্বকে বিরাট এবং ব্যাপক ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং' ক'রে সকল নরনারীর অন্তঃকরণের সুখ-দুঃখের ধুক-ধুক করা স্পন্দন তিনি নিজের হৃৎপিণ্ডের ভিতর অনুভব করেছেন যার পরিচয় পাই—'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য', 'পতিতা' 'বাসবদত্তা' 'মুক্তি', 'ফাঁকি', 'নিয়তি' প্রভৃতি তাঁর বহু কবিতায়। আবার অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ

নিজেকে নিখিল জগতের সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন —তাদের বিচিত্র সুখ দুঃখের অনুভূতির অংশভাগী হবার আগ্রহে। কবির চিত্তবীণার তন্ত্রীতে আনন্দ-গীতি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে—

'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া ··

'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয় তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া'

'ইচ্ছা করে মনে মনে···স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে'

'দেশ দেশান্তরে···জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে'

সত্যেন্দ্রনাথ এরূপ বৃহৎ বিরাট্ ব্যাপক ভাবে নিজকে বিশ্বময় বিলিয়ে দিতে পারেন নি সত্য। তাঁর অনুভূতির পরিধিও খুব বিস্তৃত নয়—তা সাধারণ মানবের সুখ দুঃখের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তিনি আপনার সহানুভূতি ও সম-বেদনায় দেশের নর-নারীর নিত্যকার বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছেন। বালবিধবার দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেছেন :—

'গঙ্গার ধারা যতদূর যায়, ওগো দয়াময় তাহারো পারে
লয়ে যেয়ো এই সুখবঞ্চিত চিরলাঞ্ছিত ভস্ম ভারে'

(ভিরোজিয়ো-র অনুবাদ)

পতিতাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—

'সূর্য্য যদি না বর্জ্জন করে তোরে,
আমিও তোমারে করিব না বর্জ্জন'

(হুইট্‌ম্যানের অনুবাদ)

সকল স্বর্গকামী পুণ্যাত্মাকে ডেকে বলেছেন—

'মন্দির কন্দর ছাড়ি এস বন্ধু এস বাহিরিয়া
স্বর্গের কামনা ভোলো প্রব্যথিত মানবের হিয়া।'

(তীর্থরেণু অনুবাদিত কবিতায়)

সকলকে মানুষের কাজে মানুষের মাঝে ডেকে বলেছেন—

'এস এস মানুষের মাঝে,
নরলোকে আছে কাজ স্বর্গে তুমি কি লাগিবে কাজে?' ঐ

স্বর্গের সম্পদ, স্বর্গের অমৃত কবিকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি।

রবীন্দ্র-কাব্য পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বভৌম অনুভূতির মধ্যে বিলীন এবং পরিব্যাপ্ত। 'ভাব

হ'তে রূপে, এবং রূপ হ'তে ভাবে' অবিরাম আকাশবিহারী কবির আসা-যাওয়া তাঁর অনুভব, আস্বাদন, প্রকাশভঙ্গী এবং আবেদন নৈর্ব্যক্তিক এবং তাতে অর্থের চেয়ে ইঙ্গিত অনেক বড়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সরল ভাবে এবং সরল ভাষায়—সুস্পষ্ট অর্থে সকলের পক্ষে সুবোধ্য এবং সুগোচর করে তুলেছেন। তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ সুপ্রচুর, 'বুঝলাম না' বলবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের গভীরতা অগাধ, অতলস্পর্শ, দুরবগাহ, তিনি অরূপ-রতন আশা করে রূপ-সাগরে ডুব দেন। তার উচ্চতাও দুরারোহ, প্রাংশুলভ্য। বিশেষ অধিকারীর কথা স্বতন্ত্র কিন্তু সাধারণ পাঠক উদ্বাহু হয়েও সকল সময় তাঁর নাগাল পায় না, প্রাঞ্জলতা এবং সহজবোধ্যতার দরুণ সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যামৃত রসাস্বাদন সাধারণ পাঠকদের পক্ষেও অনায়াসসাধ্য। তাঁর রচনা পাঠকসাধারণের চিত্তকে সুখ-দুঃখের দোলায় বিচিত্রভাবে আন্দোলিত করে।

সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনা

বর্ণনার দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের ভঙ্গী বস্তুতান্ত্রিক এবং বহির্মুখী, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভাবঘন এবং অন্তর্মুখী। তাঁর ভাবাবেগ প্রাণধর্ম্ম এবং সৃষ্টিশক্তি এতই প্রচুর এবং সক্রিয় যে অতি সাধারণ বস্তুতন্ত্র রচনাতেও তাঁর প্রতিভার অলৌকিক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে তাকে স্নিগ্ধ-মেদুর-মাধুর্য্যে মণ্ডিত করেছে। আলঙ্কারিক ভাষায় তাঁর রীতিকে বলা যেতে পারে বৈদর্ভী রীতি, তাঁর ইঙ্গিত পদে পদে তাঁর অর্থকে অতিক্রম করে যায়, অভিধার চেয়ে ব্যঞ্জনা হয় জটিল এবং প্রহেলিকাময় এক সমস্যার কাণ্ডে অন্য অনেক সমস্যা শাখা বিস্তার করে—পত্রপুষ্পফলে সফল ও সুন্দর অথচ ছায়া এবং সুরভিতে নিবিড় ও মনোজ্ঞ হয়ে উঠে। সত্যেন্দ্রনাথের রীতি প্রধানতঃ গৌড়ী রীতি, বর্ণনা বস্তুতন্ত্র, সঙ্কীর্ণ কিন্তু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, অর্থ অভিধা-প্রধান। 'কোদাল'কে তিনি সুস্পষ্টরূপে কোদাল বলেই প্রকাশ এবং প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রধান—সত্যেন্দ্রনাথ নিজের নামকে সার্থক করে সত্য-প্রধান। সত্যের তুলনায় ভাব অনেক বেশী ব্যাপক এবং বিচিত্র। সত্যের শুভ্র আলোককে সে স্বীয় প্রতিভার ত্রিকোণ স্ফটিকে (prism) প্রতিহত ও বিচ্ছুরিত ক'রে ইন্দ্রধনু রচনা করে। ভাবতন্ত্র কবির দান অকৃপণ এবং উদার। সত্য-পরতন্ত্র বা

বস্তুতন্ত্র কবির দান অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ সত্যেন্দ্রনাথের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করি :

'হাড় বেরুনো খেজুরগুলো, ডাইনী যেন ঝামর চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে লোক দেখে কি থম্‌কে গেলো ?
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে রাত্রি এলো, রাত্রি এলো। (তীর্থরেণু)

কোথাও অস্পষ্টতা নাই, এই বর্ণনা মূর্ত্তিমন্ত জীবন্ত এবং বাস্তবধর্মী। সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা জ্বালিয়ে উর্ম্মিমুখর সাগরের পারে কোনও অপরিচিতার আলয় নির্দেশ করবার স্পর্দ্ধা তার নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ চারণ কবি

সত্যেন্দ্রনাথকে নিঃসন্দেহে বাংলার চারণ কবি আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর বঙ্গজননী, সিংহল, তাজ, কবর-ই-নুর-জাহান গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি, কম্মাধু, যুক্তবেণী, বুদ্ধ পূর্ণিমা, আখেরী প্রভৃতি কবিতা দেশের ঐতিহ্য কথায় উচ্ছ্বাসে এবং ভাবে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য অতি সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের বিচিত্রতায় এবং অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ হলেও তিনি একাধারে জীবনের সর্ব্ববিধ তত্ত্বের বিশ্বচক্ষু ঋষি এবং তাঁর প্রতিভার প্রকাশ সর্ব্বতোমুখী। তিনি বৈষ্ণব কবি, সুফি কবি, মরমী কবি, দরদী কবি, প্রকৃতির কবি, অপ্রাকৃতের কবি, মানবপ্রেমের কবি, বিশ্বপ্রেমের কবি।

অপর দিকে সত্যেন্দ্রনাথ Boswell-এর অনুরাগ নিয়ে এবং তদপেক্ষাও প্রশস্ততর কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে কবিগুরুর প্রতি তাঁর ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে 'আভ্যুদয়িক' কবিতায় তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাস পাই :—

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্তসাগর মিলল আসি।
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা
বিশ্ব কবি সভায় ওগো বাজাও বীণা হাজার-তারা।

প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথ সহস্রতন্ত্রী বীণা বাজিয়েছেন। বিশ্বের কাব্যকুঞ্জকে বিচিত্র রাগরাগিণীর ঝঙ্কারে অনুরণিত করে গেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর

সপ্ততন্ত্রী বিপঞ্চিকায় সাতটি যে তার সেই তার কটি বাজিয়েই তৃপ্ত হয়েছেন এবং তৃপ্তি দান করেছেন।

তাঁর 'মনীষী বন্দনা' বা বীরপূজা (hero-worship) বিষয়ক কবিতাগুলিতে তাঁর অসংকীর্ণ ও অকৃপণ মনের অনসূয়া, উদারতা এবং বিশ্বমৈত্রীর স্বতঃসমুৎসারিত জাহ্নবী-ধারারই কুলু কুলু ধ্বনি শুনতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর মনীষী মঙ্গল, বুদ্ধ পূর্ণিমা, নমস্কার, গান্ধীজী, শ্রদ্ধাহোম, বড়দিনে, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দীন দরিদ্রের বন্দনা করেছেন এবং তাঁর চারণ গীতি সার্থক হয়ে উঠেছে তাঁর 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'র স্তুতি গানে, কণ্ঠ তাঁর মুখরিত হয়ে উঠেছে দেশের মনস্বীদের কীর্তিকথা বর্ণনে।

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি।
তুমি জগৎধাত্রীরূপা পালন কর পীযূষ দানে
মমতা তোর মেদুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে।

ব্রাউনিং-এর তীব্র ভাবাবেগ শেলির নিগূঢ় কল্পনাকুশলতা রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়লোকের নিবিড় ধ্যানৈকতানতা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে সুপরিস্ফুট হয় নাই সত্য কিন্তু তথাপি তাঁর অবদানে অপ্রাচুর্য্য নাই। তাঁর ভাষা, বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষা হতে চয়ন করা শব্দ-সম্পদ, তাঁর বিচিত্র ছন্দ বিরচনা তাঁর উন্নত এবং অনবদ্য ভাবরাজি যে কোন দেশের যে কোন কবিকে গৌরব দান করতে পারে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'He uttered nothing base।' এ কথা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিও প্রযোজ্য। তিনি শুধু যে তাঁর রচিত কাব্যে কুরুচি এবং অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেন নাই তাই নয়, তিনি যা কিছু পরিবেশন করেছেন তার দ্বারা তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে, তাঁর জাতিকে জাতীয়তায়, আত্মমর্য্যাদায়, স্বাধীনতার শ্লাঘায় এবং উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন। অতীতের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস, পুরাণ, আরণ্যক ইত্যাদির বিবরণ থেকে যা কিছু গ্রহণীয় ও সঞ্চয়নীয় তা তিনি নিজের প্রতিভার রসায়নে রঞ্জিত করে উপস্থাপিত করেছেন। এই মৃতকল্প জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে প্রত্যক্ষের ঊর্দ্ধে সুদূর আদর্শলোকে।

কবি ও স্বাধীন ভারতের সভাকবি

সত্যেন্দ্রনাথ রূপক ব্যাখ্যান করেন নি, এবং নরনারীর প্রেমের অথবা যৌন আকর্ষণের বিলাস বিবর্ত্ত সম্বলিত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বৈচিত্র্য তাঁর কবিতায় প্রকাশ পায় নাই এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি যা দিয়েছেন তা দার্শনিক তত্ত্বের জল্পনা-কল্পনায় পূর্ণ বা পরিপুষ্ট না হ'লেও তাকে নিছক কাব্য হিসাবে উপভোগ করার কোন বাধা হয় না। মূলতঃ মানব জীবন, কৃতী মানুষের জীবনী, নৈসর্গিক দৃশ্য, সাময়িক ঘটনা, লাঞ্ছিত নরনারীর জন্য বেদনাবোধ ইত্যাদিই তাঁর অধিকাংশ কবিতার উৎস। হয়ত নূতন ছন্দের রচনা-কৌতূহলে রূপ ও রীতি কখনও বর্ণনীয় ভাবকে ছাপিয়ে গিয়েছে, তবলায় বোল হয়ত গানের সুরকে চাপা দিয়েছে কিন্তু তবুও তাঁর প্রতিভাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই, তাঁর উদার অন্তরের মত তাঁর সমস্ত কবিতাই ঔদার্য্যে শ্লীলতায় শালীনতায় এবং শুচিতায় পরিপূর্ণ। তিনি oriental mystic বা প্রাচ্যের ঐশ প্রেমের মরমিয়া কবি নন, কিন্তু তাঁর অনিন্দ্য ছন্দে ও কথায় স্বাধীন ভারতের যে কল্পনালোক তিনি রচনা করে গেছেন তারই সভা-কবির আখ্যা তাঁকে দিলে অসঙ্গত হয় না। তিনি প্রহ্লাদ-জননীর মুখে বলেছেন—

কার তরে এই শয্যা দাসী রচিস আনন্দে
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে তোর দে রে আগুন দে !

* * *

বিদ্রোহ নয় বিপ্লব নয় ন্যায্য অধিকার

* * *

তীর্থ হ'ল বন্দীশালা শিকল অলঙ্কার ;
খেদ কিছু নাই আর না ডরাই চিত্তে মাভৈঃ রব
উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এই মম গৌরব।
কয়াধু তোর জনম সাধু মোছরে চোখের জল—
রাজরোষেরি রোশনায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জল।

পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার পর 'রবীন্দ্র-নমস্কারে' সত্যেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে যে ধিক্কার দিয়েছিলেন, আজ সে কথা আরো কত সত্য।

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা
জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা।
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত পারা
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্রে দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং ভাবধারা, কিন্তু তিনি দ্রষ্টা কবির তৃতীয় নেত্র এবং দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে ব্যথিতের বেদনা উপলব্ধি করেছিলেন, আর্ত্ত মানবতার বেদনা তাঁর অন্তরকে মথিত করে তুলেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ আরও সন্নিকটে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দারিদ্র্যপীড়িত অস্পৃশ্য পতিত নরনারীকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং বহু কবিতায় তিনি মনুষ্যসৃষ্ট ভেদবৈষম্যকে সর্ব্বজন সমক্ষে কশাঘাত করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি :

"এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি গলে
পশুর অধম অসুর দণ্ডে মানুষেরে তবু দলে !"

* * *

"দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখ না খোলো মন্দির দ্বার
দেবতা কাহারো নহে তৈজস দেবভূমি সবাকার"।

ছন্দোবৈচিত্র্য

বাক্য এবং অর্থের সুষ্ঠু সংযোজনায় রসসৃষ্টি হলেই তার ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের তারতম্যেই কাব্যের স্তর তম নির্দ্ধারিত হয়। বাক্যের প্রধান অলঙ্কার ধ্বনি এবং অনুপ্রাস, অর্থের প্রধান সম্পদ তার ভাব এবং ব্যঞ্জনা, তার স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

বাগ্‌বিন্যাসের প্রধান রীতি যতি ও প্রস্বরের (accent) বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ছন্দের বহুবিধ প্রাচুর্য্যে এবং মাধুর্য্যে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু এই ছন্দের পরীক্ষণের ফলে সমুদ্ভূত প্রত্যেকটি কবিতাই যে রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে তা নয়, বরং তার কতকগুলি ছন্দ তার একঘেয়ে আবর্ত্তনের পৌনঃপুনিকতায় যে পরিমাণে মনকে অভিভূত এবং কানকে পরাভূত করে, সে পরিমাণে ঠিক প্রাণকে কাব্যরসে রসায়িত করে না। সেজন্য আধুনিক সমালোচকদের কেহ কেহ তাঁহাকে কবি না বলে শুধু ছান্দসিক বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁর পিয়ানোর গান, পাল্কীর গান, দূরের পাল্লা প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। এগুলিতে গানের সুরকে অতিক্রম করে বাদিত্রের (accompaniment) বা সহকারী যন্ত্রের ঔদ্ধত্য প্রকাশ হলে যে দোষ হয় সেই দোষই হয়েছে। কিন্তু তাই বলে বহু মৌলিক

ছন্দ রচনা ক'রে এবং বহুবিচিত্র স্বদেশী ও বিদেশী ছন্দের আমদানী করে কাব্য-সাহিত্যকে তিনি যেরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ করেছেন আধুনিক কালের সমালোচক যদি সে অপরিশোধ্য ঋণ না স্বীকার করেন তবে সে অকৃতজ্ঞতাও অক্ষমণীয়তার পর্য্যায়ে পড়বে। কতকগুলি ছন্দে, বিশেষতঃ হালকা পল্‌কা দ্রুতচ্ছন্দে আবৃত্তি দীর্ঘ হলে কানের যেন মুখ মেরে যায়—একটা Cloying effect হয়। এক-এক জন গায়ককেও ঠিক একই অপরাধে অপরাধী বলে মনে হয় যখন তিনি গানের আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী বা আভোগের যে কোন একটি পর্ব্ব ধরে ক্রমাগত 'ফুনিয়ে' এবং 'ফেনিয়ে' শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিপর্য্যস্ত এবং শ্রোতাকে বিপন্ন করে তোলেন। গানের melody বা মাধুর্য্য এবং কবিতার রস একই পর্য্যায়ভুক্ত। উভয়ই মূকাস্বাদনবৎ। শ্রোতা এবং ভোক্তার অনুমোদন ইহার কষ্টিপাথর। তাই সংশয়ে ভয়ে কবি বলেন—

"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

সত্যেন্দ্রনাথ ছান্দসিক ছিলেন স্বীকার করি কিন্তু হীনার্থে নয় বিশিষ্টার্থে। তিনি যে কেবল অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, মিত্রাক্ষর বা অমিত্রাক্ষর দিয়ে chronometer বা metronome অর্থাৎ কালমান বা তালমান যন্ত্রের মত ছান্দসিক ছিলেন তা নয়।

ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। যাঁরা বাংলাদেশে বাউলের নাচ দেখেছেন পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, কখনও গোপীযন্ত্র বাজিয়ে, কখন এক হাতে একতারা অন্য হাতে ডুগি বাজিয়ে অপূর্ব্ব ছন্দের লহরী তুলতে,—তাঁরাই উপলব্ধি করবেন বাংলা ভাষার ছন্দপ্রবণতা অন্য ভাষার চেয়ে কত বেশী। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে বহু অপূর্ব্ব এবং বিচিত্র স্বদেশী ও বিদেশী ছন্দ অপরূপ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে। সেই কবির নিপুণ হস্তের প্রসাধনে এবং সুরের ঝঙ্কারে ছন্দরাজি মূর্ত্তিমন্ত এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

অনুবাদ কাব্য

তাঁর অনুবাদ Fitz Gerald প্রমুখ বিখ্যাত কবিদের সমপর্য্যায়ভুক্ত বললে অত্যুক্তি করা হয় না। ধর্ম্ম সাধনায় 'আর্জ্জবং' বা ঋজুতাকে প্রথম সোপান বলা হয়েছে। সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতই সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি ঋজুতা ও

সত্যবাদিতার বিজয়-বৈজয়ন্তী স্বরূপ। তাঁর অনুবাদ কবিতাগুলি একই কালে অনুবাদ ও নূতন কাব্য এবং এত সহজ ও সরস যে অনুবাদ বলে মনেই হয় না, পরন্তু অধিকাংশ রচনাতেই মৌলিক রচনার আস্বাদন লাভ করা যায়।

'তীর্থ রেণু' ও 'তীর্থ সলিলে'র রহস্য-কুঞ্চিকায় দেখতে পাওয়া যায় জগতের সকল দেশের সকল প্রচলিত ভাষার পরিচিত কবিদের কাব্য তিনি অনুবাদ করে বঙ্গভারতীকে উপহার দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার ভাবার্থ এই যে, তাঁর এই লেখাগুলি 'মূলকে বৃন্ত স্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।'

সেই স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যের সাধনার ধন প্রস্ফুটিত কুসুমগুলিকে অপরের নামে সংযোজিত করে সত্যেন্দ্রনাথ যে কৃতিত্বের ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে গেছেন তা অতুলনীয়।

গীতি-কাব্য

সত্যেন্দ্র-প্রতিভার আর একটি বিশিষ্ট দিক তাঁর 'গীতিকাব্য'। তাঁর 'সবুজ পরী' যেন রূপকথার সেই সোনার কাঠি, যার স্পর্শে জেগে ওঠে ঘুমন্ত রাজকন্যা। অপর দিকে তাঁর 'লাল পরী' যেন রূপকথারই সেই ঘুম পাড়ানো রূপার কাঠি। সবুজ পরী—যৌবনের পরী, জীবনের পরী, তারুণ্যের সোমরস পানে মত্ত সে জীবন-বীণায় যৌবনের জয়গাথা গান করে। লালপরী—ইন্দ্রপুরে অবাধগমনা—তার মানা নেই,—কিন্তু সবুজ পরীর প্রবেশ নিষেধ হয়েছে, কারণ—

"সবুজ পরী এক ঝোঁকে,—মানুষ রাজার পুত্রকে
বাসলো ভালো কায়মনে"

এই অপরাধ এই তো পাপ — অমনি হ'ল দৈব শাপ
থাকতে হবে মর্ত্ত্যে গো — মৃত্যু কীটের গর্ত্তে গো।
সবুজ পরী টললো না, — শাপের ভয়ে ভুললো না
ভালো বেসেই ধন্য সে — চায় না কিছু অন্য সে
চায় না যেতে স্বর্গে আর — মানুষ যে প্রেম পাত্র তার।

লাল পরীর ইন্দ্র সভায় প্রবেশ নিষেধ হয় নাই, সে নিষিদ্ধ ফল আস্বাদ করে নাই। সে কিশোর লোকের অপ্সরী।

"কিশোর কিশলয় পরে তোমার পরশ সঞ্চরে"

সবুজ পরী ধরণীর ধুসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে, সবুজ পাখা দুলিয়ে, পাগল আঁখির পরে তার যুগল আঁখি ঢুলিয়ে যায়। 'যাদুকরের পান্না জ্বলে তোমার হীরার আংটীতে'— সে যাদুকরী।

ঘাসের শীষে সবুজ করে শিস্ দিয়েছ সুন্দরী
তাই উথলে হরিৎ সোনা কুঞ্জবনের বুক ভরি।
যৌবনেরে যৌবরাজ্য দেওয়া তোমার নিত্য কার্য্য
পাঞ্জা তোমার শ্যামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী।

তোমার হাতে হেম ঝারি—
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী।
সব্জে তোমার দোব্জাখানি আলোছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লোটায় বিভোল বিভ্রমে।

নিখিল জীবন তোমার বশ
আলোর তুমি বুকচেরা ধন অন্ধকারের রভস রস।
রামধনুকের রং নিঙাড়ি, রাঙাও ধরার মলিন সাড়ী
মরুভূমির সবজী বাড়ী নিত্য গাহে তোমার যশ।

নূতন সুরের উদ্গাতা
গাহ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয়গাথা।
ভরা দিনের তীব্র দাহে অরণ্যানী যে গান গাহে
যে গানে হয় সবুজ বনে শ্যামল মেঘের জাল পাতা।

জর্দাপরীকে বলা যায়—'the elan vital'—the dash of life—সে যেন কবির 'বিদ্যুৎপর্ণা':

"মোরা উঠি পল্লবি বিদ্যুৎ লতিকায়,
নীহারিকা ছায়া ছবি মোরা নাচি ঘিরি তায়
দিয়ে যাই মস্তরে নূতনের হর্ষ, সঁপে যাই অন্তরে বিদ্যুৎ স্পর্শ,
দিয়ে যাই চুম্বন, চলে যাই উন্মন" * * *

তাকে প্রশ্ন করুন :

"জর্দ্দাপরী জর্দ্দাপরী হিরণ জরীর ওড়না গায়—
রৌদ্রে এবং বিদ্যুতে তুই পাখনা মেলে যাও কোথায় ?"

সাড়া পাবেন—"যাই কোথায় ? হায়রে হায়—
সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির ভায়।

প্রশ্ন করুন—"রূপবতীর রোষের মত স্বর্ণ সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত অঙ্গ চন্দ্রমার" ?

গরবিনী উত্তর দেবে—"আবার কার ? এই আমার !
কুঙ্কুমেরি অঙ্কে চরণ রাঙাই উৎস জ্যোৎসনার"

প্রশ্ন করুন—

"ধনের ঘড়া বক্ষে তোমার জোনাক পোকার হার চুলে
আলেয়া তোর চক্ষে জলে চাইলে চোখে চোখ ঢুলে"

উত্তরে সোহাগ ভরে সে পরিহাস করে বলবে—
"চোখ ঢুলে ? মন ভুলে ?"

অহঙ্কার করে সে বলবে—

"কুবের পুরীর সোনার কপাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে।"

আমরা বলি—দুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস
দুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস্ তায় নিরাশ।

বিদ্রূপ করে চোখ বাঁকিয়ে সে বলবে—
বাস্‌রে বা'স ! সোনার চাষ !

অমনি কি হয় ? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দেয় কি বাস" ?

মুগ্ধ হয়ে লুব্ধ হয়ে আমরা বলি—

"এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস্ আঁখির ভায়
সাধের কাঁদন জাগিয়ে ফিরিস্ দিস্‌নে ধরা ফিরাস্ পায়"।

শ্লেষ করে সেই অতিথি-পরিভাবিণী অম্লান বদনে বলবে—

"ফিরাই পায় ? হায় গো হায় !
পরশমণি চায় যে আগে সকল হরষ তার বিদায়" !

বুকের পাঁজর ঝাঁঝর করে মাড়িয়ে চলে যায় সে,—আমরা

অনুযোগ করে বলি—

"জর্দ্দাপরী জর্দ্দাপরী জরির জুতা সোনার পায়
মাড়িয়ে তুমি চলছ খালি ফুলের ডালি ডাইনে বাঁয়"।

সে তার পরম পারিতোষিক অপাঙ্গে বর্ষণ করে বলে—

"সোনার পায় মাড়াই যা'য়
আমার স্বয়ম্বরের মালা, আসোকলতা তার গলায়।
এবার রূপকথার রূপার কাঠি স্পর্শ করে ঘুম পাড়াবার

জন্য আসেন নীল পরী—

"তার কানে সুনীল অপ্‌রাজিতা পাপড়ি চুলে জাফ্‌রানের
পায়ে জড়ায় নূপুর হয়ে শেষ বাসরের রেশ গানের"।

তাকে ডেকে কবি বলছেন—"নীল পরী গো নীল পরী,

নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী!
কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা টিপটী নীলা কাঁচ পোকার,

* * *

তন্দ্রা তোমার সুর্মা চোখের তন্দ্রা তোমার আল্‌তা পা'র,

* * *

স্বপ্ন তোমার সাড়ীর আঁচল মূর্চ্ছা নিচোল নীল বরণ
ঘুম যে তোমার আলগা চুমা মরণ নিবিড় আলিঙ্গন"।

ইহার উপর টীকা-টিপ্পনী করা কুমুদ-কহ্লারের প্রসাধনের মতই নিরর্থক। কবিতাপাঠ শেষ হলেও নীল পরীর পায়ের নূপুরের রেশটুকু যেন কানে বাজতে থাকে।*

———

* সত্যেন্দ্র সাহিত্যসত্রে, কবির ৬৫তম জন্মবার্ষিক স্মৃতিবাসরে সভাপতির অভিভাষণ।

উভয়লিঙ্গ নির্বাণ

('শূন্য'-নির্বাণ বনাম 'ব্রহ্ম'-নির্বাণ)

যুগে যুগে দার্শনিকগণ দুঃখের স্বরূপ নির্ণয়পূর্ব্বক, দুঃখ দূর করবার জন্য বিবিধ পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন। 'আমার যেন দুঃখ দূর হয়'—'আমার যেন দুঃখ আর না হয়'—ইহাই যদি পুরুষার্থ হয় তা হলে অনন্ত কালের জন্য আমার সমস্ত দুঃখ দূর হোক ইহাই জীবের পরম কামা বা পরম পুরুষার্থ।

সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন উভয়ই যুক্তিপ্রধান। সাংখ্য সূত্রকার বলেন, "অথ ত্রিবিধদুঃখাদত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ হতে যে শাশ্বতিক নিবৃত্তি তাই পরম পুরুষার্থ।

দুঃখের প্রকার :-আমাদের যে সমস্ত দুঃখ হয় তা বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক। বাহ্য আবার দ্বিবিধ, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। সুতরাং দুঃখ ত্রিবিধ, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক।

পার্থিব কারণে জৈব বা অজৈব বস্তুজাত যে দুঃখ তা আধিভৌতিক। অপার্থিব কারণে, সর্ব্ববিধ সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রাণিচেষ্টার বহির্ভূত দৈবায়ত্ত যে দুঃখ তাই আধিদৈবিক।

আত্মা দেহ মনের আধিব্যাধিজাত অথবা অন্তঃকরণগত আসক্তিমূলক কামক্রোধাদিজাত যে দুঃখ তাই আধ্যাত্মিক।

দুঃখ নিবৃত্তি, সাময়িক ও শাশ্বতিক :—এই ত্রিবিধ দুঃখের অনন্ত কালের জন্য একান্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই সকল দার্শনিকের লক্ষ্য বা উপেয়।

ত্রিবিধ দুঃখে কাতর জীব জিজ্ঞাসু হয়—"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ',—তত্ত্বদুঃখ নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে। তার পর তর্ক উঠে যে, "দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ।" অর্থাৎ যদি বল যে, পার্থিব সুখলাভই দুঃখহানির কারণ এবং প্রতিকার, সুতরাং ঐ জিজ্ঞাসা 'অপার্থা' বা নিরর্থক, তা বলা চলে না, কারণ সুখভোগের দ্বারা কোন কোন দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হয়ত হয়, কিন্তু একান্ত নিবৃত্তি হয় না।

পণ্ডিতেরা তাই এই সাময়িক নিবৃত্তিকে 'কুঞ্জর শৌচ' বা হস্তি-স্নানের সঙ্গে

তুলনা করেন। হাতীকে স্নান করিয়ে নির্মল রাখা যায় না, সে পরমুহূর্তেই ধুলা কাদা লেপন করে শরীরটাকে মলিনপঙ্কিল করে তোলে।

সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন উভয়ই বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় দর্শনই মুক্তিবাদী এবং উভয় দর্শনেই স্রষ্টা ঈশ্বরের কোন স্বীকৃতি নেই। উভয়েরই মোক্ষের বর্ণনা নঞর্থক বা নেতিবাচক। তবে সাংখ্যে অবিনাশী আত্মার স্বীকৃতি আছে। 'ন সর্ব্বোচ্ছিত্তিঃ অপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ—সাং সূ ৫।৮, অর্থাৎ মোক্ষ হলে সর্ব্বোচ্ছেদ বা অস্তিত্ব নাশ হয় না, জীবত্বের বন্ধন হতে আত্মার মুক্তি হয়, তখন 'বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্' বা কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এই জ্ঞান কাহার হয়?

যদি অহংমুক্ত জীবের এই জ্ঞান হয় বলা যায় তো তা অর্থহীন হবে, কারণ সাংখ্যমতে অবিদ্যাবদ্ধ জীব, অবিদ্যা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জৈব অস্তিত্ব হারায়। সুতরাং গীতোক্ত 'বুদ্ধি গ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ বা আনন্দময় অবস্থাই, আমাদের অধিকতর বুদ্ধিগ্রাহ্য বা বোধগম্য মনে হয়।

বৌদ্ধ দর্শনের লক্ষ্য নির্ব্বাণ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় পুণ্য কর্ম্ম বিশেষের দ্বারা অক্ষয় স্বর্গলাভের কথা যা বলেন তা সুযুক্ত বা বিচারসহ নয়। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে পাওয়া যায় :—

'অপাম সোমমমৃতা অভূম' অর্থাৎ যাগ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম করে সোম পান করে, আমরা অমর হয়েছিলাম। কিন্তু এই অমরত্ব সাময়িক মাত্র—শাশ্বতিক নহে। শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন :—

'আভুত সংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।'

অর্থাৎ পুণ্যবানগণ স্বর্গলোকে সুদীর্ঘকাল দিব্য সুখ ভোগের পর পুণ্য ক্ষয় হলে—ভৌতিক প্রলয়ের সময় তাঁদের ইহলোকে পুনরাবর্ত্তন ঘটে। 'ক্ষীণে পুণ্যে স্বর্গলোকাৎ চ্যবন্তে।' সুতরাং দেখা গেল এই লৌকিক বা যজ্ঞাদি জন্য আনুশ্রবিক বা পারলৌকিক উভয়বিধ দুঃখ নিবৃত্তিই সাময়িক, ইহা দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তি বা আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়।

সাধারণ পুরুষার্থ সম্বন্ধে যে নিয়ম, দুর্ল্লভ পরম পুরুষার্থ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। প্রথমে আপ্তবাক্য এবং শ্রুতিবাক্য প্রভৃতি থেকে তত্ত্ব নিশ্চয় করা প্রয়োজন, তার পরে তার মনন বা দার্শনিক যুক্তি সহকারে তত্ত্ব বিষয়ে বিশ্বাস বা নিষ্ঠা স্থাপন, এইরূপে নিশ্চয় জ্ঞান দৃঢ় হলে—তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে একনিষ্ঠ সাধন বা নিদিধ্যাসন।

পুনঃ পুনঃ তত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা—“নাস্মি, নমে, নাহম্, ইত্যপরিশেষম্ অবিপর্য্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলম্ উৎপদ্যতে জ্ঞানম্” অর্থাৎ আমি নাই, আমিত্ব নাই, আমার বলতে কিছু নাই এই বিচারে অহং অস্মিতা মমতা প্রভৃতি দূর হলে—অবিদ্যাবিমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান—কেবল জ্ঞান বা কৈবল্যের উদয় হয়। ইহা ‘অপরিশেষ’,—কারণ জ্ঞাতব্য বা জ্ঞেয় বিষয়ের বহুত্ব বা নানাত্বের শেষ হওয়াতে—“যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনঃ কিঞ্চিজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে,” সুতরাং এই জ্ঞানই কেবল জ্ঞান বা চরম জ্ঞান। ইহার পরে আর জানবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

যুক্তিবাদের বিশেষত্ব :—বৌদ্ধদর্শন এবং সাংখ্যদর্শনে অন্ধ বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। উভয় দর্শনেরই অপ্রত্যক্ষ বিষয়সকল অনুমান-প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়। যাঁরা চক্ষুষ্মান, ধীসম্পন্ন—বিবেকবিচারপরায়ণ, মেধাবী, অহিংসা সত্যাদি বিশুদ্ধশীলশালী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি,—তাঁরাই এই উভয় মার্গের অধিকারী।

তর্কের উপযোগিতা :—কেহ কেহ বলেন তর্ক অপ্রতিষ্ঠ সুতরাং ‘বাদো নাবলম্ব্যঃ’ কারণ একজন যুক্তির বলে যা প্রতিষ্ঠা করেন, অন্য একজন অধিকতর যুক্তিবলে তা বিপর্য্যস্ত বা নিরস্ত করতে পারেন। শুধু যুক্তির দ্বারা দার্শনিক চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যাঁদের তত্ত্বজ্ঞান নাই, প্রমেয় বিষয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি কিছুই নাই অথচ কেবল তর্কবলে প্রমেয় বিষয়কে প্রমাণ করতে চান—তাঁদের তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু এ ছাড়াও আর এক প্রকার তর্ক আছে—যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। মিথ্যা বর্জ্জন এবং সত্য অর্জ্জনেই তার বিনিয়োগ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় Experiment (পরীক্ষা), Observation (নিরীক্ষা) ও Inference (অনুমিতি) এই শ্রেণীর তর্কের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গাণিতিক তর্ক, জ্যামিতি-পরিমিতির তর্ক জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy)-এর তর্কও এই শ্রেণীর। এই সকল তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত নহে সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সত্যের এক ধাপ থেকে অপর ধাপে উত্তরোত্তর উপর্য্যুপরি ধাপে আরোহণ করতে অন্ধের যষ্টির মতই অপরিহার্য। তাই বলা হয়—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।

যুক্তিহীন হয়ে, শুধু শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্যের অভিধা অর্থ ধরে তার তাৎপর্য নির্ণয় করলে বিপরীত ফল হতে পারে।

'কর্ণং ছিত্বা কটিং দহেৎ' এইরূপ অশ্ব চিকিৎসার ব্যবস্থা এইপ্রকারে মানুষের উপর প্রযুক্ত হওয়াও অসম্ভব নয়!

যুক্তির সীমা ঃ—কিন্তু তর্কের অতাত এবং অগোচর বস্তুও আছে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। যেখানে শুধু "বাগবৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্" -কোনো ধ্রুব সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়—বেদান্তের 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ', সাংখ্যের 'কৈবল্য' এবং বৌদ্ধের 'নির্ব্বাণ'। যা যুক্তি-বিচার ও বাকোবাক্যের বিষয়ীভূত নয়। এ সম্পর্কে দার্শনিকরা সকলেই স্বীকার করেছেন—

'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥

পরমতত্ত্বের কথা বাদ দিলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, Physical (বাহ্য), Physiological (ইন্দ্রিয়াদি দেহযন্ত্রনিষ্পন্ন) ও Psychological (মানসিক)—সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই তাঁকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর নীচের দিকে এবং উপরের দিকে, দুই দিকে দুই অনন্তের সম্মুখীন হতে হয়।

নীচের দিকে 'ছোট অনন্ত'—Man as an epitome of the world—মানুষের ভাণ্ডটিই (microcosm) যেন ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। উপরের দিকে বৃহৎ অনন্ত—The great world (macrocosm)—in relation to the microcosm or the miniature world or man,—ছোট অনন্ত—infinitesimal,—অণুপরমাণু জীবকোষ প্রভৃতি নিয়ে তার কারবার। তাই এইদিকে সে 'অণোরণীয়ান',—অর্থাৎ পরিমাণে সে "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ"—একটী কেশাগ্রকে শত ভাগ করে তার এক ভাগকে শত ভাগ করলে যে ভাগফল কল্পিত হয় উহার পরিমাণও সেইরূপ। অপর দিকে এক বৃহৎ অনন্ত বা infinity যার সীমা সংখ্যা পরিধি বা পরিমাণ কিছুই নাই,—যার একটি তারা থেকে তার আলোকরশ্মির, শত শত শতাব্দী লেগে যায় এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে (যদিও আলোকের গতিবেগ এক সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল) তাই আলোক বৎসরের (light year) দ্বারা আমরা তাঁর পরিমাণ করতে চেষ্টা করি।

তাই নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেলে তার যা অবস্থা হয় ছান্দোগ্য উপনিষদ তারই সঙ্গে ইহার তুলনা করেছেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা এই অনন্তকে ইয়ত্তা বা ঈদৃক্তার ছাঁচে ঢেলে পরিমাপ করবার প্রয়াসও হাস্যকর।

আমরা atom-electron শক্তির বড়াই করছি বটে, কিন্তু একটি অ্যাটমকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করবার আমাদের শক্তি নাই।

বৌদ্ধনির্বাণ ও ব্রহ্মনির্বাণঃ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বৌদ্ধ'নির্বাণ' ও বেদান্ত-দর্শনের 'ব্রহ্মনির্বাণ' সমার্থব্যঞ্জক। শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা এ-বিষয়ে কিছু অনুশীলন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভাবতেও কষ্ট হয় যে সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগত বুদ্ধদেবকে আমরা দশাবতারের মধ্যে স্থান দিয়েও, তাঁর প্রচারিত 'সনাতন'-ধর্মকে ভারত থেকে নির্বাসিত করেছিলাম। 'অহিংসা'র ধর্মকে আমরা হিংসার দ্বারা বহিষ্কার করেছিলাম। অথচ আচার্য শঙ্করকে আমরা 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ' বলে বরণ করে নিয়েছিলাম, যদিও শঙ্করের মায়াবাদ বা বিবর্তবাদ ভিত্তিক শারীরক-ভাষ্যের প্রতিপাদিত নির্বিশেষ ব্রহ্মনির্বাণের সঙ্গে বুদ্ধের শূন্যবাদ ভিত্তিক নির্বাণ মুক্তির কোনো যুক্তিসহ প্রভেদ প্রতিপাদন করা যায় না। গীতার সংজ্ঞায় যা 'ব্রাহ্মীস্থিতি' তারই অপর নাম বৌদ্ধদর্শনের সংজ্ঞায় 'ব্রহ্মবিহার'।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি। (গীতা, ২/৭২)

এই 'ব্রহ্মনির্বাণ',—কে লাভ করেন,—তা তার পূর্ব শ্লোকেই বলা হয়েছে

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ (গীতা, ২/ ১)

এই শান্তির পূর্ণতায় ভূমানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়—যাকে গীতা বলেছেন—"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্" (গীতা ৬/২১)। এবং "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" (গীতা ৬/২২) ঐ অবস্থায় "দুঃখ সংযোগ বিয়োগ" তো হয়ই উপরন্তু "সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে"। কিন্তু এই অসমোর্ধ্ব অত্যন্ত সুখকর ব্রহ্মানন্দের সাধনার উপায় বলতে গিয়ে গীতা বলেছেন:—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ (গীতা, ৬/২৫),

স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে—এই "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"—ইহা শূন্যধ্যান ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই 'শূন্য ও পূর্ণ' উভয়ই এক অনির্বচনীয় অবস্থার দার্শনিক সংজ্ঞা মাত্র—যার অর্থে কোনো ভেদ প্রতীতি হয় না, কেবল বলিবার বা বুঝাইবার ভঙ্গীর ভেদমাত্র প্রতীতি হয়। বুদ্ধ শূন্যকে বলেছেন "শূন্যং শূন্যং স্বলক্ষণম্ স্বলক্ষণম্" অর্থাৎ সমস্তই এক শূন্যে পর্যবসিত—সমস্তই স্বলক্ষণ অর্থাৎ আপন আপন বিশিষ্ট লক্ষণে পরিচিত হয়।

সমস্তই 'ক্ষণিকং ক্ষণিকং—দুঃখং দুঃখং' হলেও দুঃখাতীত অবস্থা একমাত্র শূন্য। বিচার করলে দেখা যায় যে শূন্য, নির্বাণ, মুক্তি ও কৈবল্য—একই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে বৌদ্ধের নির্বাণ এক 'শূন্য' বা অভাব পদার্থ,—বেদান্তের নির্বাণ বা ব্রহ্মনির্বাণ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ভাবপদার্থ। "আনন্দ রূপং অমৃতং যদ্বিভাতি"।

সুষুপ্তিতে 'ন কিঞ্চিদ্ অবেদিষম্'—অবস্থায় কেবল 'সুখমহমস্বাপ্স্যম্' রূপ প্রতীতি মাত্র থাকে,—এই সুষুপ্তিও শূন্যের প্রতীক, কৈবল্যের বা নির্বাণেরও প্রতীক। তখন জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—দর্শন-দৃশ্য-দ্রষ্টা এই ত্রিপুটীর লয় হয়। যা থাকে, সেই স্মৃতি বা প্রতীতি, অনির্বচনীয়। এ-অবস্থায় সদর্থক ও নঞর্থকের ভেদ লোপ পায়। তাই গীতায় বলা হয়েছে,—

> জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে
> অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ (গীতা, ১৩/১২)

তাহাকে সৎ (ভাব পদার্থ) বা অসৎ (অভাব পদার্থ) এই দুইয়ের কোনোটির দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তবে তখন সকল ভেদ বিভেদ সূচক সকল বিশেষণ-ই এক বিশেষ্যে একীকৃত হয়—"পয়সামর্ণব ইব" (মহিম্নস্তোত্রম্), গীতা বলেন,—"যদাভূতপৃথক্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি। তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥" (১৩।৩১) এই 'একস্থ' হওয়াকে শূন্যত্ব বা পূর্ণত্ব যাহাই বলা হোক তাহা—সেই একমাত্র 'কেবল' অবস্থা বা কৈবল্যকেই বুঝায়। সাংখ্যও এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করেছেন, বলেছেন—"বিশুদ্ধং 'কেবলম্' উৎপদ্যতে জ্ঞানম্"। এ-অবস্থায় নানাত্ব বা বহুত্ব থাকে না। বেদান্তের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয়। তখন,—"নাস্তি, ন মে, নাহম্ ইত্যপরিশেষম্ অবিপর্যয়াদুৎপদ্যতে বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানম্"—অর্থাৎ অহংতা-অস্মিতা-মমতা দূর হলে অবিদ্যাবিমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান—'কেবল জ্ঞান' বা কৈবল্যের উদয় হয়।

যজ্ঞ ও হিংসা : মীমাংসা দর্শনকার জৈমিনি বলেন,—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাম্" অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডই প্রধান আর সব অপ্রধান বা অনর্থক। উত্তর মীমাংসা ও উপনিষদ্সার গীতা বললেন—যাঁরা "যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে" তাঁরা "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" (৯/২১), পুনরায় জন্মমৃত্যুর গতাগতি চক্রপথে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হন। কিন্তু যজ্ঞবাদীরা এই যজ্ঞের সঙ্গে পশুবধে এমনভাবে মেতে উঠলেন যে সম্ভূতির পুত্র রাজা রন্তিদেবের যজ্ঞনিহত পশুদের চর্ম হতে যে রসরক্ত-ক্লেদ নির্গত হত,—তা থেকে একটা নদী উৎপন্ন হয়,-- যার নাম চর্মণ্বতী (চম্বল)। তাঁর গৃহে এত অতিথি সমাগম হত যে প্রত্যহ বহু সহস্র পশু বধ করতে হত। শাস্ত্রের মধ্যেও লৌকিক প্রভাব পড়ে, তাই বিধান হয়ে গেল—"যজ্ঞে বধঃ = অবধঃ" অর্থাৎ যজ্ঞে যে বধ করা হয় তা হিংসাত্মক বধ নয়,—সেই বলিপ্রদত্ত জীবের আত্মার সদ্গতি হয়।

বুদ্ধের আবির্ভাব কাল : এইভাবে স্বর্গকামনায় তথা পুণ্যকামনায় যখন তৎকালীন ব্রাহ্মণ পুরোহিত যাজ্ঞিকগণ পশুহিংসার নিষ্ঠুরতায় উন্মত্ত, তখন শাক্য রাজবংশে আবির্ভূত হলেন—শান্ত মুক্ত অনন্তপুণ্য করুণাঘন তথাগত বুদ্ধ, স্বীয় তপস্যায় ধরণীতলকে কলঙ্কমুক্ত করবার জন্য। তাঁর অমৃতবাণীর দ্বারা মানবহৃদয়ের মধুনিস্যন্দী প্রেমপদ্ম বিকশিত করবার জন্য,—গীতার প্রতিশ্রুতি পালন করতে—ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করতে তিনি অবতীর্ণ হলেন।

বর্ণের গণ্ডিতে বহুধা-বিভক্ত ভারতবর্ষ সেদিন মানবতাবোধে জাগ্রত হয়ে স্বীকার করেছে সকল মানুষকেই। তাই তাঁর বাণী ও ধর্ম অবাধে প্রচার এবং প্রসার লাভ করেছে—তিব্বত-চীন, সিংহল, মোঙ্গল, ব্রহ্মদেশ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এমনকি সুদূর জাপান পর্যন্ত।

বিশেষস্থানে স্থণ্ডিলাদি নির্মাণ করে মন্ত্র পড়ে আগুনে ঘি পুড়িয়ে পশু বধ করে নানা বিচিত্র বিধানে যখন মানুষ ঊর্ধ্বগতি সন্ধান করছিল—দিশেহারা হয়ে,—তখনই বুদ্ধ এলেন তাঁর—বিশ্বমৈত্রী, অহিংসা, নিঃস্বার্থ প্রেম ও তৃষ্ণা (বা 'তহ্না') ক্ষয় দ্বারা মুক্তির উপায় প্রদর্শন করতে।

বুদ্ধের উপদেশ : তিনি শীলসাধনা ও মৈত্রীভাবনা দ্বারা ব্রহ্মবিহারের পথ নির্দেশ করে খাঁচার পাখিকে মুক্তাকাশে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। 'মাতা যথা নিজং পুত্তং' মা যেমন নিজের পুত্রকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করেন তেমনি

অপরিমেয় মৈত্রী ও করুণা সমস্ত জগতের প্রতি, এমন কি শত্রুদের প্রতিও— আপন অন্তরে জন্মাইতে এবং তাহাই আমাদের নিত্যকার ব্যবহারে প্রয়োগ করতে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

ধ্যানপঞ্চক ঃ তিনি পাঁচ প্রকার ধ্যান উপদেশ করেছেন :

১। বিবেক বিচারের ধ্যান দ্বারা অপ্রমত্ত চিত্তে আপনাকে সকল আপাতমনোরম ক্ষণিক বিষয়সুখের 'তহ্‌হা' বা তৃষ্ণা থেকে মুক্ত করা এবং 'আত্মৌপম্যেন'—নিজের সঙ্গে তুলনা করে সকল জীবকে সাম্যদৃষ্টিতে দর্শন করা (গীতা ৬/৩২)। (ধম্মপদ অপ্‌পমাদ বগ্‌গো ৭)

২। করুণার ধ্যান—'আর্তিং প্রপদ্যেঽখিল দুঃখভাজাম্', অখিল জনের দুঃখের অংশ সহানুভূতির সাহত গ্রহণ করা ও তাদের দুঃখলাঘবের জন্য চেষ্টা করা। (শ্রীমদ্‌ভাগবত ৯/২১/১২)

৩। প্রেমের ধ্যান—সকলের প্রতি মৈত্রী ও প্রীতিবশতঃ,—স্মরণ তর্পণের মত,—'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু'—ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হোক্, এইরূপ ভাব জন্মানো।

৪। শান্তির ধ্যান,—সকল দ্বন্দ্ব—ভালোমন্দ সুখ দুঃখ, নিন্দাস্তুতি জয়-পরাজয় থেকে আপনাকে 'স্থিতঃ প্রকৃত্যা হিমবানিবাচলঃ'—অচল প্রতিষ্ঠ করে মনকে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত শান্ত স্থির রাখা। "আপূর্যমানমচল প্রতিষ্ঠং" (গীতা ২/৭০) অবস্থা।

৫। আনন্দ ধ্যান—সকলের সুখে সুখী হয়ে নিঃস্বার্থ নিরাসক্তভাবে পরার্থপরতার উচ্চতর আনন্দ অনুভব করা।

ধম্মপদে বুদ্ধ বলেছেন,—

নত্থি রাগ সমো অগ্‌গি নত্থি দোষ সমো গহো
নত্থি মোহসমং জালং নত্থি তহ্‌হা সমা নদী।

অর্থাৎ আসক্তির সমান অগ্নি নাই, দ্বেষের মত হিংস্র ও গ্রাসকারী জন্তু নাই,—মোহের মত জাল নাই, তৃষ্ণার সমান নদী নাই,—তৃষ্ণা হতেই শোক, ভয় আদির উদ্ভব, এবং সেজন্য আসক্তির উন্মূলনই দুঃখত্রাণের চাবিকাঠি (গীতা, ৩/৩৭)।

মানব মনীষার শ্রেষ্ঠ অবদান প্রজ্ঞা। শুধু তথ্য বা তত্ত্বজ্ঞান নয় সারাজীবনের সর্বাঙ্গীণ সংযম ইহার সাধনা এবং সদ্‌ধর্মের আচরণ,—যথা দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য ও ধ্যান ইহার লাভের উপায়। গীতা ৪/৩৩-৪২)।

এই মহামানবের সমগ্র জীবনে,—মহাভিনিষ্ক্রমণ থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত,—একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল—মানবের দুঃখত্রয় উপশমের জন্য নির্বাণলাভের উপায় নির্দেশ করা। তাঁর সংকল্প ছিল,—

'আমি যেন,—অনাথগণের নাথ,—যাত্রিগণের পথপ্রদর্শক, পারগামিগণের নৌকা তরণেচ্ছুগণের সেতু, দীপার্থিগণের দীপ, শয্যার্থিগণের শয্যা এবং দাসার্থিগণের দাস হই'।

('বরেণ্য চরিত'—পৃঃ ১৮ শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত)।

ধম্মপদে বুদ্ধ বলেছেন—পঞ্চস্কন্ধের মত পাপ নাই,—বিশ্বাসই পরম আত্মীয় এবং 'নিব্বাণং পরমং সুখম্' (ধম্মপদ, সুখবগ্গো ২০৩, ২০৪ সূত্র)।

'পঞ্চস্কন্ধ' পারিভাষিক শব্দ—তার অর্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্কন্ধের সংস্কার বন্ধন মুক্ত হয়ে, এবং ধর্ম প্রীতি রস পান করেই 'নির্বাণ' সুখ পাওয়া যায় ('ধম্ম প্পীতি রসং পিবং') এই সুখকে তিনি বলেছেন 'অমতোগধং—অমৃতাবগাধং বা গাঢ় অমৃত।

ধম্মপদ, বুদ্ধ বগ্গো ১৯০-১৯২ সূত্রে, বলা হয়েছে—যদি কেহ বুদ্ধ, ধর্ম, এবং সঙ্ঘের শরণ লয়,—এবং চারটি আর্যসত্য যথা,—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের অতিক্রম, ও দুঃখোপশমের অষ্টাঙ্গ মার্গ-কে সম্যক্ জ্ঞানের সহিত দেখে তবে ইহাই নিরাপদ আশ্রয়,—ইহাই উত্তম আশ্রয়,—ইহা অবলম্বন করিলে সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

('ধম্মপদ'—ভিক্ষু শীলভদ্র, চতুর্থ সংস্করণ, ১২১ পৃঃ)।

অট্‌ঠাঙ্গিকং মগ্গং বা অষ্টাঙ্গ মার্গ যথা,—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত বা ব্যবসায়,—সম্যক্ আজীব বা উত্তম জীবিকা,—সম্যক্ ব্যায়াম বা উত্তম চেষ্টা—সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি—অর্থাৎ ধ্যান এই আটটিকে অষ্টাঙ্গ মার্গ বলা হয়।

ব্রাহ্মণ বগ্গে—(ধম্মপদ ৪১১ সূত্র),—'অম তো গধং (=অমৃতাবগাধং গাঢ়ামৃতং অর্হৎপদমিত্যর্থঃ) যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন,—যিনি তৃষ্ণা জয় করেছেন ও সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা সংশয় ছেদন করে অমৃত পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি। তাঁহার কৃত ব্রাহ্মণের এই সংজ্ঞা আজও সর্ববাদিসম্মত সন্দেহ নাই। তিনি 'জাতি ব্রাহ্মণ' বা জন্মগত ব্রাহ্মণকে—বলেছেন ভো-বাদী—অর্থাৎ হে মহাশয় 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কথনশীল। (ধর্মপদ ৪১৯ সূত্রে)

তিনি অকিঞ্চন, অনাদান, ধ্যানসমাধিরত, অবিদ্যাতীত, শীলবান্, তৃষ্ণাহীন, ভয়শূন্য, পাপমুক্ত, শান্ত, প্রসন্ন, চতুরার্যসত্যে প্রতিষ্ঠিত গম্ভীরব্রত মারজিৎ মহর্ষিকে সুগতবুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ বলেছেন—'তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং'।

বুদ্ধের একটি শ্রেষ্ঠ উপদেশ জীবসেবা,—এবং আধ্যাত্মিক স্তরে ব্রহ্মবিহার যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেই প্রসঙ্গে স্মরণীয় গীতা-র ৬/২৯, ৩১, ও ৩২ শ্লোকগুলি,—'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি,—ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।' 'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ, সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে'। 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন,—সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।' তুলনা করলে দেখা যাবে বুদ্ধের 'ব্রহ্ম বিহার' গীতার উপরিউক্ত শ্লোকগুলি এবং ঈশোপনিষদের ৬ এবং ৭ শ্লোক, —একই সত্যের, একই তত্ত্বের জ্ঞাপক,—কেবল ভাষার পরিচ্ছদে বিভিন্নরূপে প্রকাশ মাত্র।

এই উপলব্ধি না থাকলে বুদ্ধের জীবসেবা,—বর্তমান যন্ত্রযুগের একটা প্রাণহীন চাকা ঘোরানো প্রথা মাত্রে পর্যবসিত হ'ত।

আত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতির উপদেশ বুদ্ধের বাণীর মধ্যে সুস্পষ্ট উল্লেখ বা প্রাধান্য পায়নি কিন্তু তাই বলে আত্মা বা ব্রহ্মের স্বীকৃতি নাই একথা সমীচীন বলে মনে হয় না। না হলে ধম্মপদে তাঁর 'ব্রাহ্মণ বগ্‌গ'-র নাম এবং তত্ত্বকথাগুলি ভিত্তিহীন হয়ে পড়ত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের পারিভাষিক সংজ্ঞার ভিন্নতা নিবন্ধন ভ্রান্তি বা ভেদ জ্ঞানের সৃষ্টি হয়।

আত্মা ও অনাত্মা :—বেদান্ত যে অর্থে 'আত্মা' শব্দ ব্যবহার করেন বৌদ্ধদর্শন সে অর্থে করেন না। মিলিন্দ-পঞ্‌হের নাগসেন-মিলিন্দার কথোপকথনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিলিন্দা প্রশ্ন করলেন, (নাগসেনকে)— "নাগসেন কে"? নাগসেন উত্তর দিলেন,—"শরীর, চিত্তাদির সমষ্টিই নাগসেন"। বৌদ্ধেরা পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত পুদ্গলাত্মক-দেহাভিমানী জীবকে আত্মা বলেন। বেদান্ত তাহাকে অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ সমন্বিত অবিদ্যোপহিত জীবাত্মা বলেন। রক্ত মাংসের দেহ (পুদগল)-রূপ পুত্তলিকায় আত্মবোধ বা আত্মাভিমান অবিদ্যার সৃষ্টি। বেদান্তের আত্মা শুদ্ধবুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ 'অণুব্রহ্ম'—বা ব্রহ্মের চিৎকণ বা স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ, গীতার "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (১৫/৭) তাই মুক্তাত্মা বলেন

"অহংদেবো ন চান্যোঽস্মি, ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্"।

বৌদ্ধেরা বলেন 'তৃষ্ণা' বা 'তন্হা' ক্ষয় হলে তবে 'নির্বাণ' হয়,—গীতাও তাই বলেন—নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ (৬/১৮) 'শান্তিং নির্বাণপরমাং' (৬/১৫) লাভ করেন (৫/২৪-২৫-২৬)—তাঁরা অন্তঃসুখ, অন্তরারাম, কাম ক্রোধ বিযুক্ত এবং সর্বভূতহিতে রত হ'য়ে এই ব্রাহ্মীস্থিতি ও ব্রহ্মবিহার যদি অন্তিমকালেও লাভ করেন তাহলে তাঁদের ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্তি হয় (গীতা ২/৭২)।

সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে গীতার ব্রহ্মনির্বাণ, সাংখ্যের কৈবল্য এবং বৌদ্ধের নির্বাণ একই জীবন্মুক্ত অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। বাচক বিভিন্ন হলেও বাচ্যার্থ এক এবং অভিন্ন।

বৌদ্ধেরা যাঁকে পঞ্চস্কন্ধের অতীত অনাত্মবোধ,—নির্বাণ বা অসঙ্খত ধাতুরূপ অনন্ত-অনুৎপন্ন অসীম অগাধ অনিমিত্ত অপ্রণিহিত অমৃতময় শূন্য, বলেন,—তাহাই বেদান্তের ও 'ব্রহ্মনির্বাণ, 'সর্বভূত হিতেরত' আনন্দময় প্রসন্নাত্মার অবস্থা।

মাণ্ডূক্য শ্রুতি তাকেই বলেছেন,—"অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ"। ইহার ইঙ্গিত আরও পাওয়া যায়—

অন্তঃ শূন্যো বহিঃ শূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে
অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণ কুম্ভ ইবাম্ভসি।

(বরাহ পুরাণ ৪/১৮)

উত্তর গীতা (মহাভারত)য় বলা হয়েছে,—

সর্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণম্।
ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ (১৩)

সত্ত্বরজস্তমোবর্জিত অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মই 'ত্রিশূন্যং'।

ঊর্ধ্বশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকম্
সর্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥ (ঐ ৩৩)
শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (ঐ ৩৪)

তাই আমি শূন্যবাদ সম্বন্ধে 'তথাগত বোধিসত্ত্ব' কবিতায় বলেছি,—

"শূন্যবাদ্ নহে শূন্য,—অগাধ অমৃত করি পান
প্রেম-মৈত্রী-করুণায় তথাগত মহামহীয়ান্,—
অনির্বচনীয় তত্ত্ব, জ্ঞেয় জ্ঞাতা জ্ঞান-একাকারে
মিলাইলে সে-অতলে কি রহিল কে বলিতে পারে ?"

তাঁর উপদেশের সারমর্ম আমি সংক্ষেপে বলেছি,—

"প্রেমমূর্তি তুমি তপোধন !
ক্ষমা ক্ষেম সাধনায় পরিপূর্ণ করিলে ভুবন।
মন্ত্রে তন্ত্রে যাগযজ্ঞে পশুরক্তে মুক্তি নাহি হয়
'আত্মদীপ' হও সবে সুখতৃষ্ণা 'তহ্না' কর ক্ষয়
এই মহামন্ত্র তব,—বাসনার নির্বাণে 'নিব্বান্'
উন্মুক্ত আকাশে মুক্তি মুক্তপক্ষ পক্ষীর সমান।"

শূন্য ধ্যানের কথা উল্লেখ করেছি। 'শূন্য' যোগীরও পরম ধ্যেয় পদার্থ। শূন্য প্রত্যক্ষ হলে 'ত্রিপুটী'র নাশ হয়—যুষ্মদ্-অস্মদ্ প্রত্যয় তিরোহিত হয়, অস্তি-নাস্তি বলিবার কেহ থাকে না,—এখানে অস্তি নাস্তির সমন্বয় "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে' (গীতা, ১৩।১২) ভাব ও অভাবেরও সমন্বয়। বুদ্ধদেব শূন্যের বর্ণনা করতে অক্ষম হয়ে বলেছেন,—"অনক্ষরস্য ধর্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা" ? শ্রুতিও তাই বলেছেন,—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। বৌদ্ধদর্শনে এই পদার্থটিকে—'অবাচ্য, অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অনিকেত ও অবিজ্ঞপ্তিক" বলা হয়েছে। (ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, 'ধম্মপদ', ভিক্ষুশীলভদ্রের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়)।

বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্য সুভূতিকে বলেছেন এই শূন্যতা গম্ভীর',—অক্ষয়, অপ্রমেয়', 'অগাধ'। বৌদ্ধাচার্য শান্তিদেব বলেছেন 'শূন্যতা'-দুঃখ-শমনী ততঃ কিং জায়তে ভয়ম্ ?"

বুদ্ধদেব বলেছেন—সুভূতিকে,—

"গম্ভীরমিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম্",
"শূন্যতায়া এতদধিবচনং যদপ্রমেয়মিতি"।
"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপি তে"।

এবং, শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য, পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।
ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্ ॥

অর্থাৎ—"আধ্যাত্মিক জগৎ শূন্য বলিয়া দেখ, বাহ্য জগৎ শূন্য বলিয়া দেখ,—যিনি শূন্যতা ভাবনা করিবেন তিনি নিজেকেও শূন্য বলিয়া ভাবিবেন। শূন্যবাদ—'শুদ্ধ' এবং 'কেবল',—কিন্তু ইহা 'শুষ্ক' নয় ইহা যোগী এবং দার্শনিকের শিরোরত্ন মানব চিন্তার আকাশবৎ সর্বব্যাপী বিশ্রাম স্থান। তবে শাণ্ডিল্য নারদ আদি ভক্ত্যাচার্যগণ এর চেয়েও উচ্চতর স্থান দেন ভক্তিলভ্য আনন্দের পঞ্চম পুরুষার্থকে, কিন্তু তার প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

নির্বাণের স্বরূপ :—এই নির্বাণ বা শূন্য, ফাঁকা বা vacuum পদার্থ নয়, তাও মিলিন্দা পঞ্হ ও ধম্মপদে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে 'একান্তসুখং' 'পরম সুখং' 'অমৃতাবগাধম্' বা একান্ত অগাধ গভীর আনন্দময় অবস্থা বলা হয়েছে।

সুতরাং মায়িক বা প্রাকৃত গুণের যে ঔপাধিক শূন্যতা তাই আবার অপরদিকে অপ্রাকৃত অলৌকিক অনির্বচনীয় পরম সুখ বা আনন্দের পরিপূর্ণতা, অর্থাৎ একই অবস্থা একদিকে শূন্য, অপরদিকে পূর্ণ শব্দের বাচ্য। কবি টেনিসনের ভাষায় :

Rain—Rain and Sun,—a rainbow on the lea
Truth is this to me and that to thee.

একই প্রাকৃতিক প্রপঞ্চকে কেউ দেখছেন রামধনু বা ইন্দ্রধনুরূপে আর কেউ বা বিজ্ঞানের চোখে জলীয় বাষ্পের পুঞ্জে শুভ্র আলোকের প্রতিসরণের ফলে—তাকে সপ্তবর্ণের বর্ণালীরূপে দেখছেন।

স্বয়ং বুদ্ধ সুভূতিকে বলেছেন যে যাহা শূন্য তাহাই অক্ষয়, অপরিমেয়—অগাধ, 'অসঙ্খেয়' অসীম। শ্রুতি বলেছেন "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" অস্থূলং, অনণু, অহ্রস্বং, অদীর্ঘং ইত্যাদি।

আকাশতত্ত্ব : এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয় বেদান্তের আকাশতত্ত্ব। আকাশকে আমরা শূন্যও বলি অনন্তও বলি। তাই আকাশ ব্রহ্মেরও পর্যায় বিশেষ। 'পরমং ব্যোমন্'—বলেছেন শ্রুতি। ভগবান বুদ্ধও বলেছেন—অপ্রমেয়মিতি বা, অসংখ্যেয়মিতি বা অক্ষয়মিতি বা, শূন্যমিতি বা····· অভাব ইতি বা বিরাগ ইতি বা নিরোধ ইতি বা নির্বাণমিতি বা। সুতরাং এই সমস্ত বচন একই বস্তু বা অবস্তুকে, একই ভাব বা অভাব পদার্থকে একই বাচ্য বা অবাচ্য তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চাইছে। এই শূন্যকে অমিতা বা অসীম, পনীতা বা সর্বোত্তম, লোকুত্তরা বা লোকোত্তর বা অলৌকিক প্রভৃতি বিশেষণেও বিশিষ্ট করা হয়েছে।

সাধনোপায় ঃ এই অবস্থা প্রাপ্তির সাধনোপায়ও বিজ্ঞানসম্মত। চিকিৎসা বিজ্ঞান যেরূপ চতুর্ব্যূহ,—ইহার সাধনাও সেইরূপ। যথা :—রোগের নিদান বা হেতুভূত উপাদান, রোগ বিজ্ঞান বা রোগের স্বরূপ, রোগের প্রতিকার বা চিকিৎসা এবং তার পরে আরোগ্য বা অনাময় অবস্থা লাভ।

অপরপক্ষে দুঃখের হেতু, দুঃখের স্বরূপ জ্ঞান, দুঃখনিবৃত্তির উপায় এবং সর্বশেষে কৈবল্য (সাংখ্যে) নির্বাণ বা শূন্যাবস্থা (বৌদ্ধ দর্শনে) অথবা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ (বেদান্ত দর্শনে) নামে ইহাই বর্ণিত হয়েছে বিবিধ দর্শনে।

শূন্যধ্যান ঃ অনির্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য এবং "অচিন্ত্যাক্ষরব্যাপকাব্যক্ত-তত্ত্ব"-রূপে। জ্ঞান সংকলনী তন্ত্রে এই শূন্য ধ্যানকেই প্রকৃত ধ্যান বলা হয়েছে :

"ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ"—অর্থাৎ সাকার সগুণ চিন্তা প্রকৃত ধ্যান নয়, "ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ"—মনের সংকল্প শূন্য অবস্থাই প্রকৃত ধ্যান।

প্রাণতোষিণী তন্ত্রেও তাই বলা হয়েছে :

শূন্যন্তু সচ্চিদানন্দং নিঃশব্দং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।

চিত্ত যখন বিষয়সংস্কারহীন ও সর্বপ্রকার বিশেষবিহীন হয়ে শূন্যাকার ধারণ করে,—তখন সেই নিঃশব্দ নির্বিশেষ জ্ঞানের অবস্থারই নাম সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

যোগবাশিষ্ঠ বলেছেন—

সংবিন্মাত্রস্য শুদ্ধস্য শূন্যস্য চ কিমন্তরম্।
যচ্চান্তরং তদ্বিবুধা বিদন্ত্যেতি ন বাগ্‌গতিম্॥

শুদ্ধ চৈতন্যে ও শূন্যে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বিষয় না থাকায় যাহাকে শূন্য বলা হয়) কোনো পার্থক্য যদি থাকে তো তা সাধকের অনুভূতিসাপেক্ষ, বাক্যের দ্বারা তা বর্ণনা করা যায় না।

শূন্য ও পূর্ণ ঃ বরাহ পুরাণ (৪/১৮) দৃষ্টান্ত দিয়ে সমন্বয় করেন যে এই শূন্য ও পূর্ণ একই :—"অন্তঃ শূন্যো * * ইবার্ণবে।" পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

সাধকের নির্বিকল্প অদ্বৈত তত্ত্বে অবস্থানের সময়, আকাশস্থ কুম্ভের মত তাঁর ভিতর বাহির দুই-ই শূন্য এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত কুম্ভের মত তাঁর ভিতর বাহির দুই-ই পূর্ণ। অর্থাৎ তিনি যুগপৎ শূন্য এবং পূর্ণ। 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'র সঙ্গে ইহা তুলনীয়।

ভাষায় হেঁয়ালি :—

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন, সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনা দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ, অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে যুক্ত হয়, তখন সে যা পায় তাহাকে যে নামই দাও-না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র। কিন্তু সেই-ই মুক্তি।"

"প্রত্যহ শীলসাধনা দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন, এবং মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন স্মরণ করো * * যে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে * * এই পদ্ধতিকে তো কোনো ক্রমেই শূন্যতা লাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিল লাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্ম লাভের পদ্ধতি।'

"এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার এই সমস্ত আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি * * এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।" (রবীন্দ্রনাথ)

'নির্বাণ'কে পাওয়া যায় না : বৌদ্ধদর্শন বলেন, কোনো লব্ধ বস্তুর মত নির্বাণকে পাওয়া যায় না। ছায়া কোনো বস্তু বিশেষ নহে,—অন্ধকার না থাকলে আলো অব্যক্ত, মুক্তিও অব্যক্ত, নির্বাণও অব্যক্ত।

নির্বাণং নির্বৃতির্বুক্তং নির্বাণঞ্চ ন লভ্যতে
অপ্রবৃত্তেষু ধর্মেষু যথা পশ্চাৎ তথা পুরা।

মুক্তি বা নির্বাণের স্বভাবই এই যে ইহা প্রাপ্তি নয়, নির্বৃতি বা আবরণ উন্মোচন এবং তার ফলে শান্তি। তার কোন বৃত্তি নাই,—নিমিত্ত নাই। যাহা অপ্রবৃত্ত স্বভাব তাকে পাওয়া বা তার সামীপ্য লাভ কিরূপে সম্ভব? স্বরূপতঃ তা নির্বৃতি মাত্র,—তার পূর্ব পশ্চাৎ আদি কোন সম্বন্ধ নাই,—তা স্ব-স্বরূপে অব্যক্ত।

নির্বাণ, সদর্থক ও নঞর্থক :

নিৰ্বাণের দুটি দিক আছে। একটী প্রজ্বলিত অগ্নি বা প্রদীপ নির্বাণের মত (নঞ্‌র্থক) তৃষ্ণা-মোহের বন্ধন 'ক্ষয়' ও 'দুঃখ' ত্রয়ের পরিসমাপ্তি এবং তখন কৃতকর্মের 'বীজ' ভর্জিত (ভাজা) বা ক্বথিত (সিদ্ধ) হওয়ায় তা আর ফলপ্রদ হয় না। পুনর্জন্মও হয় না।

ইহা জড়ভরতের মত নিষ্ক্রিয় জীবন মাত্র বুঝায় না। বুদ্ধ আনুমানিক ৩৫ বৎসর বয়সে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েও দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল নিরলস ভাবে কর্মময় নিষ্কাম নিরাসক্ত জীবন যাপন করে গেছেন।

'সদর্থক' দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নির্বাণকে পরিপূর্ণ কল্যাণ, মঙ্গল ও শান্তিপূর্ণ আনন্দময় অবস্থা বলা যায়।

মূল পালি সাহিত্যে তথাগত বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নির্বাণ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এইরূপ,—'ভবনিরোধো নির্ব্বাণং (জন্মান্তর নিবৃত্তি),—সব্ব গন্থপ্পমোচনং (সকল গ্রন্থি বা বন্ধন থেকে মুক্তি) তণ্‌হা বিপ্‌পহনেন নিব্বানং (তৃষ্ণা বা বাসনার বিনাশেই মুক্তি) রাগক্‌খয়ো দোষক্‌খয়ো মোহক্‌খয়ো নিব্বানং—এবং পঞ্চস্কন্ধের নিরোধই নির্বাণ ('ভারত কোষ'—৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬-৭)। এগুলি সব নঞর্থক বা অভাব বাচক।

সদর্থক বা ভাব বাচক,—'অমতোগধং' (ধম্মপদ ১০০ সূত্র) বা পরম সুখময় অগাধ অমৃতময় অবস্থাও বলা হয়েছে।

ওলডেনবার্গ, টমাস, ওয়ালড্‌স্ মিড্‌ট্‌, ম্যাক্‌স্ ম্যুলর প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিক গণও 'নির্বাণ'কে একান্ত নঞর্থক বা 'annihilation' বলেন নি,— উভয়াত্মক নির্বাণকেই স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে "মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম" বলেছেন এবং অধিকাংশ মনস্বী দার্শনিক যা সমর্থন করেছেন বুদ্ধের সেই 'নির্বাণ' যে উভয়লিঙ্গ বা উভয়াত্মক সেই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

নির্বাণের স্বরূপ—'স্বদেশ' শারদীয় সংখ্যা ১৩৬৪

বৌদ্ধ নির্বাণ ও বেদান্তের ব্রহ্মনির্বাণ—প্রবাসী পৌষ ১৩৬৫

উভয়লিঙ্গ নির্বাণ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—৩য় ৪র্থ সংখ্যা ১৩৮৩

গ্রন্থকারের উপরোক্ত তিনটি প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

বেদান্তের বৈষ্ণব ভাষ্য এবং শাক্ত-বৈষ্ণব ভাবধারার সমন্বয়

শ্রদ্ধেয় মূল সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও সারস্বত ভাই ভগিনীগণ,—

এই মহাসম্মিলনে আমাকে আমন্ত্রণ ক'রে কর্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। হুগলী জেলার এই স্থানটি স্বনামধন্য, বাংলার ঐতিহ্যের এই উর্বর ক্ষেত্রে বহু প্রতিভার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমি শুধু ভারত পথিক রামমোহনের কথাই উল্লেখ করব। এই মহাজীবনে, ২-শত বৎসর পূর্বে, শাক্ত বৈষ্ণব ভাবধারার সংঘর্ষ ঘটে। পিতৃকুল বৈষ্ণব, মাতৃকুল তন্ত্র-সাধক, শাক্ত। একদিকে শ্বেতচন্দন তুলসীপত্র ও শ্বেত পুষ্প, অন্য দিকে রক্তচন্দন জবা বিল্বদল। এই সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ায় রামমোহন উভয় দিকের সাকার সাকৃতি দেব-দেবীর অর্চনা প্রতিমা বিগ্রহাদি বর্জন ক'রে সগুণ কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠা করলেন।

এক শতাব্দী যেতে না যেতে রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির শ্রদ্ধালু সমন্বয় সাধনার ফলে বাংলায় পুনরায় ভক্তির বন্যা বহিল, তার মূল সূত্রটি সমন্বয়। শ্রীজীব গোস্বামীর সমন্বয় ভাষ্যটি যুক্তিবাদী শাক্ত বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ই যেন গ্রহণ করলেন। ভাষ্যটি এই—

"শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া, যঃ কৃষ্ণঃ
সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।"

অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই—অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি এবং দুগ্ধ ও তাহার ধবলতার মত এই সমন্বয় সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

"যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা।" দেবী ভাগবতে দেবী বলেছেন—

সদৈকত্বং নভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ
যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ।

এই অভেদ বা ভেদাভেদের কথা দর্শন প্রসঙ্গে বলা হবে পরে, ক্রমিক বিকাশ বিবর্তনের কথা এখন কিছু বলি।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচার করেন শিশির কুমারের অমৃতবাজার-গোষ্ঠী, পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ, প্রভু জগদ্বন্ধু, পণ্ডিত রসিকমোহন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি আচার্যগণ।

উনবিংশ শতাব্দীর রেনেশাঁস বা সংস্কৃতির নব জন্ম বা নব জাগরণের ফলে দেশে সাহিত্য বিজ্ঞানের দর্শনের প্রচার প্রসার ও অগ্রগতি বশতঃ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী উদারতর ও প্রশস্ততর হ'ল। আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর, প্রথা-প্রীতি ও প্রচলিত রীতি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হতে লাগলো। ফলে যেমন ব্রাহ্ম পরিবেশ থেকে নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) প্রমুখ রামকৃষ্ণ শিষ্যদল বেরিয়ে এসে—বিশ্বমানবের জন্য উদার সনাতন ধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন, তেমনি বিজয়কৃষ্ণও,—অরূপ থেকে রূপে এবং রূপ থেকে অপরূপ পরানুরাগের রূপক-প্রতীক রাধাকৃষ্ণের প্রেমধর্ম ও নাম লীলা রসসঙ্কীর্তনে ব্রতী হলেন। এই দলের উল্লেখযোগ্য উজ্জ্বল নাম যথা—অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা 'ডন'-সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল সুন্দরীমোহন দাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ—গীতগোবিন্দ ও পদাবলী সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভানুসিংহের পদাবলী লিখলেন এবং বৈষ্ণব Mysticism বা মরমিয়াবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রেমাভিসারমূলক গীতাঞ্জলি ও তদ্ভাব ভাবিত গীতি কবিতাগুলি রচনা ক'রে, 'রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতন' লাভ করলেন এবং অপরূপকে দেখে গেলেন দু'টি নয়ন মেলে। তিনি মধ্যপন্থী রহিয়া গেলেন।

শুরু হল বিশ্ব-বৈষ্ণবতার প্রচার—যার ফলে কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের শিষ্য শাখাভুক্ত শ্রীমদ্‌ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত-স্বামী মহারাজ ঘরে বাইরে ভারতে এবং আমেরিকায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। স্থাপিত হ'ল—New York, Massachusetts (Boston) Washington Canada, England, France, West Germany, Australia, Japan, Rhode Island, Hawaii Island প্রভৃতি স্থানে Iskcon Center বা International Society for Krishna Consciousness. বিভিন্ন ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রেমধর্ম প্রচার এবং

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে খোলকরতাল সহ শ্রীশ্রীতারকব্রহ্মনাম সঙ্কীর্তন প্রবর্তিত হ'ল। এ যেন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুরই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সাফল্য প্রতিপাদক। 'দেশে বা বিদেশে যত নগর পত্তন সর্বত্র হইবে হরিনাম সংকীর্তন'।

রবীন্দ্রনাথও হরিনাম গানে সোচ্চার এবং উদাত্ত কণ্ঠ
"বাঁচান বাঁচি মারেন মরি বলো ভাই ধন্য হরি।"

তিনি ভবের নাটে—রাজ্য পাটে,—শ্মশান ঘাটে ধন্য। যখন সুধা দিয়ে মাতান এবং ব্যথা দিয়ে কাঁদান তখনো তিনি ধন্য। "ধন্য হরি স্থলে জলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে, ধন্য হৃদয় পদ্মদলে চরণ আলোয় ধন্য করি।"

তাঁর বর্ণনায় তিনি বলেছেন—

"তুমি সুন্দর যৌবন ঘন রসময় তব মূর্তি,
নৃত্য-গীত কাব্য-ছন্দ, কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ,
অপচয়হীন চিরনবীন তব মহিমা স্ফূর্তি।

নানাছলে কবি তাঁরই নাম গান করছেন,—

"তোমারি নাম বলব নানা ছলে
বলব বিনা আশায়, বলব বিনা ভাষায়, বলব চোখের জলে
শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে।"

ইহা ভাগবতের "অজাত পক্ষা ইব মাতরং খগাঃ" অপত্য-মাতৃক প্রগাঢ় আকর্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবি তাঁর গীতি কবিতায় বলেন,—

—সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি,
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল, হতভাগিনী
—ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরান-সখা বন্ধু হে আমার!
—শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে, গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে,—**
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপনসম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে"—

তখন কবির এই প্রিয়তমের 'সুন্দর যৌবন ঘন রসময় মূর্তি'—এবং

'নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ কলগুঞ্জনবর্ণগন্ধ'—চির নবীন লাবণ্য স্ফূর্তি'র বর্ণনায় কোনো পাঠকের সন্দেহ থাকে না যে, তিনি যদি 'ব্রহ্ম' হন তাহলে তিনি সেই ভাগবতের পীতাম্বরধর স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথ" নবঘনশ্যাম ব্রহ্ম, যাঁর বাঁশী শুনে সচকিত হয়ে কবি প্রশ্ন করেন, "সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে,—বনমাঝে কি মন মাঝে",—বিমূঢ় মন বুঝতে পারে না—নেই নয়ন ভুলানোর উদয়নের পথে,— "কোথায় সোনার নূপুর বাজে—বুঝি আমার হৃদয় মাঝে, সকল সুরে সকল কাজে পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে।"

এই ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনে আনুষ্ঠানিক সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতার প্রাকার প্রাচীর ভেঙে পড়লো, মহাপ্রভুর উদার বৈষ্ণবতার সংজ্ঞাই জনগণের 'মনের মতো' হতে থাকলো।

"যাহারে দেখিলে মুখে স্ফুরে কৃষ্ণ নাম, তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।" অর্থাৎ যাঁরা পাটোয়ারী বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে জটিল বিষয় চিন্তা বর্জন ক'রে ভগবৎ প্রসঙ্গে নিমগ্ন থাকেন তাঁরাই প্রকৃত বৈষ্ণব :

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম,
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

অবশ্য শ্রী, নিম্বার্ক, বল্লভ, মধ্বাচার্য, এবং দ্রাবিড়ের আড়বার সম্প্রদায় আপন আপন পন্থায় ও পদ্ধতিতে ব্রতী রইলেন বটে কিন্তু বিশ্ব-বৈষ্ণবতার প্রসার সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করলো। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের জনপ্রিয়তা হেতু সমগ্র ভারতে তামিল তেলেগু কন্নড় হিন্দী বাংলা ওড়িয়া অসমীয়া ও মারাঠি সাহিত্য বৈষ্ণব ভাবধারায় বৈষ্ণব লেখকের দ্বারা পুষ্টি লাভ করতে থাকলো। ফলে স্ত্রী-জাতি ও তথাকথিত নীচবর্ণের জাতিরাও উত্তরোত্তর উন্নততর সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে লাগলো। স্থাপত্যে ভাস্কর্যে এবং চিত্র-শিল্পেও বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব অসামান্য।

আমি মহীশূর রাজ প্রাসাদের সিংহদ্বারের প্যানেলে উৎকীর্ণ দেখে এসেছি একটি বটপত্রে শয়ান বাল-গোপাল মূর্তি, যাতে শিল্পী এই শ্লোকটিকেই রূপায়িত করেছেন—"করারবিন্দেন পদারবিন্দং মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তং, বটস্য পত্রস্য পুটে শয়ানং" ইত্যাদি।

তান্ত্রিক সাধনাতেও এই ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট। প্রাক্তন পঞ্চ-মকারাদির সাধনা ক্রমশঃ হিংসা ও আড়ম্বর বর্জিত এবং বিচার-বিশুদ্ধ হতে থাকলো এবং শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধ ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের সময়

হতেই ক্রমশঃ কম হতে থাকলো। রামপ্রসাদ কমলাকান্ত উভয়েই সমন্বয়বাদী। রামপ্রসাদ গাইলেন :—

নটবর বেশে বৃন্দাবনে কালী হ'লি মা রাসবিহারী
পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে একথা বিষম ভারী,
নিজ তনু আধা গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী
ছিল বিবসনা কটি এবে পীতধটি এলোচুল চূড়া বংশীধারী।

কমলাকান্ত গাইলেন :—

জানোনারে মন পরম কারণ শ্যামাতো শুধু মেয়ে নয়,—
কালো মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখনো কখনো পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া কভু বাঁধে চূড়া ময়ুর পুচ্ছে শোভিত হয় ***
কখনো পার্বতী কখনো শ্রীমতী কখনো রামের জানকী হয়॥

উদার ভাবে একমেবাদ্বৈত তত্ত্ব প্রচার ক'রে ভক্ত গাইলেন,—

অভেদে ভাবো রে মন কালা আর কালী
শৈব গাণপত্য শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ণুভক্ত
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ বৃথা দলাদলি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম, দুর্গা কালী রাধাশ্যাম
সবে এক একে সব (তাই) একমেবাদ্বৈত বলি॥

শ্রীভাগবত বলেছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

একই তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান বলা হয় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

শ্রীভাগবত তাই বলেছেন "কৃষ্ণমেনম্ অবেহি ত্বমাত্মানম্ অখিলাত্মনাম্" চরিতামৃতও তাই বলেছেন "অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন"।

প্রসিদ্ধ সাধক কৈলাসপতি, তান্ত্রিক মোক্ষদানন্দ, প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক বামাক্ষ্যাপা প্রভৃতি কারণ বা মদ্য ব্যবহার করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভৈরবী মাতার প্রদর্শিত পন্থায় বিল্বমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধনা করলেও মদ্য বা 'কারণ' ব্যবহার করেননি। তাঁর আকুমার ব্রহ্মচর্যের কথাও সকলেই জানেন।

মাতৃসাধক সাধু তারাচরণ পরমহংসও শ্রীরামকৃষ্ণের মতই আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, এমন কি তিনি বিবাহের পর আর পত্নীর মুখ দর্শনও করেননি। তা ছাড়া, তিনি কোনো গুরুর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন নি, শুধু শিশু সন্তানের মতো আকুল ভাবে মা মা বলে নিরন্তর ডেকেই মাতৃচরণ লাভ করেছিলেন এবং পরমহংস-পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তন্ত্র সাধনার প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, বিচারপতি উডরফ্ এবং স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর 'জপসূত্রম্' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের চিন্তাধারার ক্রম-বিকাশ সাধন করবে।

শক্তি এবং ভক্তি—উভয়ই শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার সূত্র। "শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং। নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ॥"

শক্তি যখন patent বা প্রকট তখনই শক্তিমান্ পরমেশ্বরকে আমরা ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান রূপে পাই এবং তাঁকে শিবশক্তি, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি রূপে আমরা বরণ করি। শক্তি যখন latent অর্থাৎ গুপ্ত অব্যক্ত সুপ্ত বা অপ্রকট,—তখন তিনি নির্বিশেষ নির্বিকল্প ব্রহ্ম, তিনি তখন 'অবাঙ্মনসগোচরং' 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'। তাঁর প্রসঙ্গে পূজা উপাসনা ধ্যান ধারণার কোনো সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তিনি তখন সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত এবং অগম্য।

ভক্তি—কথাটির ব্যুৎপত্তি ভজ্ ধাতু থেকে। একদিকে ভজ্ ধাতুর অর্থে ভাগ বিভাগ বা বিভক্তি করা অপর দিকে ভজ্ ধাতু থেকেই হয় ভজনা করা। সহজেই বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম থেকে জীবের, বিভক্ত-প্রতীতি অর্থাৎ পৃথক সত্তা উপলব্ধি না হলে ভক্তির প্রয়োগ-স্থান কল্পনা করা যায় না। কারণ 'যদা সর্বং ব্রহ্মৈবাভূৎ তদা কেন বা কং পশ্যেৎ' যখন সর্ব ব্রহ্ম রূপ অবিভক্ত একাত্ম প্রতীতি হয় তখন,—দৃগ্ দৃশ্য দর্শন এই ত্রিপুটীর লয় হয়। তাই ভক্ত বলেন, 'চিনি হওয়া ভালো নয় মন চিনি খেতে ভালোবাসি'! তাই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এই ভক্তির ব্যবধান টুকুই ব্রহ্মানন্দ থেকেও সান্দ্রানন্দকে মধুরতর করে। তাই ভক্ত মুক্তি চান না— ঋষিরা বলেন, "যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ"—এই ব্যবধানটুকুর মোচনরূপ মুক্তি—শ্রীভগবান দিতে চাইলেও ভক্ত নিতে চান না—'দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ'।

ঈশ্বর-ঈশ্বরী অর্দ্ধনারীশ্বর শিবলিঙ্গ-গৌরীপট্ট :—অন্যান্য ধর্মে ঈশ্বরকে শুধু পিতা ভগবান, Lord God বা God the Father রূপে দেখা হয়েছে।

ভারতের ঋষিরা তাঁর এই পিতৃরূপেই পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। উপনিষদে তাই তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে—'স একাকী ন রেমে' 'জায়া মে স্যাৎ',—একা একা খেলা হয় না—আনন্দ হয় না,—তাই মানুষের মতই বেদান্ত দর্শনের সূত্র করলেন, 'লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্',—অর্থাৎ লৌকিক লীলা স্বীকার করেই তিনি পতি-পত্নী ঈশ্বর ঈশ্বরীরূপে প্রকাশিত হলেন, মানুষ তাঁকে অর্ধনারীশ্বররূপে সহজেই বরণ করে নিলে।

পিতার প্রকৃতি 'বজ্রাদপি কঠোর' কিন্তু **মাতার প্রকৃতি**,—কুসুমাদপি মৃদু বা কোমল। তাই পিতার কাছে অপরাধী হলে আমরা মায়ের মাধ্যমে মায়ের আশ্রয়ে এবং প্রশ্রয়ে পিতার কাছে অপরাধ-ভঞ্জনের উপায় খুঁজে পাই।

ঈশ্বরকে পিতারূপে সকলেই ভয় করেন, শ্রুতি বলেন ভীষাস্ম বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ ভীষা অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ মৃত্যু ধাবতি পঞ্চমঃ।

ঈশ্বরকে	শক্তির প্রতীক	(সর্ব-শক্তিমান)	প্রতাপঘন
"	জ্ঞানের "	(জ্ঞানস্বরূপ)	প্রজ্ঞানঘন
"	প্রেমের "	(পরম-করুণাময়)	আনন্দঘন

এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে আমরা চিন্তা করি,—শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়বিধ সাধনাতেই।

পিতারূপে রুদ্ররূপে ভয় করি,—যেন তিনি সুপ্রিমকোর্টের জজ,—দণ্ডমুণ্ডের মালিক—বলি "রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"। **কিন্তু মাতা রূপে** আমাদের সাহসের অন্ত নাই, দাবীরও অন্ত নাই। তাঁকে ভক্তি করি, ভালবাসি, প্রাণ খুলে নির্ভয়ে বলি—

অপরাধো ভবত্যেব তনয়স্য পদে পদে,—
কোঽপরঃ সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিনা ?

অর্থাৎ "অপরাধ সে তো হয়ে থাকে মাগো, সন্তান, সে তো স্বভাবে করে, তা' বলে ছেলের যত দোষই হোক, কোন মা ছেলেরে ক্ষমা না করে ?" বলতে পারি,—

অসীমং মম পাপঞ্চ অসীমা করুণা তব।
সভয়ং ত্বাং প্রপদ্যামি কং কো বা পরিলজ্জয়েৎ !

আমার পাপেরও যেমন সীমা নাই, তোমার করুণারও তেমনি সীমা নাই, —তাই জীবনের চরম মুহূর্তে ভয়ে বিস্ময়ে আশা আশঙ্কায় চেয়ে দেখি, জননি! আমার পাপই বড় হয়, না তোমার করুণাই বড় হয়। সংশয়ের অবকাশ মাত্র নাই—শ্রীভাগবত বলেন :—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

জলন্ত অগ্নি যেমন সহজে জ্বালানি কাঠ ভস্ম করে তেমনি,—হে উদ্ধব! আমার প্রতি ভক্তি সমস্ত পাপ এবং দুষ্কৃতি ভস্মসাৎ করে। আমরা মায়ের কাছে শিশুর মতো অতি সহজ সরলভাবে প্রার্থনা করি :—

"কোলের ছেলে ধূলা ঝেড়ে তুলে নে কোলে,
ফেলিস্‌নে মা ধূলো কাদা মেখেছি ব'লে।

যখন দুর্বলতা অনুভব করি তখন 'বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি',—ব'লে তাঁকে বোধন করি, বরণ করি।

সাধনার বীজ :—বীজ বা Symbol শাক্তের বীজ মন্ত্র ক্রীং এবং বৈষ্ণবের বীজমন্ত্র ক্লীং ইহাও 'রলয়োরভেদঃ' হিসাবে মূলতঃ একই। ক= শক্তিমান ঈশ্বর, ঈ=শক্তি স্বরূপিণী ঈশ্বরী। র বা ল উভয়ের মধ্যে পরমাকর্ষণী শক্তি; যাকে যোগ শাস্ত্রে বলা হয়েছে,—"কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি র্দেহিনাং দেহ ধারিণী তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতম্"। ইহাই তান্ত্রিক ম-কারের আধ্যাত্মিক ভাষ্য।

এই সব বীজমন্ত্র ও অর্ধনারীশ্বরের প্রতীক বিভিন্ন প্রকার। পাশ্চাত্য গণিত বিজ্ঞানের ভাষায় x এবং y অথবা জৈব বিজ্ঞানের ভাষায় ঊর্ধ্বমুখী তীর ↑ ও অধোমুখী ↓ তীর অথবা আমাদের প্রাচীন শিবলিঙ্গ—গৌরীপট্টরূপে সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সবই ভাব থেকে রূপে এবং রূপ থেকে ভাবে যাতায়াতের আধ্যাত্মিক পথ বা মার্গ।

এই 'কৃষ্ণ-রাম শিবাত্মক',—পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি গোকুলে, অযোধ্যায় বা কৈলাসেই শেষ হয়ে যায়নি, এইসব পার্থিব প্রতীক থেকে আমরা অসীমের yard stick বা মাপ-কাঠি খুজে পেয়েছি, তা না হলে আমরা সমুদ্রের অগাধ নীলিমায় বা আকাশের অনন্ত অসীমতায় তলিয়ে গিয়ে হাবুডুবু খাই—হাঁপিয়ে উঠি,—চোখ বুজলেই অন্ধকার দেখি। কিছুই ধরতে ছুঁতে পাইনে। এই পদ্ধতি আস্তিক দার্শনিকগণ 'প্রত্যক্ষাবগমং' এবং 'সুসুখং

কর্তুমব্যয়ং' বলেই সমর্থন করেন। কারণ তিনি ছাড়া যখন 'অস্তি'-'ভাতি'-'প্রিয়'-'নাম' বা 'রূপ' পৃথক কিছুই নাই তখন 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা',—ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরাই তো ক'রে দিয়েছেন।

যাঁরা উত্তম অধিকারী তাঁরা কেহ কেহ বিনা রূপে বিনা প্রতীকেও সেই অপরূপকে ধরতে পারেন, তাঁরা প্রজ্ঞাবান শক্তিশালী তাঁরা অরূপ অব্যক্তের সাধক। গীতা বলেছেন,—

ক্লেশোঽধিকরস্তেষাং অব্যক্তাসক্ত চেতসাং, অব্যক্তা হি গতি দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে। অরূপ, অব্যক্তের ধ্যান ক্লেশকর এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাই x y ধরলে যেমন আমরা বীজগণিতের অঙ্ক সহজে ক'রতে পারি তেমনি আমরা রূপকে ধরে রূপাতীতকে সহজে ধরতে পারি।

বিজ্ঞান ও প্রতিমা পূজা—শ্রীভাগবত বলেছেন, "যো মাং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং হিত্বাঽর্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ"। অর্থাৎ সর্বভূতে অবস্থিত আমি বিশ্বাত্মা, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর, আমার এই সর্বব্যাপী স্বরূপ ভুলে গিয়ে যে শুধু প্রতিমা পূজা করে, তার পূজা ভস্মে ঘি ঢেলে হোম করার চেষ্টার মতই ব্যর্থ হয়। স্বামীজির ভাষায় 'বহু রূপে সম্মুখে তোমার' যে ঈশ্বর, তাঁকে ভুলে শুধু প্রতিমা পূজা করলে তা প্রকৃতই পৌত্তলিকতা হবে।

প্রতিমা পূজার প্রয়োজনীয়তা-কেবল সাধকানাং হিতার্থায়, "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ, সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।" প্রত্যেকটি রূপই রূপক (Symbolical) এবং তার পিছনে আছেন অনির্বচনীয় অপরূপ, যিনি সীমার মাঝে অসীম, তাই সাধক রূপ সাগরে ডুব দেন, অরূপরতন লাভের আশা ক'রে।

স্বভাবতঃ আমরা চোখ বুজলেই দেখি অন্ধকার, আমাদের মানসিক শক্তি সীমিত এবং সঙ্কীর্ণ। তাই ভক্ত সব সময়েই মনে রাখেন,—'ন তস্য প্রতিমা লোকে যস্য নাম মহদ্ যশঃ'—"প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা, মন্দির তব কি গড়িব মা গো মন্দির যার অনন্ত নীলিমা।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

যুগল উপাসনা ও অদ্বৈতবাদ ঃ—একটা দর্শন শাস্ত্রের কথা হয়তো কাহারও কাহারও মনে সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। বেদে যাঁকে বারংবার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা হয়েছে তাঁকে যুগপৎ ঈশ্বর-ঈশ্বরী, অর্ধনারীশ্বররূপে কল্পনা করলে কি অদ্বৈতবাদের বিরোধাচরণ করা হবে?

উত্তরে বলা যায়,—না, তাতে অদ্বৈতবাদে কোনো দোষ স্পর্শ করবে না। পুরুষ এবং প্রকৃতি দুইয়ে মিলে এক। "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চাপি বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি, বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।" গীতা (১৩।২০) শ্রুতিও বলেন 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্'।

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রকৃতিই শক্তি, পুরুষ শক্তিমান। অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি, দুধ ও তার ধবলতা, তুষার এবং তার শৈত্য যেমন অপৃথক্, —তেমনি শক্তি ও শক্তিমান দুইয়ে সম্মিলিত ভাবে এবং অবিচ্ছেদ্য ভাবে এক।

গণিতের ভাষায় যেমন ১ × ১ = ১ এটা ১ + ১ = ২ নয় এটা গুণের কথা, শক্তির কথা। দ্রব্য ও গুণ matter ও energy গুণী ও গুণ যেমন ওতপ্রোত ভাবে-একত্র থাকে অধ্যাত্মজগতে ঐশী ধ্যান ধারণাতেও এইরূপ উপলব্ধি করা যায়। তবে এই 'এক' কি প্রকারে 'দুই' রূপে অসীম অসংখ্যরূপে প্রতিভাত হয়ে লীলা করেন তাহা অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হবে।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব—বিষ্ণু যাঁহার দেবতা তিনিই বৈষ্ণব। এই বিষ্ণু শব্দটি ব্রহ্মেরই বাচক শব্দ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আছে "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে স ত্রেধা নিদধে পদম্"। ইহার ব্যুৎপত্তি নানাবিধ। বিশ্ ধাতু প্রবেশার্থে,—তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ—তিনি বিশ্বসৃষ্টি ক'রে বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হলেন, ওতপ্রোতরূপে পরিব্যাপ্ত হ'লেন,—তাই তিনি বিষ্ণু। আকাশ তাঁর পরমপদ, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। এবং "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদোঽস্যামৃতং দিবি" তাঁর এক চতুর্থ ভাগমাত্র সৃষ্টিতে ব্যক্ত বা প্রকাশিত, অপর বৃহত্তর অংশ অব্যক্ত—ন যত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।"

অপর অর্থে বিষ্ ধাতু সেচনার্থক অর্থাৎ বেবতি—সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্বম্। এখানে এই অর্থেই কাব্যের সঙ্গে দর্শনের মিলন। আলঙ্কারিক বলেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' এবং সে 'রস'—"ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ." ঐ অর্থে বিষ্ণুই রসস্বরূপ, তিনি বিশ্বকে রসে রসান্বিত অভিষিঞ্চিত করেন—

রসঃ সারোঽমৃতং ব্রহ্ম আনন্দোহ্লাদ উচ্যতে
নিঃসারং তেন সারেণ সারবল্ লক্ষ্যতে জগৎ।

জগৎটা যেন নিঃসার আখের ছিবড়ের মতো,—আর বিষ্ণু বা মধু-ব্রহ্মই সেই নিঃসার জগতের মধ্যে রস সঞ্চার ক'রে আখের মতই রসিয়ে তুলছেন।

অপর অর্থে বেবেষ্টি বা ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ অর্থাৎ যিনি বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম বা বাসুদেব হয়ে আছেন—তাই তিনি "বিশ্বমূর্ধা বিশ্বভুজঃ বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ"

—অপর অর্থে বিষ্ণাতি (ক্র্যাদি-গণীয় ধাতু) (যার অর্থে 'বিযুনক্তি' পৃথক্ করণ। বিযুনক্তি ভক্তান্ মায়াপসারণেন সংসারাদিতি বা, অর্থাৎ ভক্ত চিত্তের মায়া অপসারণ ক'রে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন, তাই,—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

তারক ব্রহ্ম নাম—এই মহামন্ত্রে তিনি 'হরে কৃষ্ণ রাম' নামে সম্বোধিত। তিনি 'হরি' যেহেতু তিনি সকল পাপ, সকল মলিনতা হরণ ক'রে ভক্তের মন হরণ করেন। তিনি 'কৃষ্ণ' যেহেতু তিনি ভক্ত চিত্ত আকর্ষণ করেন বাঁশীর গানে,- যে ডাক শুনে ভক্ত সাড়া দেন—'যাইগো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে,'—বলেন 'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে'? তিনি 'রাম' যেহেতু তিনি আত্মারাম, আত্মায় রমণ করেন,—তাই 'মনোভিরামং বচোভিরামং সদাভিরামং সততাভিরামং' রূপে তিনি বর্ণিত।

'হরে' শব্দের আর একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। হরি শব্দের সম্বোধনে যে 'হরে' তার অর্থ বলা হয়েছে। কিন্তু 'হরের্মনোহরা রাধা' এই অর্থে 'হরা' অর্থে শ্রীরাধা এবং 'হরে' অর্থে 'রাধে'। কাজেই 'হরে কৃষ্ণ' অর্থে 'রাধে কৃষ্ণ' এবং রাম তাঁদের মিলিত যুগল মূর্তি। তাই ভাগবত বলেন, "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ। যাঁরা ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা আত্মারাম মুনি তাঁরাও এই মিলিত যুগলের অনির্বচনীয় গুণে আকৃষ্ট হন,—অহৈতুকী ভক্তির আকর্ষণে।

নাম ও নামী—

দেহ-দেহী নাম-নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ
জীবের ধর্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ।

কারণ,— নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধোনিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

—পদ্ম পুরাণ

শ্রীভাগবত বলেন—

শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ। ভা ৬।১৬।৫১

অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয়ই আমার নিত্য শরীর। প্রণব বীজ মন্ত্র, হরে কৃষ্ণ রামাদি নাম প্রভৃতি শব্দ-সঙ্কেত ব্রহ্মবাচক নাম—শব্দব্রহ্ম এবং তাহা পরব্রহ্মেরই স্বরূপ।

বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত ভাষ্য বা শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ **এবং শঙ্কর দর্শন :**

এ বিষয়ে দু'চারিটি কথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। আচার্য শঙ্কর তাঁর বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ স্থাপন করতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে বলেছেন,—'শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ, ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, জগৎটা মিথ্যা স্বপ্ন, বস্তুতঃ নাই,—আছে মনে হচ্ছে মাত্র—যেমন দড়ি দেখে সাপ ভ্রম হয় অথবা শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, মরু-মরীচিকায় জল ভ্রম হয়। এই জগৎমিথ্যাবাদ শ্রীরামানুজ খণ্ডন করেছেন, মহাপ্রভু একে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলেছেন এবং এর পরিবর্তে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ স্থাপন করেছেন।

এই স্বপ্নবাদ বা বিবর্তবাদ—ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ কেহই গ্রহণ করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ শাস, বীচি, আঠা খোলাসহ সমগ্র বেলটিকেই জগৎ-এর প্রতিভূ স্বীকার ক'রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বয়ং জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ দুইই—তিনিই মৃত্তিকা তিনিই কুম্ভকার। "হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো ন হি ভিন্নতনুঃ।"

রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে, (১৩০২ অগ্রহায়ণ, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪০ দ্রষ্টব্য) দ্বৈতাদ্বৈত মতকে বৈষ্ণব ধর্মমত বলিয়া প্রকাশ করেন (রবীন্দ্র জীবনী, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৮)।

এ বিষয়ে আমার 'বৈষ্ণব ভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৬৩) আমি বিস্তারিত ভাবে লিখেছি। এখানে কবির আত্মপরিচয় থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—

"আমার রচনার মধ্যে যদি কোনও ধর্মতত্ত্ব থাকে ত সে হচ্ছে এই যে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই,—সে ধর্মবোধ।

যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন—একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে।

যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্য ভাবে গ্রহণ করে। যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে মানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।"

কবির উদ্ধৃত বাক্য থেকে দেখা যাবে এ যেন শ্রীচৈতন্তের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের আক্ষরিক অনুবাদ। "ভেদং চিন্তয়িতুম্ অশক্যত্বাদভেদঃ, অভেদং চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদঃ।" এই তত্ত্ব অচিন্ত্য এবং অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয়তা শঙ্করও স্বীকার করেছেন—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ—তবু তাঁর কল্পনার ঘুড়ির 'এক কানাচে ঝোঁক' থাকায় একদিকেই অর্থাৎ বিবর্তবাদ সমন্বিত নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের দিকেই ঢলে পড়েছে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রামাণ্য সম্বন্ধে শঙ্কর নিজেই বলেছেন—'নহি শ্রুতি শতমপি অগ্নিরনুষ্ণ ইতি ব্রুবন্ প্রামাণ্যমুপৈতি'। অথচ নিজেই সেই প্রত্যক্ষ জগৎকে—"মায়াকল্পিত দেশ কাল-কলনা বৈচিত্র্য-চিত্রীকৃতং" বলে বলেছেন—"ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্ন বিকারম্।" এই অলীক স্বপ্নবাদের জন্ম শঙ্কর ভাষ্য সমন্বিত বেদান্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বর্জন করেছিলেন।

উভয় লিঙ্গ ব্রহ্ম—ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ যুগপৎ সবিশেষ নির্বিশেষাত্মক। বেদান্ত দর্শনে ৩।২।১১ সূত্র আছে,—ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্বত্রহি। শঙ্কর স্বীকার করেছেন—

সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ।

শ্রুতি বলেন,—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চ অমূর্তঞ্চ"

(১) সর্ব-কর্মা সর্ব-কামঃ সর্ব-গন্ধঃ সর্ব-রসঃ (ছাঃ ২।১০।২) ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষ লিঙ্গাঃ।

এবং (২) অস্থূলমণম্বহ্রস্বমদীর্ঘং (বৃহঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদ্যাশ্চ নির্বিশেষ লিঙ্গাঃ।

কিন্তু শঙ্কর গায়ের জোরে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, নির্বিশেষ স্বরূপই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ; উপাধি যোগে তাঁহাকে সবিশেষ বলিয়া ভ্রম হয়। পরবর্তী বৈদান্তিকগণ ভ্রমটা শঙ্করেরই বলেছেন, কারণ শ্রুতি সিদ্ধান্ত যে উভয়লিঙ্গ ব্রহ্ম তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

রামানুজ আর একদিক থেকে ব্রহ্মকে উভয়লিঙ্গ প্রতিপাদন করেছেন—ব্রহ্ম একদিকে সর্ববিধ দোষ পাপ মলিনতা হতে মুক্ত,—অপহত পাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকো-বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ (ছা-৮।১।৫) অন্যদিকে ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণ গুণের আকর,—'সমস্ত কল্যাণ গুণাত্মকোঽসৌ'। (বিষ্ণুপুরাণ)।

নারীশ্বর তত্ত্ব—সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন, ১। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ২। স একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ, সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ অতঃপর,— ৩। স এতাবান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্। (বৃহঃ ১।৪।৩)

রাধা-তত্ত্ব—সম্বন্ধে পুরাণ বলেন, 'মমার্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী'।

বৈষ্ণবের প্রেম,—বিশ্বমানবতার প্রেম, ভূমার প্রেম,—One world spiritually aware and psychologically integrated.

শ্রীভাগবতও উত্তম ভক্তের লক্ষণে বলেছেন—ঠিক এই কথাই,—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন, "তদ্‌যথা প্রিয়য়াস্ত্রিয়া সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ এবং অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্"। (বৃহঃ ৪।৩।২০-২১)

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

"অহং কান্তা কান্ত স্তুমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ
মনোবৃত্তি লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি তথা।"

এবং গীতগোবিন্দে—'মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা' অথবা "না সো রমণ না হাম রমণী দুঁহুমন মনোভব পেষল জানি" (চৈতন্য চরিতামৃত)—এ সমস্তই মধুর জীবাত্ম-পরমাত্মা মিলনের বা অধ্যাত্ম শৃঙ্গারের পরমানুভূতির পরাকাষ্ঠা।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার Theosophical Gleanings-এ 'God as Love, শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, শ্রীরাধাই মহাভাবের অভিজ্ঞী বা acme, তিনি মহাভাবময়ী—

Radha is the prototype of all lovers of God, male or female, only Her love is human love raised to the nth. power.

বৈষ্ণব সাধনায় পাঁচ-রকম ভাবের সাধনা বা সাধন ভক্তি প্রচলিত,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

শান্ত সাধনায় সেই অদ্বয় তত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপ, পরমাত্মস্বরূপ। যাঁহার সাধনা হয় ভজন ধ্যান যোগাদি সাধনায় অর্থাৎ অভ্যাস যোগে। যাঁকে 'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ',—যিনি 'তৎ' শব্দের বাচ্য। বাকী চার মার্গেই তিনি ঐশ্বর্য-মাধুর্যময় ভগবৎস্বরূপ পুরুষোত্তম। তাঁর ঐশ্বর্যগুণ ভক্তের নিকট গৌণ, তিনি প্রাণাৎ প্রিয়তরঃ বলেই মুখ্যতঃ গণ্য। তিনি মধুর হতেও সুমধুর, তিনি স্নেহময়, করুণাময়, প্রেমময়। Dulce Amore বা Sweetest Love. ভক্ত যখন রাগমার্গে প্রবেশ করেন,—ব্রজভূমিতে প্রবিষ্ট হন,—তখন তাঁর ভক্তি বা devotion প্রেমে (love) পরিণত হয়। এ বিষয়ে চরিতামৃতের উদ্ধৃতি দিয়েই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত, ঐশ্বর্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন, তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি, এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি।
আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন, সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন, অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন,
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ, তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন, বেদস্তুতি হৈতে তায় হরে মোর মন॥

এ প্রবন্ধের শুরু আছে শেষ নাই, তাই অলমতি বিস্তরেণ বলে আমার ভাষণ এখানেই শেষ করি,—সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।*

* রাজহাটী বন্দরে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে প্রবন্ধ শাখার সভাপতির ভাষণ।

'সংহতি' পত্রিকা
৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
১৩৮৩

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'একজন স্বল্প লেখক কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা যেমন কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫ খৃ:) প্রভৃতি ব্যতিরেকে, কবি করুণানিধান রবীন্দ্রভক্ত অধিকাংশ পুরুষ কবিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁহার জন্মস্থান শান্তিপুর (নদীয়া—জন্ম ইং ১৯।১১।১৮৭৭ খৃ: ; মৃত্যু ইং ৫।২।১৯৫৫ খৃ:)

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, কবি কুমুদরঞ্জন, সত্যেন্দ্র দত্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার, নরেন্দ্র দেব, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল, শৌরীন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুশীল দে প্রভৃতি কবিদের সকলের জন্ম ১৮৮২—১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

এই বৎসর কবি করুণানিধানের জন্ম শতাব্দী পূর্ণ হবে। কবির জীবন ঘটনাবহুল নয়,—১৯০২ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়ে স্কুলের শিক্ষকতা করেন। তিনি যখন গাইবান্ধা স্কুলে ৪০৲ বেতনে চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত তখন (১৯০২ খৃ:) তাঁহার বিবাহ হয় শ্রীমতী ধরা সুন্দরীর সঙ্গে। কাব্যলক্ষ্মী শৈশবেই তাঁকে প্রভাবিত করেন,—তাঁর দেশপ্রেমাত্মক কাব্য বঙ্গ-মঙ্গল (১৩০৮) বিনা নামেই ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ প্রসাদী (১৩১১) ঝরাফুল (১৩১৮) ধানদূর্ব্বা (১৩২৮) শান্তিজল (১৩২০) শতনরী (১৩৩৭) রবীন্দ্র আরতি (১৩৪৪), ভগবদগীতায় উপদিষ্ট অংশ বিশেষের কাব্য রূপায়ণ 'গীতায়ন' নামে প্রকাশিত হয় জন্মাষ্টমী ১৩৫৬ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ হইতে। এটী উৎসর্গ করেন আমার আত্মীয় এবং অগ্রজ বন্ধু কবিরাজ জীবনকালী রায় বৈদ্যরত্নকে।

১৯৫১ খৃ: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'জগত্তারিণী পদক' দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'শেষ পসরা' ও 'চিত্রায়ণী'। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'গীতারঞ্জন' প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ (১৯৫১ খৃ:) সালে।

'শতনরী' তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলীর চয়নিকা, তার প্রথম সম্পাদনা করেন কবি হেমচন্দ্র বাগচী ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে।

এই সঙ্কলনটি কবি করুণানিধান উৎসর্গ করেন তাঁহার কবিবন্ধু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮৬৯ খৃ:—১৯২৯ খৃ:)—ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র এবং

সৌমেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন। উৎসর্গের প্রথম পংক্তি—'নমি তোমা কবি ঋষি বরণীয় অন্তরঙ্গ মোর',—উভয় কবির অন্তরঙ্গতার পরিচয় বহন করছে। কবি সুধীন্দ্রনাথ কবিখ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বেই কথা সাহিত্য ও প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বৈতানিক', 'দোলা'-প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কবি করুণানিধানের 'প্রসাদী' গ্রন্থখানি পড়ে মুগ্ধ হয়ে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দেন।

শতনরীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন কবিশেখর কালিদাস রায় ১৩৫৫ (১৯৪৮ খৃঃ) সালে এবং কবিকে সংবর্ধনা দেওয়ার উপলক্ষ্যে রচিত 'সন্ধ্যারতি' কবিতাটি গ্রন্থারম্ভেই উদ্ধৃত করেন।

কবিতাটীতে মোহিতলাল কবিকে অগ্রজের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে বলেছেন—

"সন্ধ্যা হয়ে এল কবি!
তুমি আগে আমি তব পিছে, চলেছিনু সেই পথে
আজি এই দিবসান্তে মনে হয় * *
সুন্দরের সামগান শুনেছিনু তব কণ্ঠে কবি
সেই মন্ত্রে যৌবনের সোমরস,—একমাত্র হবি,
ঢেলেছিনু বাণী যজ্ঞে * *
আজও তুমি আগে আগে আমি তব পিছে চলিয়াছি
এবারের যাত্রাপথে হারাবো না পদচিহ্ন তব
আজও গেঁথে আনিয়াছি সেই ফুলে মালা একগাছি
রূপে যার একদিন রচিতাম স্বপ্ন নব নব।
আপনি লইতে কণ্ঠে সে মালিকা তুমি প্রীতিভরে
ফুল মোর বড় হয়ে ফুটিত সে তোমার আদরে।"

করুণানিধান ছিলেন তীর্থে এবং সাধু সঙ্গে বিশ্বাসী, পরমভক্ত ও ধর্মপরায়ণ, শাস্ত্রনিষ্ঠ এবং স্বদেশ বৎসল কবি। অধ্যাপক ডঃ মদনমোহন কুমার কবির জীবন ও কাব্য গ্রন্থে লিখেছেন:—"ভগবদ্ ভক্তি ও ভগবৎ-সাধনা কবির জীবনে বরাবরই ছিল। সারস্বত সাধনা ত্যাগ করিয়া স্বপ্নমুগ্ধ রোমান্টিক কবি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন। উদাসী বিরাগী কবি, কর্মত্যাগ করিয়া দেশে দেশে পথে পথে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। পাহাড়ে, পর্বতে, তীর্থস্থানে গিরিগুহায়

দিন যাপন করিয়াছেন। কোথাও শান্ত হইয়া বেশী দিন বাস করিতে পারেন নাই। প্রকৃতি ও ঈশ্বর তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছেন, অধ্যাত্ম-সাধনা-ব্যাকুল কবি মাঝে মাঝে পথের প্রান্তে কবিতার গুঞ্জন তুলিয়াছেন।" (করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও কাব্য পৃঃ ২২১-২২২)।

তাই মোহিতলাল ঐ কবিতাতেই বলেছেন :—

"হরিদ্বার কনখলে পিপাসায় করিলে তর্পণ
কারে স্মরি মঠে মঠে লুটাইয়া করিলে ক্রন্দন ?
নীলাচলে কি হেরিলে, সে অকূল বারিধি-বাসরে
দারুব্রহ্মে প্রণমিয়া কোন বর মাগিলে কাতরে ?
"কাতর ? তোমারে কবি কোন বিধি করিবে কাতর ?

* * *

সুন্দরের পাণিস্পর্শে মিলায় সে নিমেষের ক্ষত
ক্রন্দন ভুলিয়া যাও বাঁশি পেয়ে, বালকের মত
ডাকে তোমা বন গিরি নদী মেঘ জলধি অম্বর
ডাকে কাননের পাখী কাঁদিবার কোথা অবসর ?
"আমার বন্দনা লহ, লহ মোর প্রাণের প্রণাম

* * *

কবিতাটীতে কবির ছবি রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে। কবি প্রকৃতিতে 'সুন্দরের পাণিস্পর্শ' পুরুষোত্তমের আনন্দময় প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন।

কবির স্বভাব ও অমায়িকতা ছিল বালকের মতই একান্ত সরল, অকপট এবং অকৃত্রিম। বর্তমান যুগের সভ্যসমাজের ব্যবহার-বাহুল্য বা কথার আড়ম্বর তাঁর মোটেই ছিল না। তিনি যেন সরল পল্লীসমাজের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে কাব্য ও সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণায় ভগবদুপাসনায় নিমগ্ন থাকেন। বহুদিন যাবৎ তাঁর গ্রন্থগুলি অপ্রাপ্য হওয়ায় এবং সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা বা সমালোচনা প্রকাশ না হওয়ায় বর্তমান যুগের পাঠক সমাজে তিনি বিস্মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন। সেজন্য ৩ বৎসর পূর্বে ১৩৮১ (১৯৭৪ খৃঃ) সালে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমদনমোহন কুমার ৬৫৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থে কবির জীবন ও কাব্য গভীর গবেষণা সহকারে বহুতত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ

করে প্রকাশ করলেন তখন কোন বিদগ্ধ ব্যক্তিকে বিস্ময় প্রকাশ করতে শুনেছি, যে এই ব্যয়বহুল শ্রমসাধ্য আয়োজন, প্রয়োজনের তুলনায় অপরিমিত হয়ে পড়েছে। যে কেহ যত্ন করে পড়লেই দেখবেন যে সমসাময়িক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বিবরণে এবং কবি করুণা-নিধানের কাব্য প্রতিভার ছন্দ ভাব রূপ ও রসমাধুর্যের বিশ্লেষণে, গ্রন্থখানিতে কি অমূল্য উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। মনে হয় কবির শতবার্ষিক স্মরণোৎসবে এই গ্রন্থখানিই, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য বা সুযোগ্য উপঢৌকন বলে স্বীকৃত হবে।

কবি নিজে একান্ত প্রচার বিমুখ ছিলেন ও নীরবে নিভৃতে কাব্যসাধনা করে গিয়েছেন, কখনও মঞ্চে উঠে জনতার সম্মুখীন হননি. কোন সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বা কোনো পত্র পত্রিকা সংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না তাই তাঁকে লোকে প্রায় ভুলতে বসেছিল। তাঁর প্রসঙ্গে মনে হয়ঃ—

"আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাকো
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
আপনারে তুমি গোপন করিয়া রাখো
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।"—রবীন্দ্রনাথ।

তাঁহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয় ৭ই মাঘ ১৩৫৬, তখন কবি জীবিত কবিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভক্ত এবং শিষ্য ছিলেন। তাহার পর তিনি আর ৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন মাত্র। তাঁকে বলা হয়েছে "হে প্রকৃতির সরল শিশু নাও হৃদয়ের অর্ঘ্যভার" (কবি বিজন কুমার চট্টোপাধ্যায়) এ তাঁর শিশু সুলভ প্রকৃতির হুবহু বর্ণনা।

তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না, অন্ধ ভাবে তাঁর হাত ধরে ধরে চলেননি। তাঁর রচনাশৈলী পৃথক স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। তিনি প্রকৃতির বাউলছেলে, রূপে রহস্যে সুরে এবং স্বপ্নে বিভোর হয়ে ধ্যানাবিষ্ট চোখে তিনি যা দেখেছেন তাই ছন্দের ঝঙ্কারে এবং পদলালিত্যে প্রকাশ করেছেন। সজনী কান্তের ভাষায়,—

"অর্ণব পর্বত সর্পিল মেঠোপথ তরল তটিনী মহারণ্য
বন্দনা গানে তব রূপ নিল অভিনব, হে রূপরসিক তুমি ধন্য।"

তিনি সারস্বত কুঞ্জের কবি বাউল, আধি ব্যাধি জরা, শোক তাপ জরাজর্জর

জগতের দুর্ভোগ যন্ত্রণা ও বিচিত্র বিড়ম্বনা তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পায়নি। তাই কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন,—

"তোমাকে বন্ধু চিনেনিকো তব বঙ্গভূমি
দেশের লোকের মন জোগাতে তো লেখোনি তুমি। *
"প্রাণের বারতা পায়নি এদেশে তোমার গানে
কবিদের কবি! তোমারে শুধুই কবিরা জানে।" *
"স্বপ্ন ভুবনে নিয়ে গেছো তুমি স্বপ্ন কবি
কল্পনা দিয়ে রচিয়াছো তুমি নূতন ছবি।"

কবিশেখর বলেছেন যে কবির "এই কাব্যলোক স্বরাতপ্ত জরাশপ্ত আধিব্যাধিময় দুঃখ ক্লেশ ভরা বাস্তব জগৎ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার আশ্রয়,—সমস্ত তাপ জ্বালা ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্য অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভের আশ্রম।" "ইহাদের রচনা-রীতির পরম্পরা বা অনুক্রম যুক্তিগর্ভ নয়, আবেগাত্মক নয়, বক্রোক্তিমূলক নয়, ইহাদের অনুক্রম স্বপ্ন বিলাসেরই অনুবর্তী, —স্বপ্ন মাধুরীই ইহাদের স্থায়ীভাব।"

কবি করুণানিধান তন্দ্রা-তন্ময়, ভাব-বিহ্বল, আত্মভোলা কবি: প্রকৃতির দুলাল যেন উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর ঐশ্বর্য হাতে পেয়ে, খোশখরচী বালকের মত দিলদরিয়া মেজাজে তাঁর ইয়ার বন্ধুদের দু'হাতে বিলিয়ে দিতে দিতে একেবারে যাযাবর তীর্থঙ্কর হয়ে তীর্থে তীর্থে যেন মাধুকরী বৃত্তি করে বেড়িয়েছেন।

"সবঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয় তারে আমি লব চিনিয়া।"

কবির শেষজীবনে কবিগুরুর এই বাণীই সত্য হয়ে উঠেছিল। কবি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁর চিত্ত ছিল নির্বিকার,--মনে কোনও অনুযোগ অভিযোগ ক্ষোভ বা লোভ ছিল না।

তিনি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও অতিথি-পরায়ণ ছিলেন। তাঁর গৃহে অতিথি সমাগমও হ'ত প্রচুর। তাঁদের জন্য তিনি বিস্কুট আনিয়ে রেখে দিতেন এবং তাই দিয়ে সকলকে মধুর বিনয়ে আপ্যায়িত করতেন। এমন উদার অমায়িক মানব-প্রেমিক সরল সুন্দর প্রকৃতির কবিকে সহায় সম্বলহীন বিপত্নীক জীবনে,—কি অভাবে ও অবহেলায় জীবন যাপন করতে হয়েছে তা মনে করে আজ সকলেই দুঃখ ও লজ্জাবোধ করবেন।

কবির মৃত্যু হলে পর, আমরা তাঁর চিতায় মঠ দেউল নির্মাণ করে যেন তাঁর প্রতি অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত করে থাকি,—একথা ভাওয়ালের দরিদ্র কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ক্ষুব্ধ চিত্তে সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে গেছেন। কবি করুণানিধান ছিলেন নির্বিকার সদানন্দ পুরুষ,—এবং সে হিসাবে তিনি প্রাচীন ঋষিদের সংজ্ঞায় 'পণ্ডিত' পদবাচ্য অধ্যাত্ম সম্পদে ধনী এবং গীতার ভাষায় 'অচলপ্রতিষ্ঠ' ছিলেন। যিনি,—

লব্ধব্যানেব লভতে গন্তব্যানেব গচ্ছতি
প্রাপ্তব্যানেব চাপ্নোতি দুঃখানি চ সুখানি চ।

'তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া ল'ব'—এইরূপ ছিল তাঁর নিবেদিত আত্মার স্বরূপ,—তিনি সুখদুঃখ ভগবৎ চরণে নিবেদন ক'রে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করে গেছেন সারাজীবন ধ'রে। আমার সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় তাঁর শেষ জীবনে। তিনি তখন কলকাতায় এসে রয়েছেন,— C/o N. C. Das Gupta, P61, Central Avenue, 1st floor, suit no 2 এই ঠিকানায়। তাঁর সঙ্গে আমার পরোক্ষ পরিচয় হয় পত্রের মাধ্যমে সাহিত্যসূত্রে। পরে কলকাতায় প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় প্রথমে সাহিত্যসূত্রে এবং পরে চিকিৎসাসূত্রে।

বৈদ্যরত্ন কবিরাজ জীবনকালী রায় আমার মাতৃ-মাতুল সম্পর্কে দাদা এবং বন্ধু ছিলেন। তিনি কবির কবিরাজ এবং অভিন্নহৃদয় বন্ধুও ছিলেন। কবি তাঁর বাড়ীতে অনেকদিন আত্মীয়ের মত বাস করেছেন এবং তাঁর দ্বারা চিকিৎসিত হয়েছেন। সেই সূত্রে আমার নাম ও কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যখন কলিকাতায় উপরোক্ত ঠিকানায় আসেন তখন আমাদের 'কলিকাতা সাহিত্যিকা'র সম্পাদক (তৎকালীন 'বঙ্গশ্রী'রও সহ-সম্পাদক) শ্রীরণজিৎ কুমার সেন তাঁকে আমন্ত্রণ করেন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটী হয় চালতাবাগানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর নাটমন্দিরে। আমি তখন 'কলিকাতা সাহিত্যিকার' সভাপতি এবং বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্ভবতঃ গ্রন্থাগারিক বা সম্পাদক, কারণ পর পর কয়েক বৎসর আমি সম্মিলনীকে সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।

ঐ সংবর্দ্ধনা সভায় তিনি সাহিত্যে কবিতার সংজ্ঞা স্বরূপ ভাব-রূপ রস এবং ঐশ্বর্য মাধুর্য সম্বন্ধে অতি সরল সাবলীল ভাষায় অনতিদীর্ঘ ভাষণ দেন এবং

উদাত্ত কণ্ঠে নিজের কয়েকটি কবিতা ভাববিহ্বলচিত্তে ঈষৎ নিমীলিত নেত্রে আবৃত্তি করে শোনান। শুনে মনে হল রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রার্থনা বাণী,—

"আমারে কর তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে"

যেন সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে, কবির জরাজীর্ণ শীর্ণ দেহযন্ত্রটীতে,—যেন তার প্রতিতন্ত্রী ঝঙ্কার তুলে বেজে উঠেছে,—এমনই সে আবৃত্তি।

তারপরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জর, কাশি নিয়ে আরম্ভ, পরে বুকে বেদনা। আমি পরীক্ষা করে দেখি যে তা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার সূত্রপাত। উদ্বিগ্ন চিত্তে ওষুধ লিখে দিলাম। পরে তাঁর বাড়ী থেকে খবর এল কবি জিদ্ ধরেছেন ওষুধ খাবেন না। আমি তো প্রমাদ গুণলাম—বিশেষ করে কবির জরাজীর্ণ শীর্ণ দেহের জন্য—তাই নিজে গিয়ে তাঁকে শিশুর মত নানা প্ররোচনা বাক্যে ভুলিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ওষুধ খাইয়ে ফিরলাম। সে যাত্রা খুব বেশী তিনি ভোগেননি তবে বেশ কিছুদিন কলকাতায় থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সূত্রে এবং সেই সময়েই হয় আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আর একবার দেখা হয় আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে জীবন দাদার আমন্ত্রণে। সেখানেই একই সঙ্গে আমি কবি করুণানিধান, কবিশেখর কালিদাস রায় ও কবি মোহিতলালের সঙ্গ লাভ করি। বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে শেষজীবনে মোহিতলালের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়, প্রথমে সাহিত্য সূত্রে,—পরে চিকিৎসা সম্পর্কে। মোহিতলাল তাঁর 'অভয়ের কথা'র সম্পাদকের ভূমিকায় বন্ধুভাবেই আমার সামান্য সাহায্যকে বাড়িয়ে বলেছেন। আমি তার জন্য কুণ্ঠিত।

ঐ দিনের সভায় কবি করুণানিধান ও কবি মোহিতলালের কবিতা আবৃত্তি ও ঐ তিনজন বর্ষীয়ান কবির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করেছি তা কখনও ভুলতে পারবো না।

অতঃপর আমাকে কবি করুণানিধান যে পত্রগুলি লিখেছিলেন তার কয়েকটি নিয়ে উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

পত্রগুলি নূতন গৃহনির্মাণ করে বাসা বদলের সময় এমনভাবে চাপা পড়েছিল যে অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। তাই অধ্যাপক মদনমোহনের গ্রন্থে এগুলি মুদ্রিত হয়নি এবং সেজন্যই এগুলি সবই এতদিন অপ্রকাশিত ছিল।

ওঁ

খাগরা
পোঃ মুর্শিদাবাদ
৩১শে আগষ্ট' ৪৮

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,
প্রিয় কালীকিঙ্কর বাবু,—

এখানে আসিয়া আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত জীবনকালী রায় বৈষ্ণবরত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তাঁহার ঔদার্য্য ও দাক্ষিণ্যের পরিচয় প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বেই পাইয়াছিলাম। এতদিনে আমাদের বন্ধুত্ব অন্তরঙ্গত্বে পরিণত হইয়াছে। সকলি বিধি নির্দ্দিষ্ট।

আপনার 'মীরা' আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, একথা জীবন বাবুকে জানাই তিনি বলিলেন যে আপনি তাঁহার ভাই। আপনিও আমার কবি ভ্রাতা একথা তাঁহাকে বলিয়াছি। আপনার 'শেষের গান' ও আমার ভাল লাগিয়াছে। একথা আপনাকে শান্তিপুর হইতেই লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক আপনার বই দু'খানি জীবন বাবুকে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার অন্যান্য রচনাও দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনার বাণীসাধনা সফল,—একথা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া লিখিতেছি।

যদি কখনও কলিকাতায় যাই, আপনার সহিত দেখা করিব। আপনার 'শেষের গানের' একটা কথা এখনো মনে আছে। নায়িকার মুখে 'হে দেবর'! যেখানে লিখিয়াছেন ঐ স্থানটী সাহিত্যরসে সিক্ত। কালিদাসের মেঘদূতে যেখানে যক্ষ মেঘকে ডাকিয়া বলিয়াছেন 'হে মেঘ'! তুমি আমার বিরহে শীর্ণা দয়িতাকে এই বলিয়া সম্বোধন করিও, 'অয়ি অবিধবে'! কারণ তাহাকে ঐ একটী কথা বলিলেই তাহার আনন্দ হইবে। প্রথমেই এইরূপ সম্বোধন করিলে তাহার উদ্বেগ দূর হইবে।

আপনাকে কিছু নিবেদন করিতেছি। * * * যদি * * * আপনি দেখিতে চাহেন এখানে আসিবেন। আপনার সহিত আমারও দেখা হইবে। তবে আগামী শনিবার এখান হইতে অন্যত্র যাইতেছি। স্বাস্থ্য সাধনায় শান্তিপুর হইতে বাহির হইয়াছি। জীবন বাবুর বাড়ীতে একমাস

আছি। রাজভোগে আছি। তিনি কবিরাজ আর আমি কবি। কবিরাজ যদি বৃদ্ধ কবিকে না দেখিবেন তবে আর দেখিবে কে? তাঁহার পুত্র কন্যা নাতিদের সেবায় আমি পরম সন্তোষ লাভ করিতেছি। এখন ঘরের লোক হইয়া গিয়াছি। এখান হইতে পশ্চিমে চেঞ্জে যাইব।

আশা করি পত্রোত্তর শীঘ্রই পাইব। কবিশেখর শ্রীমান কালিদাস রায়ের 'গীতা' এখনো দেখি নাই। আমার রচিত কবিতাগুলি ছাপাইতে দিয়াছি। ২২৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। কালিদাস ও মোহিতলাল ভাল কবিতাগুলি বাছিয়া দিয়াছে এবং কালিদাস গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়াছে। মোহিত একটী কবিতা লিখিয়াছে। আরও ৩২ পৃষ্ঠা প্রুফ্ দেখিয়া পাঠাইয়াছি। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে আপনাকে শ্রদ্ধা উপহার পাঠাইব। অধিক আর কি লিখিব!

ভবদীয়—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ঔ

C/o N. C. Das Gnpta,
P61, Central Avenue,
1st floor, suite no 2
27/5/1949

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান কালীকিঙ্কর

তোমার কবিতা দু'টী পড়িয়া পরম আনন্দিত হইলাম, পাকা লেখা, মুন্সিয়ানা আছে। ভাষা ভাবানুসারিণী। 'নূতন স্বর্গ' নামক কবিতাটীর শেষাংশ-'স্বর্গ হইতে বিদায়ে' বেশ একটী নূতন ভাব ফুটাইয়াছো।

"কে চায় ফিরে স্বর্গ সভা
ঐ অধরের রক্ত জবা"
চির যৌবনের পূর্ণ ছবি।

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছো। আমি সুস্থ হইলেই তোমার সহিত দেখা করিব।

ইতি তোমার শুভার্থী
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওঁ

P61, Central Avenue,
1st floor suite no 2
Calcutta
20th June, 1949.

পরম কল্যাণীয় কবি
শ্রীমান কালীকিঙ্কর,

আমার শ্যালক শ্রীমান নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রকে তোমার কাছে পাঠাইলাম। তাহার হাতেই এই পত্র দিলাম। সে এবার B. Sc. পড়িতেছে Physiology তে Honours লইয়া। সে সম্প্রতি Carmichael Medical College (R. G. Kar) admission এর জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। * *

আশাকরি সপরিবারে ভালো আছো। তোমার ওখানে যাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু কোমরে বেদনা আছে বলিয়া আপাততঃ যাইতে অপারগ। দেখা হইলে অনেক কথা হইবে। 'শতনরী' কিরূপ লাগিল ? সেদিন সংস্কৃতি সংঘে 'কলিকাতা সাহিত্যিকার' অধিবেশনে তোমার ভাষণ খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। কবি শ্রীমান মোহিতলাল এখনও অসুস্থ। তুমি যদি তাহাকে দেখিতে যাও তাহা হইলে তোমার সহিত আমি যাইতে পারি। সকলি বিধি নির্দ্দিষ্ট। নূতন কবিতা কিছু লিখিয়াছো কি ? কবি কুমুদ রঞ্জনের 'স্বর্ণ সন্ধ্যা' নামে কাব্যখানি পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। ঐ কাব্যে 'আনন্দ' নামে কবিতাটী অতি চমৎকার। সুবিধা মত একদিন দেখা করিও। 'কলিকাতা সাহিত্যিকার' অধিবেশনের সংবাদটী কি কোন কাগজে প্রকাশিত হইল ? ইতি।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি তাঁহার জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন। পত্নী বিয়োগ, সন্তান বিয়োগ, বন্ধু বিয়োগ, চির দারিদ্র্য এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য বশতঃ তাঁকে প্রচুর দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে—তা তিনি অম্লান বদনে সহ্য করেছেন আত্মনিবেদিত চিত্তে,—'সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ'। ভগবদ্ ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে তিনি তা'তে ভেঙে পড়েন নাই, আধ্যাত্মিক সোপানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ ক'রে চিরশান্তি লাভ করেছিলেন।

তাঁর 'প্রসাদী ফুল' প্রভৃতি কাব্যগুলি তাঁর প্রসাদ-স্বরূপ তাঁর আশীর্বাদ স্বরূপ আমরা লাভ করেছি।

সাহিত্যে আপদ্ধর্ম এবং লেখকের দায়িত্ব

বর্তমান সময়ে আপদ্ধর্মের কথা উল্লেখ করছি এই জন্য যে, কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত নূতন করে প্রশস্ত পথ নির্মাণ করে বহিঃশত্রু আমাদের পুনরাক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অথচ এসময়ে দেশবাসি ঐক্যবদ্ধ না হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছেন। গৃহকলহ চিরদিন ভারতের পতন ও পরাধীনতার কারণ হয়েছে। তাই আমাদের আশঙ্কা ও উদ্বেগ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। সর্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা, কেউ কাউকে মানে না, গ্রাহ্য করে না,—একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সবকিছু ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। ক্রুদ্ধ জনগণ ট্রাম-বাস পোড়াচ্ছে—ক্রুদ্ধ ছাত্রগণ স্কটিশচার্চ, প্রেসিডেন্সি প্রভৃতি কলেজের মূল্যবান যন্ত্রাগার ভেঙে চূর্ণ করে দিচ্ছে। চেয়ার টেবিলের তো কথাই নাই। অধ্যাপক—এমনকি উপাচার্য পর্যন্ত লাঞ্ছিত হচ্ছেন। খাদ্যে ঔষধে, আচারে-ব্যবহারে, পুলিশে-কর্পোরেশনে, শ্রমিকে-কৃষাণে মহাকরণিকে-রাষ্ট্রসভা ভবনে সর্বত্র ভেজাল এবং দুর্নীতি দেশের কাঠামোটাকে বিষিয়ে নীল করে তুলেছে। দেশ নিশ্চেতন নীলকণ্ঠ হয়ে পড়ে আছে।

আমাদের অন্নবস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, সাজোয়া গাড়ী, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, সাবমেরিন-এরোপ্লেন, গুলী-বারুদ, বোমা-বন্দুক প্রভৃতি কিছুই পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই, এমন সময় যদি গতবারের চৈনিক অক্রমণের মত এবারেও হঠাৎ 'সাজো সাজো' রব ওঠে তাহলে অপ্রস্তুত জাতি একেবারে বিভ্রান্ত হতভম্ব হয়ে ভেঙে পড়বে।

অথচ এই অভাবের সময় আমরা সংবাদ পাচ্ছি গুজরাট রাজকোটে 'কোটি চণ্ডীযজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ব্যয় হবে আনুমানিক কয়েক কোটি টাকা। ২১ দিনব্যাপী এই যজ্ঞে এই দরিদ্র দেশের ১ লক্ষ মণ চাউল, অর্ধ লক্ষ মণ যব, ২৫ হাজার মণ ঘি এবং তদুপযুক্ত অন্যান্য উপকরণ ধ্বংস হবে। রাজকোট যদি দ্বিতীয়বার চিন্তা করে নিরস্ত না হন, তাহলে তাঁদের এই সর্বনাশা প্রবৃত্তি থেকে নিরস্ত করা লেখক এবং সাহিত্যিকদের দায়িত্ব, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সংবাদটি স্টেট্স্ম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে আলোচিত হয়েছে

ইংরাজিতে একটি কথা আছে—Politicians think of the next election,—statesmen think of the next generation, but

litterateurs think of all time,—past, present and future. রাজনীতিবিদ্‌গণ আগামী নির্বাচনের কথাই ভাবেন,—মহত্তর রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ পরবর্তী বংশ বা পুরুষানুক্রমের কথা ভাবেন,—কিন্তু দূরদর্শী সাহিত্যিকগণ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল কালের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি পুরুষার্থ লাভের কথা চিন্তা করেন। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' বিরাজ করেন যে-সত্যসুন্দর, তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখেই সাহিত্যিক অগ্রসর হন এবং ব্রতী হন প্রত্যেক যাত্রীকে তার জীবনের যাত্রা-পথের পাথেয় যোগাতে। যদি কেউ ব্যক্তিগত ঈশ্বরবাদ না-ও গ্রহণ করে থাকেন তা হলেও তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতীক, মানব কল্যাণের সুষম সুরুচিপূর্ণ পরিণাম-রমণীয় আদর্শকে সকল সাহিত্যিকই গ্রহণ করেছেন। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও এই 'Cosmic Religious Consciousness'কে স্বীকৃতি দান করেছেন। যাকে গীতা বর্ণনা করেছেন।

"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥"

বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্তাত্মা সাহিত্যিক তাঁর জীবনদর্শনে সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে নিখিল নরনারীকে দর্শন করেন,—তাই তিনি তাঁর সহৃদয় উদার চিত্তে জনগন-মানসের হুবহু প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত ছবিটি ধরতে পারেন এবং তাকে রূপ দিতেও পারেন,—তাই শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়ার বিড়ম্বনা তাঁকে ভোগ করতে হয় না।

এই C.R.C. বা Cosmic Religious Consciousness-ই প্রচারিত হয়েছে ব্যাপকভাবে ভারতের বেদান্তে, সাহিত্যে, সমাজনীতিতে ও ধর্মে। কবিগুরুর 'মানুষের ধর্ম'ও তারই দিশারী। এই 'মানুষের ধর্ম' সংস্কৃতিরই নামান্তর। তাই তিনি বলতে পেরেছেন—

'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি,
'আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি',—

কবি কামিনী রায়ও এই ভাবে প্রভাবিত হয়ে বলেছেন—

'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

ঋষিরা বলেছেন—"ধারণাৎ ধর্ম ইত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ"—সে

ধর্মও এই C.R.C.-পন্থী, যা সিমেণ্টের মত জগতের জনসমাজে বা জনসমষ্টিতে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিকে, অট্টালিকার ইষ্টকের মত, প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্যবন্ধনে বেঁধে রেখেছে। এছাড়া art for art's sake বা কলা-কৈবল্য-বাদ একান্তই অর্থহীন। মানুষের সৃষ্ট সকল কিছুর মূলে আছেন নরদেবতা। মহাভারতে তাই বলা হয়েছে 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ'—তারই অনুসরণে চণ্ডীদাস বললেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" তাই ব্যাসদেব মহাভারতের প্রতি অধ্যায়ে এই মানুষকেই 'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্' বলে প্রণাম জানিয়েছেন। 'নর' হলেন ব্যষ্টির মানুষ বা ব্যক্তিমানুষ বা সাধারণ individual man,—'নারায়ণ' হলেন সমষ্টির বা সমাজের জনগণের প্রতীক, এবং নরোত্তম বা পুরুষোত্তম (গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত) আদর্শ মানবতার প্রতীক—ঈশ্বরীকৃত মানব বা apotheosized Man; বাইবেল বলেছেন—'God made man after His own image'—অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষকে আপনার মত করে সৃষ্টি করেছেন। ফরাসী দার্শনিক ভলটেয়ার বলেছেন, 'Man lost no time in returning the compliment'—অর্থাৎ মানুষও অবিলম্বে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, তার ধ্যানের ধন ঈশ্বরকে, তার নিজের মনের মতটি করেই নির্মাণ করে নিয়েছে।

মানুষের সাহিত্য, দর্শন, ললিত-কলা ভাস্কর্য সব কিছুরই লক্ষ্য হল এই 'নর-নারায়ণ-নরোত্তম'। তাই কলাকৈবল্য নিয়ে, শুধু রং-রেখা, সুর-তাল, শব্দ-ধ্বনি, ও প্রতীক প্রতিমা নিয়ে, যদি সে আইভরি টাওয়ার (ivory tower) আশ্রয় করে বা বানপ্রস্থে যায় তো সে তার গুপ্ত গুণাবলী নিয়ে অচিরে কাল-কবলে বিলীন হয়ে যাবে।

যদি শুধু প্রবৃত্তির বেগে, মনের আবেগে সাহিত্য-প্রতিভার পক্ষীরাজ ঘোড়াকে (Pegasus) বল্গাহীন স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে তার জৈবী-প্রবৃত্তি একেবারে পশু-প্রবৃত্তি হয়ে উঠবে, তার "অসামাজিক (antisocial) আত্মম্ভরী ভোগ-প্রবণতা বেড়ে চলবে। ফলে সে বন্ধুত্ব ভুলবে, স্নেহ ভুলবে, মমতা, ভুলবে······আসলে পশুর থেকেও বীভৎস হবে। কারণ, পশু চলে অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায়; আমরা মানুষ, আমাদের প্রবৃত্তি অন্ধ নয়" ('বাজে লেখা', শ্রীগোপাল হালদার, পৃঃ ২০)। আমরা সর্ববিধ

সুবিধা-সুযোগ সম্বন্ধে' চক্ষুষ্মান, এবং পাশবিকতায় পশুর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। কারণ :—

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনু বিধীয়তে
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি। 'গীতা' ২। ৬৭

অসংযত প্রবৃত্তির তাড়নায় নরনারী যুগপৎ মাতাল এবং পাগল হয়ে উঠবে। পুরুষ, পৌরুষ লাভ ক'রে, সিংহবৎ বিক্রমশালী না হয়ে ছাগবৎ যৌন পশুতে পরিণত হবে। তাই দেখা যায় 'বিবর', 'প্রজাপতি' বুনো ওল', 'পাতক' প্রভৃতি কদর্য যৌন অপরাধের গল্পে বর্ণিত নরনারীর এই ছাগবৎ আচরণ। ধর্মাধিকরণের সম্মুখে কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপককে অবাধে সাক্ষ্য দিতে শুনি যে—"পবিত্রতা রসায়ন শাস্ত্রের কথা, এর সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই"—যা শুনে 'আদালতে হাস্যরোল' ওঠে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ নভেম্বর, ১৯৬৮) তথাপি বক্তার লজ্জার উদয় হয় না। তিনি প্রমাণ করতে চান যে সাহিত্যে 'অশ্লীলতা' যেন স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃত বিষয়। জাগ্রত ব্যক্তি নিদ্রার ভান করলে তাকে জাগাবে কে? সাহিত্যে যৌন অপরাধ বা অশ্লীলতা থাকতে পারে সত্য, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ঐ কুৎসিত বা কদর্য দিকটাকে জনপ্রিয় করবার জন্যে নয়। এই অপরাধের ফলে সমাজের কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়, স্বাস্থ্য সুখ শান্তির হানি হয়, কত নরহত্যা, প্রাণদণ্ড, কারাদণ্ড, নির্বাসন, মস্তিষ্ক বিকৃতি, আত্মহত্যা প্রভৃতি হয় এবং জাতি অধঃপতিত হয়,—তাই দেখাবার জন্যে। এগুলি criticism of life নয়,—জীবনদর্শনের সমালোচনা নয়—এগুলি নিছক pornography, বা যৌন চিত্রের জঘন্য বর্বরতা: এগুলি রসায়িত ভাষায় যৌন ব্যভিচার-রূপ অপরাধকে সমাজশরীরে সংক্রামিত ক'রে দেশে সুস্থ, বলিষ্ঠ, বীর্যবান, মহচ্চরিত্র সন্তান লাভের পথ প্রশস্ত না করে, জারজ সন্তান উৎপাদন ক'রে জাতির দেহমনকে ন্যুব্জ, কুব্জ, ঘৃণ্য পশুবৎ—সরীসৃপবৎ করে তোলে,— ফলে জাতি অধঃপাতে যায়।

সাহিত্যে অশ্লীলতা-র মাত্রামান অলঙ্কারশাস্ত্রের সূক্ষ্মবিচারের অন্তর্ভুক্ত, এগুলি তা নয়। এগুলি ভাবপ্রবণ তরুণ চিত্তে যৌনলালসা উদ্রিক্ত করে এবং তাদের যৌন অপরাধে প্ররোচিত করে। এগুলিকে বাস্তবধর্মী, realistic art অ্যাখ্যা দেওয়া চলে না। যা কিছু ঘটে তাই রটাবার কাজ সাহিত্যিকের নয়। ঘটনার সত্য, বা সাংবাদিকের সত্য, দেখাতে

যদি ড্রেন এবং পায়খানার ইন্‌স্‌পেক্টার হতে হয়,—তাহলে সেই সঙ্গে তার পঙ্কোদ্ধারের পথও নির্দেশ করতে হবে,—নাহলে তা সাহিত্য হবে না। সাহিত্যিকের অবিরাম যাওয়া আসা,—ভাব হতে রূপে এবং,—রূপ হতে অপরূপ আনন্দময় অনির্বচনীয় লোকে। তার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য, সুখশান্তি ও আনন্দপ্রদ রসসৃষ্টি করা। বিবাহের চেয়ে বড়ো সম্পর্কের অজুহাতে সত্যবদ্ধ বিবাহের গাঁটছড়া ছিঁড়ে ফেলে পশুর মত নিত্য নূতন ক্ষেত্রে চোরাই ফসলে চ'রে বেড়ানো নয়।

'শ্লীল' কথাটির ব্যুৎপত্তি 'শ্রী'র থেকে। 'রলয়োঃ রভেদাৎ' 'র' স্থানে 'ল' করলেই হবে শ্রীর-শ্রীল-শ্লীল। শ্রী + র অর্থে 'শ্রী'র প্রাচুর্য বুঝায়, তার অভাব বা বিপরীত বোঝাতে 'অশ্রীর', বা 'অশ্লীল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্যে অমৃতরস পাক করে সহৃদয় পাঠককে পরিবেশন করা। আজ কোথাও আদিম অসভ্যতা ও কুসংস্কারের বশে নরবলি দেওয়া হচ্ছে, কোথাও বর্ণবিদ্বেষবশতঃ হরিজন বালককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে—কোথাও বা সংঘবদ্ধ বর্বর বিদ্রোহে আমাদেরই শান্তিরক্ষাকারী পুলিশ সান্ত্রীদের পুড়িয়ে নূতন 'চৌরিচৌরা'—সৃষ্টি করা হচ্ছে!

'During the language riots in Madras, a couple of years ago, 3 police Sub-inspectors were dragged out of a vehicle and burnt alive. (A. B. Patrika—'Teachings of Shankara—' *by* H. V. R. Iyengar—29/6/69 p. 6).

অর্থাৎ বৎসর দুই পূর্বে মাদ্রাজে ভাষার দাঙ্গায় উত্তেজিত জনতা তিনজন পুলিশ সব-ইন্সপেক্টারকে গাড়ী থেকে টেনে বার করে কেরোসিন ঢেলে জীবন্ত দগ্ধ করে মারে। অথচ এই পুলিশ কর্মচারী তিন জনের বিরুদ্ধে কোনো অত্যাচার বা দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ছিল না। তাই লেখক প্রশ্ন করেছেন শঙ্করের 'জীব-শিব-বাদ' সত্ত্বেও আমাদের মনুষ্যত্ব আজ কোথায় গিয়ে নেমেছে! তামিলনাড়ুতে সরকার খোলাখুলি নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেছেন এবং সাধারণের ব্যবহার্য সকল স্থান থেকে দেবদেবীর মূর্তি অপসারিত করে দিয়েছেন। তথাপি সেখানে মন্দিরযাত্রী তীর্থযাত্রীর দল দিন দিন বেড়ে চলেছে ভিন্ন কমেনি। তাই লেখক শ্রীআয়েঙ্গার মন্তব্য করেছেন যে আমাদের এই রামায়ণ-মহাভারতের দেশে, বুদ্ধ-শঙ্করের দেশে, জনগণের মনে ধর্মভাব ও আচরণে ধর্মাড়ম্বর যেমন দেখা যায়, মানুষের

প্রতি মানুষের নৃশংস, নিষ্ঠুর ব্যবহারও তেমনি দেখা যায়। অন্তরের সঙ্গে বাহ্য ব্যবহারের এত অধিক পার্থক্য জগতে আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। দেশের কল্যাণ এবং আইনের নিরপেক্ষতা রক্ষার্থে শ্রীযুক্ত এম, সি, চাগ্‌লা মহোদয় দাবী করেছিলেন যে সকল জাতি ও সমাজের মত মুসলমানের মধ্যেও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে, যথা তুরস্ক, ইউ-এ-আর, ও পাকিস্তানে, এটি নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হয়েছে। ভারতে কিন্তু এটি এখনও যথাপূর্ব পূর্ণবেগে চলছে। এতে পরিবার নিয়ন্ত্রণের মূলনীতিটি ব্যাহত হচ্ছে এবং পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্মের জনসংখ্যা ও আদমসুমারি'র অনুপাতও অতিক্রান্ত হচ্ছে। এবিষয়ে জনগন তথা সরকারী কর্তৃপক্ষকে সচেতন করাও লেখকের আবশ্যিক দায়িত্ব। দেশের কোটি কোটি টাকা পরিবার নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যয় হচ্ছে, অথচ তা'র উদ্দেশ্য ও নিরপেক্ষতা উভয়ই ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত হচ্ছে। বর্তমানে সকলের মনেই একটা উত্তেজিত অধীরতা, উচ্ছৃঙ্খল অসহিষ্ণুতা, শুচিবায়ুগ্রস্ত স্পর্শকাতরতার ভাব দেখা যাচ্ছে। বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের সভা, কর্পোরেশন সভা, বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসক বা আইনজীবীদের সভা—এমনকি বিধানসভা,—সর্বত্রই এই স্পর্ধিত উদ্ধত—'লড়কে লেঙ্গে'—হামবড়াভাব এই দৃশ্য যতই দেখা যাচ্ছে ততই আমাদের উদ্বেগের কারণও দিন দিন বেড়ে উঠছে। বোঝাপড়া, রওয়া-সওয়া, আপোবনিষ্পত্তির দ্বারা মীমাংসা বা মিটমাটের মনোভাব ক্রমশঃ বিরল হয়ে উঠছে।

আমরা যতই শক্তিহীন লক্ষ্যহীন আদর্শভ্রষ্ট মুমূর্ষুবৎ মৃতকল্প হয়ে পড়ছি, ততই ছদ্ম বীর্যের ভান বা ভণ্ডামি দেখা যাচ্ছে। কথায় বলে 'গায়ে জোর নাই দাঁতখামাটি আছে',—এই দাঁতখামাটির 'দন্তরুচি কৌমুদী' শত্রুদের ভীত করে না, মিত্রদের উদ্বেগ বৃদ্ধি করে মাত্র। স্বর্গের চেয়েও গরীয়ান্ দেশ—কিন্তু দেশের চেয়েও গরীয়ান্ যে মনুষ্যত্ব, তাই আমরা হারাতে বসেছি। স্বাধীনতা লাভের পর ২২ বৎসর কেটে গেল তবু এখনও আমরা 'যে তিমিরে' প্রায় 'সেই তিমিরে'ই রয়েছি। দেশের সন্তানদের এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় কিছু আলো আমরা পেয়েছি, কিন্তু অন্ধকার এত গভীর ও সূচীভেদ্য যে সেই স্বল্পালোকে যেন সে অন্ধকারের প্রসার, ব্যাপ্তি এবং নিবিড়তা অধিকতর দুঃসহ ও দুর্ভেদ্য মনে হচ্ছে। তাকে দূর করা আরও আয়াসসাধ্য প্রতীয়মান হচ্ছে। এই আয়াস ব্যষ্টি-সাধ্য নয়, সমষ্টি-সাধ্য।

তাই এই কর্তব্য সকলের কর্তব্য মনে করে, আজ প্রত্যেক লেখকের দায়িত্ব হচ্ছে এই তমিস্রা ও এই কলঙ্ক দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া এবং সকল চিন্তাশীল সহৃদয় ব্যক্তিকে এ বিষয়ে সচেতন করা।

ইংলণ্ডেও এমনি এক জাতীয় সঙ্কট যখন এসেছিল তখন লর্ড নেলসন্ প্রমুখ দেশের সুসন্তানরা উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেছিলেন,—'England expects every one to do his duty'—অর্থাৎ দেশ আশা করে যে দেশের প্রত্যেক নরনারী আপন আপন কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করে দেশকে সঙ্কট থেকে মুক্ত করবেন। আমরাও প্রার্থনা করবো, সমবেত শক্তি নিয়ে সম্মিলিতভাবে,—"যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ"। বিশ্বের শান্তি কামনা,—চিরদিন ভারতের সংস্কৃতির এবং ঐতিহ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই প্রথমতঃ দেশ রক্ষার জন্যে, দেশের লোকের চক্ষু কর্ণে-মনে সাড়া জাগাবার জন্যে, তামসিক জড়তা ও বিকৃত যৌনবিলাস লালসা বর্জনের জন্যে চাই জাগৃতির সাহিত্য। আজ জাতিকে জাগাবার জন্যে স্মরণ করবো গীতার উপদেশ :—

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে
> ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। 'গীতা' ২।৩

সাহিত্যিক এই ভূত ছাড়াবেন কেমন করে,—কারণ তাঁর সাহিত্যের মধ্যেই ভূত অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিকগণ অনেক কাল ধরে ভাবতে শিখেছেন ও শিখিয়েছেন যে, "সমাজের নিয়ম আলগা হলেই মানুষ স্বাধীন। রুশোর আমল থেকে এই ভুল চলেছে,—ফ্রয়েডও এই ভুল করেছেন,—যেন পশুই ছিল স্বাধীন, jungle law-ই হল স্বাধীনতা।...স্বাধীনতার মানে হল প্রকৃতির নিয়ম জানা, জীবনের দাবি বুঝে জীবন চালানো,—বনে ফিরে যাওয়া নয়" ('বাজে লেখা'—শ্রীগোপাল হালদার পৃঃ ৩৮)। জীবন-সাধনার যা মূলসূত্র,—সাধনারও তাই। অন্তরের প্রবৃত্তিগুলির ধ্বংসসাধন করা যায় না,—তাদের উপবাসে ক্লিষ্ট করলেও তারা মরে না। তাই তাদের সংস্কৃতি সাধন করে কখনও রূপান্তর (transformation), কখনও ঊর্ধ্বপাতন (sublimation) করে—ইন্দ্রিয়বৃত্তির বুনো ঘোড়াগুলিকে পোষ মানিয়ে বশ করে নিতে হয়। সকল ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণকর্মকে আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। ('গীতা' ৪।২৭)

আজ সাহিত্যিককে আপন দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। জাতিকে তার অবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে, আশায় এবং বিশ্বাসে উজ্জীবিত করতে হবে,—

'রাখিও বল জীবনে রাখিও চির আশা, নিখিল এই ভুবনে রাখিও ভালোবাসা'। কবিগুরুর ভেরী-মন্দ্র আহ্বান শুনে 'গত গৌরব' 'হৃত আসন' এবং লজ্জায়—'নত মস্তক'—উর্ধ্বে তুলে ধরে—আত্মপর ভুলে দেশমাতৃকার সিংহাসন তলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে—

"দিন আগত ওই, ভারত তবু কই ?
নিশ্চল নির্বীর্য বাহু কর্মকীর্তিহীনে
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে
প্রাণ দাও, প্রেম দাও, দাও দাও প্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে !"

আন্তরিক প্রার্থনার বলে ঐশী শক্তির প্রেরণা লাভ করতে হবে।

একথা ভুললে চলবে না যে নীতিপুস্তক বা স্মৃতিসংহিতার লেখকের চেয়ে সাহিত্যিকের কলমের শক্তি অনেক বেশী। তার ঐশ্বর্যও বেশী, মাধুর্যও বেশী, তাই তার শাসনের শক্তি শস্ত্রের চেয়ে বেশী, শাস্ত্রের চেয়েও অনেক বেশী। Pen is mightier than the sword,—অসির চেয়েও মসির শক্তি অনেক গুণে বেশী।

বিগত যুদ্ধে ধ্বংসপ্রায় জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে ভারতের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার তুলনা করলে,—লেখকদের এই দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা সকলে সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

সাহিত্যিকের নীতি ও দায়িত্ব সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র জোর জিগীর দিয়ে বলেছেন, "বিশ্বমানব একটা লক্ষ্য ধরে নিরন্তর চলেছে, তার তিনটে অংশ art, morality এবং ধর্ম বা religion,—যা অসুন্দর, যা immoral, যা অকল্যাণ,—কিছুতেই তা art নয়…শত সহস্র লোক তুমুল শব্দ করে বললেও নয়। মানবজাতির মধ্যে যে বড় প্রাণটি আছে,—সে একে কোনোমতেই গ্রহণ করবে না।"

মাতৃক্রোড় থেকে মৃত্যুক্রোড় পর্যন্ত আমরা দেশমাতৃকার ক্রোড়েই জীবন যাপন করছি। বাল্যকালে 'ক্রীড়াসক্ত' থেকে বার্ধক্যে আজ 'চিন্তামগ্ন' হয়ে পড়েছি। তাঁর মুখের পানে চেয়ে আজও তবু আশায় বুক বেঁধে বলছি :—

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর ॥"

বেতার জগৎ,—১৬-৩১শে আগষ্ট, ১৯৭০ সংখ্যায় প্রকাশিত।

শিক্ষার সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ

আমাদের শুভবুদ্ধিকে সদা জাগ্রত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ বারংবার প্রার্থনা করেছেন বৈদিকমন্ত্রে—

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

তথাপি আজ রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েও আমরা পদে পদে সেই সদা জাগ্রত শুভবুদ্ধির সংযোগ হারাচ্ছি। তার ফলে আমাদের ঐতিহ্যাশ্রিত জীবনের ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা হারিয়ে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছি এবং পাশ্চাত্ত্য আদব কায়দার অন্ধ অনুসরণ করে জাতীয় সমাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি শুধু ঔদাসীন্য নয় অবহেলা এবং অবমাননা প্রকাশ কচ্ছি।

যা দেখেছি, এবং আজও প্রত্যহের জন সংঘট্টে কলকাতা দিল্লী প্রভৃতি মহানগরীতে দেখছি,—তাতে মনে হয়েছে যে এ-বিষয়ে সচেতন হয়ে সমাজকে প্রতিরোধ সম্বন্ধে সচেতন করবার প্রয়োজন হয়েছে।

ইংরাজ ভারত ছেড়েছে সত্য কিন্তু ইংরাজী চাল চলন আমাদের ঘাড়ে, আরব্যোপন্যাসের সিন্ধবাদ কাহিনীর 'বুড়ো'র মত চেপে বসেছে অথচ ইংরাজের সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও জাতীয় নিষ্ঠা আমরা গ্রহণ করিনি। তাই এখনও দেখি—উপনয়নের পত্র ছাপা হচ্ছে ইংরাজী ভাষায় Holy thread Ceremony র উল্লেখ করে তলায় R. S. V. P. দিয়ে!

ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে আমি বিদ্বেষ প্রচার করছি না,—কারণ স্থান কাল পাত্র বিচারে প্রযুক্ত হলে আমি ইংরাজী ভাষার বিদ্বেষী তো নই-ই পরন্তু তার প্রয়োজনীয়তায় একান্ত বিশ্বাসী। কিন্তু যখন দেখি ছেলেমেয়ের মুখে, মা বাপের কাছ থেকে বিদায় মুহূর্তে 'টা-টা' ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা কেউবা বলছেন 'বাই বাই' তখন অন্তরটা টাটিয়ে ওঠে, টন্‌টন্ করে ওঠে, এর প্রতিকার এবং প্রতিরোধকল্পে।

আজ হ'তে অর্ধশতাব্দীরও বেশী পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (১৩১৩ বঙ্গাব্দে) 'শিক্ষা' প্রবন্ধে—'আমরা জানি অনেকের ঘরে বালক বালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয় বিকৃত হিন্দুস্থানী শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালীর ছেলে বাংলা সমাজ হইতে যে শত সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়, সেই সকল সজাতীয় নাড়ীর যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, অথচ ইংরাজী সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎখাত

হইয়া বিলাতী টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশী ভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মা'কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে—Mamma, look lots of Babus are coming,—বাঙালীর ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে।'

তাই রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হের-ফের' প্রবন্ধে বলেছেন,—'বাঙালীর ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই! অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বন করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটুগালি ছাড়া তাহাতে আর কোনরূপ মস্‌লা মিশানো নাই।

'তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গ সন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না।'

আবার রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'-এ বলেছেন,—'আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত, পোদ, বাগ্‌দি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না।'

'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—'খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষায় রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপূর্তি করে না।'

এবং আরও সুন্দর ভাবে এই প্রবন্ধেই বলেছেন,—ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক না কিন্তু গরীবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?'

ইংরাজের জাতীয়তাবোধ আমরা গ্রহণ করিনি, যদিও তাদের কতকগুলি ব্যবহারিক আদব কায়দার আমরা অন্ধ অনুকরণ করেছি। সম্প্রতি আমাদের সম্মাননীয়া অতিথি রাজ্ঞী এলিজাবেথের আতিথ্য সম্বন্ধে ইংরাজের

জাতীয়তা বোধের কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন পেয়েছি। রাজ্ঞীকে কোন এক সময়ে পরিবহণের জন্য একখানি মার্সিডিজ বেনজ নামক জার্মান মোটর গাড়িতে আরোহণ করানো হয়েছিল। তাতে ব্রিটিশ সরকার এবং প্রজাবৃন্দও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে কেন তাঁকে ইংলিশ রোলস্ রয়েস বা মার্কিন ক্যাডিল্যাক প্রভৃতি গাড়ি থাকতে জার্মান গাড়িতে চড়ানো হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের সর্বদা স্মরণ করা উচিত যে আমরা স্বাধীনতা লাভের পর স্বদেশী মানসিকতাকে কিরূপভাবে একান্ত অবহেলায় বিসর্জন দিয়েছি এবং এখনও প্রাত্যহিক এবং বৈদেশিক খরিদের ক্ষেত্রেও তাচ্ছল্যভাবে যথেচ্ছাচার করছি,—ফলে আমাদের অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি কোন সমস্যা সমাধানের পথ পাচ্ছি না।

এ বিষয়ে Buy American Act—এর মত আমাদেরও আইন প্রণয়ন করা উচিত। এইরূপ স্বদেশী ব্যবহার ও বিদেশী বর্জনের ব্রত সকলে মিলে গ্রহণ না করলে এই দরিদ্র জাতির দুর্গতি অনিবার্য এবং অপ্রতিকার্য। রবীন্দ্রনাথের মত মহাত্মাজীও বলেছেন :—In it lies the prosperity of India. To use foreign articles rejecting those that are manufactured in India is to be untrue to India. It is an unwarranted indulgence. অর্থাৎ এই স্বদেশী ব্রতের উপরই ভারতের অভ্যুদয় নির্ভর করিতেছে। স্বদেশী না কিনিয়া বিদেশী কেনার অর্থ স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। কেহ এরূপ করিলে এবং তাহাকে প্রশ্রয় দিলে—তাহাকে বে-এক্তিয়ারি আস্কারা দেওয়া হয় মাত্র।

এই প্রসঙ্গে প্রথম স্বদেশী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের অবদান এবং তাঁর শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানে কৃষি ও কুটির শিল্পের উৎপাদন ও সম্প্রসারণ জাতীয়তার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

অল্প কথায় রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন—'আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

উপসংহারে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা এবং তাঁর আদর্শ গ্রহণ করার প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা, স্মরণ করছি ও সকলকে স্মরণ করাচ্ছি।

সাহিত্যতীর্থ, ১৩৬৮, পৃঃ ৮০

গীতায় গৃহধর্ম্ম ও ভক্তিসাধনা

শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায় সকল সাধনার মূল কথাগুলি সহজ ভাষায় বলা আছে। বৌদ্ধ ও জৈন সাধনায় এবং শঙ্কর প্রবর্তিত অদ্বৈত সাধনায় সন্ন্যাস আশ্রমকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে,—বলা হইয়াছে "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"। গীতায় কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের নিষ্কাম কর্ম্মযোগকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। "তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে" (৫।২)—কারণ সাঁতার শিখিয়া জলে নামা যায় না,—জলে নামিয়া ২।৪ বার হাবুডুবু খাইয়া তবে সাঁতার শিখা যায়।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩।৪

সুতরাং "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং"—বলেন গীতা। কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্মণঃ—বসিয়া না থাকি, বরং বেগার খাটি' সেও ভালো। না হইলে 'শরীর যাত্রা' অচল হয় (৩।৮) নয়তো বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়া অন্তরে 'মিথ্যাচার' হইতে হয় (৩।৬)।

শ্রীরামকৃষ্ণ, ফলাসক্তিহীন হইয়া মনিবের ভৃত্যের মত নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। গীতাও তাহাই বলিয়াছেন (২।৪৭।৪৮)। মনিব যেমন বেতন দেন, শ্রীভগবান্ সেইরূপ কর্ম্ম-যোগীকে কর্ম্মান্তে শান্ত নিশ্চল বুদ্ধি সমন্বিত জ্ঞান দান করেন (৫।১০-১২) 'জ্ঞানানধূর্তকল্মষ' হইয়া সে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ করে (২।৫১, ৫।১৭)। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ম্মযোগী ও কর্ম্মসন্ন্যাসীর মধ্যে কোনো ভেদ নাই (৬।১-২)। বনে গিয়া আসক্তচিত্ত সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা গৃহে থাকিয়া অনাসক্তচিত্ত গৃহী হওয়া ঢের ভালো,—বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং……নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্।"

কর্ম্মযোগ ব্যতীত কর্ম্মসন্ন্যাস করিলে দুঃখ পাইতে হয় (৫।৬)। কর্ম্মযোগ সুকর, কর্ম্মসন্ন্যাস দুষ্কর। কর্ম্মযোগীর গার্হস্থ্য জীবন সার্থক ভাবে যাপন করিতে হইলে, সৃষ্টি চক্রের চাকায় হাত লাগাইয়া যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগে তাহাকে ঘুরাইতে হইবে; অন্যথা জীবনযুদ্ধে পলাতক হইলে, তাহাকে অঘায়ু বা পাপ-ভাজন হইতে হইবে,—তাহার জীবনই ব্যর্থ হইবে—"মোঘং পার্থ স জীবতি (৩।১৬)।

পক্ষান্তরে,—ভগবৎ প্রীতির জন্য বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত কাজ করিলে চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি হয়। (৫।১০-১১)

গীতা কি অনাসক্তি যোগ ?

মহাত্মা গান্ধী গীতাকে 'অনাসক্তি যোগ' বলিয়াছেন। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলি যে 'অনাসক্তি' গীতার একদেশ মাত্র; তাহা গীতার পূর্ণ সংজ্ঞা হওয়ার যোগ্য নহে। 'অনাসক্তি' অর্থে বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি। প্রকৃত অনাসক্তি লাভ হয় পরমতত্ত্ব উপলব্ধির পর—পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে" (২।৫৯)। এই অনাসক্তি তুচ্ছ ধন-জন-যৌবনের ভোগ্যবিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া ভূমার প্রতি সেই আসক্তিকে নিয়োজিত করে। গীতার প্রায় প্রতি অধ্যায়ে ভূমার প্রতি সেই আসক্তি বা ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই ভক্তিযোগের খুঁটি ধরিলে বা শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় "বুড়ী ছুঁলে" আর সংসারাসক্তি তাহাকে টানিতে পারে না। আত্মা তখন পরমাত্মার পথে পুরুষোত্তমের পথে অভিসারী হন। এই 'ভক্তি' অবলম্বন করিয়া যুক্ত হইতে পারিলে আর সংসারে আবদ্ধ হইবার ভয় থাকে না (৯।২৭-২৮)

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।

প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ (ভাগবত)

তখন এই ভক্তির ফলে "কাম" প্রেমে পরিণত হয়—। তখন 'জহি শত্রুং কামরূপং দুরাসদম্"—(৩।৪৩) অর্থে কামকে হত্যা করা নয়, তাহাকে প্রেমে রূপান্তরিত করা বুঝায়। যেমন পরিণয়ের ফলে কন্যার কুমারীজীবনের অবসান হয় এবং তাহা পরিণত হয় তাহার নব-বধূর নবজীবনে। শুক কীট তখন খোলস্ ত্যাগ করিয়া সুন্দর প্রজাপতিরূপ ধারণ করে।

ক্রমশঃ তাহার ভজন দৃঢ় হয়, দ্বন্দ্ব মোহ দূর হয়, তখন "ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ" (৭।২৮)

সাংখ্য যোগ, জ্ঞান যোগ, কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ, অভ্যাস যোগ প্রভৃতির দ্বারা মুক্তি লাভ হইতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু 'ভক্তিযোগ'ই জ্ঞানবিজ্ঞানসমন্বিত রাজযোগ (৯।১-২) যাহা—'সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্' এবং 'প্রত্যক্ষাবগমং (practical)।

জ্ঞান ও ভক্তি :—প্রশ্ন ওঠে যে জ্ঞান ও ভক্তিতে প্রভেদ কি? প্রভেদ নাই বলিলেই চলে—'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' এই জ্ঞান হইলে তাহাকেই ভক্তি বলে।

To know Him is to love Him
And love but Him for ever''

এই কথাই এর মনস্তাত্ত্বিক মীমাংসা। ভক্তির সংজ্ঞা,—

'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' (শাণ্ডিল্য সূত্র)।

সাধনার ক্রমে কর্মযোগের দ্বারাই কর্মসন্ন্যাস লাভ হয়। যেমন চাকুরীর পর অবসর গ্রহণ ও পেন্‌সন্ প্রাপ্তি। যখন 'যোগসংন্যস্তকর্মাণং' এবং 'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্' অবস্থায় শুদ্ধচিত্তে জ্ঞান ও ভক্তি প্রতিভাত হয়, তখন সাধক ঈশ্বরের পরমধামে বা লীলার জগতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন। তখন ভক্তের আমিত্ব বা পৃথকত্ব থাকা না থাকা সেই লীলাময়ের নিয়ন্ত্রণাধীন।

শ্রুতি বলিয়াছেন 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মেতেই লীন হন বা ব্রহ্মই হইয়া যান; কিন্তু গীতোক্ত পুরুষোত্তম বা ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময় ভগবৎতত্ত্ব উপলব্ধ হইলে ভক্ত তখন তাঁহাকে সর্বতোভাবে ভজনা করেন,— 'স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত' (১৫।১৯)।

সব পথই তাঁহাতে গিয়া মিশিয়াছে—'নৃণাং একো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব' (মহিম্নস্তোত্র)—তবে অন্যপথে অধিকতর ক্লেশ :—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" (১২।৫)। গীতার ৯।২৭ ও ১২।৬ শ্লোকে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—যাহা কিছু কর,—"তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্" তাহা হইলে "মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ" তখন সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা" হইয়া আমাকে পাইবে (৯।২৮)। তখন রঙ্-করা গৈরিক বা "কাষায়াম্বরধৃতবহুবেশঃ" প্রভৃতির আর কোনো প্রয়োজন হইবে না। তৎপরায়ণ হইলেই তাঁহাকে পাইবে (৯।৩৩-৩৪)। তাঁহাকে ভজনা করিলেই তাঁহাকে পাইবে ইহা—তাঁহার স্বমুখের প্রতিশ্রুতি।

একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ এবং পরে সৌম্যরূপ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—কেবলমাত্র অনন্যাভক্তির দ্বারাই তাঁহার এই রূপ দেখা যায়; তাঁহাকে জানা যায় এবং তাঁহাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। (১১।৫৪)

ভক্ত বলেন, "আমায় হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চল সখা আমি যে পথ চিনি না,"—তিনিও আশ্বাস দেন।

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি অভয় দেন—ইহাই তাঁহার ব্রত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাসযোগ উপদেশ দিয়া শেষে ভগবান্ বলিলেন তপস্বী জ্ঞানী কর্মী সকলযোগীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগী…"মদ্গতেনান্তরাত্মনা,—শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।" ৬।৪৬-৪৭

সম্বন্ধ নির্ণয়ঃ—ভগবানের সঙ্গে সর্ববিধ সম্বন্ধই সম্ভব, তাই "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" বলা হইয়াছে। তিনি "গতির্ভর্তা প্রভুঃ…নিধানং বীজমব্যয়ম" "অমৃত ঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ" (৯।১৮-১৯)। দেবর্ষি তাই তাঁহার ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন—

"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্।"

১৮শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শেষকথা বলিলেন—তুমি কায়মনোবাক্যে মৎপরায়ণ হও, তাহা হইলে সকল সঙ্কটে আমার প্রসাদে উত্তীর্ণ হইবে (১৮,৫৮) এবং শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ (১৮।৫৬)—প্রাপ্ত হইবে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন যে আমরা তাঁহার প্রিয়, তিনি আমাদের সকল পাপ মুক্ত করিয়া লইবেন তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হইলে। (১৮।৬৫-৬৬)।

এই শরণাপত্তি এবং তদর্পিতাচারিতাই অন্তর্যুদ্ধের কুরুক্ষেত্রে খুরলী 'বিদ্যা' বা সমরনীতিতে আত্মরক্ষার উপায়।

অন্তিমের প্রাণপ্রয়াণের পথে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তদ্ভাবভাবিত হইয়া দেহত্যাগ করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় (৮।৭)। সেখানেও সম্বল "ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব"।

ভক্তিলাভের উপায়ঃ—দেবর্ষি বলিয়াছেন "মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপা-লেশাদ্বা। ভক্তের কৃপা এবং ভগবানের কৃপা হইতেই ভক্তি লাভ করা যায়। তাই সাধুসঙ্গ শাস্ত্রপাঠের চেয়ে মূল্যবান এবং শুভঙ্কর।

আশার কথাঃ—আশার কথা এই যে আসক্তির মূলধন আমাদের অন্তরেই প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু আত্মারূপ মধুকর মধু না পাইয়া বিষয়ের কদম্নপানে মুগ্ধ রহিয়াছে। তাই সাধুসঙ্গে শাস্ত্রপাঠে লীলাকীর্তনে ও নামজপে সেই প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া তাকে ভগবন্মুখী করিতে হইবে।

কোনো ছোট ছেলের হাতে যদি একটি বাতাসা কদ্‌মা কি লেবেঞ্চুস্ থাকে আর কেউ যদি তাহা কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে সে সর্বহারা হইয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু যদি কেউ তাহাকে একটি রাজভোগ অমৃতী কিম্বা একটি লেডিকেনি দিয়া বাতাসাটী চাহিয়া নেয়, তবে সে মনের আনন্দে তাহা বিনিময় করিয়া নেয়। তখন "মধুকর পেলে মধু চায় কি সে জলপানে"? মলয় মারুত

বহিতে থাকিলে কি কেউ হাতপাখা চালনা করে? "তালবৃন্তেন কিং কার্যং লব্ধে মলয়মারুতে"?

সচ্চিদানন্দ-রস-বিগ্রহ পুরুষোত্তমের অঙ্গ সৌরভবাহী মলয়মরুৎ প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার অন্তরে বাহিরে প্রবাহিত হউক,—এই প্রার্থনা করিয়া ভক্তচরণে এবং ভগবচ্চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের এখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানিলাম।

'পথের আলো-য়' প্রকাশিত পৃঃ ৩০৮-১০

হিন্দুমিশন,—বাৎসরিক গীতা ব্যাখ্যা সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আদর্শ ভক্তের মহিমা

গুরুবর শ্রীবলরাম মহারাজের স্মৃতিসভায় প্রদত্ত ভাষণ

ভাগবত ও ভক্ত মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে আমার শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর কথা মনে পড়ছে—

ক্বাহং মন্দমতিঃ ক্বেদং মন্থনং ক্ষীরবারিধেঃ।
কিং তত্র পরমাণু র্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ॥

মন্দর পর্বত যেখানে ক্ষীরসাগর মন্থনে নিমজ্জিত হয়ে যায়, সেখানে আমার মত সামান্য পরমাণু প্রমাণ ব্যক্তি কি বলতে পারে? কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলেছেন—

মুঁই অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙা টুনি—
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি।

তবে কিসের লোভে এখানে উপস্থিত হয়েছি? আচার্য শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উদ্ধৃত করে সে কথা বলে দিয়েছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধুগণ ভক্তগণ গুণিগণ যে রস পরিবেশন করেন, আমরা তাঁদের তত্ত্ব পিপাসু চাতক, তাতে আমরা অবগাহন স্নান করে আমাদের পিপাসা মিটাতে ও হৃদয় পরিতৃপ্ত করতে পারি। জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি এখানে অনেক এসেছেন। তাঁরা

বলেছেন, তাঁরা তীর্থ করতে এসেছেন। কিন্তু সেই তীর্থকেও তীর্থ করেন—'তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা,'—তাঁরাই সকলে, কারণ তাঁদের অন্তরে যে নারায়ণ বর্তমান রয়েছেন, তাঁরই এক-একটি সচল মন্দির স্বরূপ তাঁহারা প্রত্যেকে।

বৈষ্ণবেরা বলেছেন—

জীবে সাক্ষাৎ নাই তা'তে গুরুচৈত্যরূপে :
শিক্ষাগুরু হ'ন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥

শ্রীভগবানও স্বয়ং বলেছেন—'আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ'—আমাকে আচার্যরূপে জানবে। লোকগুরু যাঁরা, আচার্য যাঁরা, তাঁদের আবির্ভাবও তাই কোন অংশেই কম কল্যাণকর নয়। তাঁরা আমাদের উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসেন। ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হয়ে আমরা আর্তস্বরে চিৎকার করছি। ওপরে 'চাকণ-চিকণ', দেখতে সুন্দর,—হয় তো বা ঐশ্বর্য-বিলাসে ভাসছি, কিন্তু অন্তরে একটা তুষাগ্নি জ্বলছে। প্রায় সমস্ত জীবেরই এইরূপ অবস্থা, যার জন্যে সাংখ্য-দর্শনের প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে—'দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্ জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ', কি করে এই দুঃখের নিবৃত্তি হবে, কোথায় পাবো এই দুঃখের মহৌষধ? সেই নিবৃত্তির পথও দেখিয়েছেন এই ধর্মগুরু সাধু আচার্যবৃন্দ গুরুবর শ্রীবলরাম একজন আলোকসামান্য বরেণ্য আচার্য। তাঁর লীলামৃতচরিত শ্রবণের আকাঙ্ক্ষাই আজ আমায় এখানে আকর্ষণ করেছে।

আচার্য সাধু ভগবদ্ভক্তবৃন্দ কর্তৃক জীবের দুঃখনিবৃত্তির বিভিন্ন উপায়ের কথা বলা হয়েছে। কোন্ পথের কথা তাঁরা বিশেষ করে বলেছেন? মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কথায় বলি—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কীর্তনকেই প্রধান উপায়রূপে গ্রহণ করতে বলেছেন তিনি। ভগবানের নাম গ্রহণই মলিনচিত্ত জীবের হৃদয়দর্পণকে মার্জনা করে, এই সংসাররূপী মহাদাবাগ্নি নির্বাপণ করে, জীবকে পরম মঙ্গল দান করে, জীবের আনন্দবর্দ্ধন করে, পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। কিন্তু আমাদের এমন দুর্দৈব যে আমরা এমন সহজ পথ ও অনুসরণ করতে পারি না।

যাঁরা ভগবানকে জড়িয়ে ধরেছেন, ভগবানের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন তাঁরা বাহ্যতঃ কঠোর দুঃখকষ্ট সহ্য করলেও অন্তরে অন্তরে তাঁদের অনাবিল আনন্দের স্রোত বয়ে চলে। আর আমরা যারা সংসারের মোহে আবদ্ধ, তারা সমস্ত কিছু সুখ, যা সংসার দিতে পারে, যা চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক আদি ইন্দ্রিয়বর্গ দিতে পারে,—এবং ভোগের শক্তি, দেহের তারুণ্য ইত্যাদি যে সকল সুখ-সুবিধা দিতে পারে, সে-সমস্ত পেয়েও সতত দুঃখভোগ করে থাকি। মানুষ এটা নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারাই লাভ করেছে—বইপড়া কথা থেকে নয়। আমরা নিজেরাই ভোগ করে দেখেছি। রূপ দিয়ে যতই চোখকে ভরিয়ে তুলুন, চোখের পিপাসা কখনই মিটবে না। কানকে গান দিয়ে যতই ভরিয়ে তুলুন, কানের পিপাসা কখনও মিটবে না। "Eyes are never filled with seeing,—nor ears with hearing".

মহাভারতে যযাতির উক্তি স্মরণ করুন—

> ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

এ যেন ঘি দিয়ে আগুন নেবাবার চেষ্টা। যত ঘি দেবেন ততই আগুন বাড়বে।

গুরুবর বলরামের কথা আপনারা শুনেছেন। তাঁর শিষ্য যাঁরা, তাঁরাও যেন এক-একটী স্নিগ্ধ শীতল নির্ঝরের মত। বোধ হয় এইরূপই হয়; আচার্যরূপী মহান্ উৎস হতে অমৃতধারা বহুমুখী হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; আচার্য কেন বলা হয়?

> 'আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি।
> স্বয়ং আচরতে চৈব তমাচার্যং প্রচক্ষতে॥'

এইজন্য তাঁরা আচার্য। এই সংজ্ঞার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য শ্রীবলরাম স্বামীজি মহারাজের জীবনে আমরা পাই। স্বামীজির প্রকাশিত জীবনী পড়েছি। পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে নয়, সাল তারিখের ছকে বাঁধা গতানুগতিক দিন যাপনের কাহিনী নয়—জীবনের প্রতিটি আচার-আচরণের কথায় ও অনুষ্ঠানের তাৎপর্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা মহৎ চরিত্র এই জীবনীর মধ্যে রয়েছে। পরম নিষ্ঠাবান সিদ্ধ সাধকের সাধনা ও দিনচর্যার কথা এর ছত্রে ছত্রে।

চলতি কথায় আছে—"পুঁথি মেরে থুঁতি চারো বেদ পঢ়ে মজ্‌দুর"—যদি কেউ চার বেদ পড়বে সে তো সৌখীন মজদুরী, পণ্ডিতেরা যা করে থাকেন। "কথ্‌নী কো ঘর বহুৎ মিলে, করণী কো ঘর দূর"। যে কেবল বিদ্যার জাহির

করে বেড়ায়, তার ভিতরে যদি অনুভূতি না থাকে, আচার অনুষ্ঠান না থাকে, তাহলে তার সে পাণ্ডিত্য ব্যর্থ। স্বীয় অন্তরেই সকল আচার আচরণ ভাবনা ও কর্মের উৎসস্রোত থাকা দরকার এবং সে উৎস হবে এইরূপ চিন্তা ও অনুধ্যান যে—

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরু।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যাঁদের ভিতরে এই অনুভূতি আছে, এই জ্ঞান আছে, তাঁদের একটি কথা বহু কথাকে ফুটিয়ে তোলে। পরমহংসদেবের কথামৃতের কথা ধরা যাক্। তাঁর অতি লৌকিক সাধারণ কথাও অলৌকিক অর্থবহ কথা। সে ভাষা খুব মোটা ভাষা। যে ভাষায় তাঁরা কথা বলেন সে ভাষা সেই মুক্তিতীর্থের ভাষা। যাঁদের পেয়ে "মোদন্তি পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি" তাঁরা হচ্ছেন আদর্শবাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী। তাঁরা যা বলেন তা আচরণ করেন এবং তাঁরাই মূর্তিমান ধর্মবিগ্রহ। তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তাতে বিশ্বাস নিয়ে আচরণ করেন। তাঁরা আস্বাদন করে যখন বলেন যে এই কৃষ্ণনাম,—এর যে রূপ, এর যে রস ও মহিমা তার তুলনা হয় না তাই অনুপম। তাঁরা স্বকীয় অনির্বচনীয় অনুভূতিই প্রকাশ করেন। শ্রীরূপের একটি অনুভূতির কথা বলি—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী জনয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

অর্থাৎ যখন মুখের ভিতরে 'কৃষ্ণ' এই দু'টী বর্ণরূপী নাম নৃত্য করে,—তখন মনে হয় আমার কেন বহু মুখ হ'লনা। যখন তা কর্ণে এসে প্রবেশ করে তখন মনে হয় কেন অর্বুদ কর্ণ পেলাম না। আর যখন অন্তরে এসে তা রস সঞ্চার করে তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ, যারা ভোগ বিলাসের নানা কাণ্ডকারখানার দ্বারা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না তারাও শান্ত হয়। না জানি কি পরিমাণ অমৃতের দ্বারা নির্মিত হয়েছে এই বর্ণদ্বয়-নিষ্পন্ন 'কৃষ্ণ'-নাম-টা। এ অনুভূতি পরীক্ষিত এবং প্রত্যক্ষ সত্য।

শ্রীবলরাম স্বামীজি মহারাজের মত এমন ভগবন্নির্ভর, আত্মনিবেদিত—ভগবানে একান্তভাবে সমর্পিতপ্রাণ কদাচিৎ দেখা যায়। শেষ জীবনে চোখের পীড়ায় যখন অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন তখনও তাঁর এই নির্ভরতা অক্ষুণ্ণ

ছিল। একজন সেই সময় সমবেদনা জানিয়ে বলেন—ভগবান কি নিষ্ঠুর! তিনি আপনার মত সাধুকেও এত কষ্ট দিচ্ছেন। স্বামীজি তাঁকে ভৎর্সনা করলেন। বললেন, ও কথা বোলনা,—তিনি অতি দয়াময়,—তিনি আমার তাল পরিমাণ দুঃখকষ্টকে তিল পরিমাণ করে,—নামমাত্র ভুগিয়ে আমাকে অব্যাহতি দিচ্ছেন। এই যে ভাবনাধারা এর মূলে ছিল ভগবানে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ—সকল বিষয়ের মধ্যে তিনি ভগবৎস্পর্শ ও করুণা অনুভব করতেন এবং এ ছাড়া আর কিছু তিনি ভাবতেই পারতেন না।

ভক্ত কবিরা গেয়েছেন :—

"জানি তুমি মোরে করিবে অমল, যতই অনলে দহিবে,—"

এবং :—"যে রূপে, আসি দাওনা দেখা,

তোমারে নাহি ডরিব হে,—

মরণরূপে আসিলে সখা

চরণ ধরি মরিব হে।"

—স্বামীজি তারই মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন!

ভগবান ভক্তাধীন। 'অহং ভক্তপরাধীনোহস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ; সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ'—ভগবান স্বয়ং বলছেন, সাধুরা ভক্তেরা আমা ছাড়া জানে না, আমিও তাদের অধীন ভক্তি ডোরে বাঁধা। এমন যে সম্পর্ক—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—যারা যেমনভাবে আমায় ভজনা করে আমিও সেই ভাবেই তাদের ভজনা করে থাকি, এ অতি সহজ সরল আপন জনের কথা। সুতরাং ভগবানের প্রতি শ্রীবলরাম স্বামীজির যে অনুরাগ, যে একান্ত অনন্যপরতা তাতে প্রয়াস-প্রসূত কিছু নেই—ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কই যে এই। একজন অপর জনকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। সাধারণ জীবের প্রতিও ভগবান ক্ষমাময় প্রেমময়, তিনি সর্বদা উদ্গ্রীব—কে তাকে কখন ডাকবে এবং তিনি তাকে আপন করে টেনে নেবেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর একটি গানে লিখেছেন—

"কে বলে হরি রাজা, হরি প্রেমের ভিখারী
প্রেমের ভিক্ষা পায়না বলে বক্ষে বহে প্রেমের বারি॥
ভিক্ষের ঝুলি ঝুলিয়ে কাঁধে
দাঁড়িয়ে দ্বারে হরি কাঁদে
হাসিমাখা বদন-চাঁদে বিষাদ রেখা সারি সারি॥
প্রেম না পেলেও কাঁদে, পেলেও কাঁদে
প্রেমেই পাগল প্রেমের হরি॥"

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ দ্বারে দ্বারে এই প্রেম-ই ভিক্ষা করে ফিরেছেন।

যাঁরা ভগবৎপ্রেমে বিভোর হয়েছেন, যে সকল ভক্ত ভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়রসে আনন্দ পান না, তাঁদের সকলের জীবনেই এই ভাব পরিস্ফুট। নানক কবীর মীরাবাঈ—সকলের মুখে একই কথা। বিল্বমঙ্গলের জীবনেও এই কথাই দেখি। বিল্বমঙ্গল বহির্জগৎ বহিরিন্দ্রিয়ের আসক্তি হতে মনকে মুক্ত করে ভগবানের দিকে ফিরাবেন বলে অন্ধ হয়েছেন। বৃন্দাবনে প্রবেশ করবেন তিনি, পথ খুঁজে খুঁজে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। পরম ভক্তের কষ্টে ভগবানও স্থির থাকতে পারলেন না, বালকের বেশে এসে বিল্বমঙ্গলের হাত ধরে বৃন্দাবনের মধ্যে নিরাপদ স্থানে এনে গাছের ছায়ায় বসিয়ে দিলেন, আহারও যোগাড় করে এনে দিলেন। এমনিভাবে ভক্তের প্রেমে ভগবান নিজেই ধরা দিয়েছেন। তারপর যখন বিল্বমঙ্গলের হাত ছাড়িয়ে চলে গেলেন—বিল্বমঙ্গল তখন স্পর্ধা ভরে বললেন—হাত ছাড়িয়ে যাচ্ছ যাও, কিন্তু হে কৃষ্ণ। আমার হৃদয় ছেড়ে যদি যেতে পার তবে বুঝব তোমার পৌরুষ!

"হস্তাবুৎক্ষিপ্য নির্যাসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্?
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

এমনধারা প্রেমের মধুর সম্পর্ক ভারতবর্ষের সাধু ও সন্ত ভক্তদের জীবনেই বেশী দেখা যায় আর কোথাও এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

গুরুবর শ্রীবলরাম মহারাজের স্মৃতিসভায় প্রদত্ত ভাষণ 'উজ্জীবন' চৈত্র ১৩৭৫

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতংকৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মহাভারতকে বলা হয় পঞ্চম বেদ। আরও বলা হয়—'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ' অর্থাৎ সত্য

যখন এক এবং অদ্বয়, তখন সকল সত্যের মধ্যেই সমন্বয় আছে এবং তাহাই স্থাপন করা শাস্ত্রপাঠের মূল উদ্দেশ্য। বেদ, ইতিহাস এবং পুরাণাদির ঋষিগণ সকলেই সত্যদ্রষ্টা, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যে বিরোধ তাহা আপাতবিরোধ মাত্র এবং জ্ঞানিগণ সে বিরোধের সুমীমাংসা করিয়া সকলের মধ্যে যে মৌলিক সাধারণ সত্য তাহাই সিদ্ধান্তস্বরূপে স্থাপনা করেন।

তাই রামায়ণ মহাভারত ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির দ্বারা ঋষিগণ বেদবর্ণিত সিদ্ধান্তকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্ত স্থাপনের দিক দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণের পর বেদ এবং বেদান্ত বাক্যের উপর তাঁহার নূতন আলোক সম্পাতের দিক দিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে ষষ্ঠ বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'যত মত তত পথ'—শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত এই সমন্বয়াত্মক মহাবাক্যেরও মূল উৎস পাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে—

"সব সত্য, নহে মিথ্যা কাহারো বচন
যার যৈছে ভাব সেই হয় সর্বোত্তম॥"

আজকাল বিদ্যা আমাদের মধ্যে অবিদ্যার উদ্রেক করিয়া অহংকার এবং অভিমানকে উন্নত এবং উদ্ধত করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং সে বিদ্যা নয়,—অবিদ্যারই নামান্তর। কারণ 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং'। এই বিনয়ের পরাকাষ্ঠা পাই বৈষ্ণব আচার্যগণের শিক্ষায়। তাই স্বয়ং মহাপ্রভুর প্রধান শিক্ষা—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

বৈষ্ণবেরা গুরু ও গোবিন্দে ভেদ করেন না, শুধু তাই নয়—'যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।' তাই শ্রীচরিতামৃতে প্রতি অধ্যায়ের শেষে পাই—'শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস' এবং সেই রঘুনাথ, যাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'স্বরূপের রঘুনাথ' আখ্যা দেন তাঁর মুখে শুনি—

'আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ পদাম্ভোজরজোঽহং স্যাং ভবে ভবে॥

এই দীনতা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই তাই তাঁহারা বলেন ভক্ত শিষ্যকে—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ।
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে॥
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং।
কল্পকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

এই দৈন্য সহ লৌল্য বা পরম লালসাই ভক্তি লাভের মূল্য। বেদান্ত সূত্রে পাই "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"—শ্রীচরিতামৃতেও সেই একই কথা—

"শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং
গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্ত্যা
চৈতন্যচরিতামৃতম্॥ ৩।১২।১

চৈতন্য চরিত শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি,
মাৎসর্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি।
এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম,
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম॥ ২।৯।৩৬১—২

বলা বাহুল্য ইহা সকল ধর্মের ভক্তগণের প্রতি প্রযোজ্য। যার যৈছে ভাব সেই হয় সর্বোত্তম।" বিষ্ণু অর্থে ভগবান,—এবং বৈষ্ণব সাধনা ভক্তি মার্গে ভগবৎ সাধনা। এবং হরিনাম অর্থে ভগবানের উদ্দেশে যে কোন নাম।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উভয় অর্থেই সার্থকনামা কবিরাজ। এক অর্থে তিনি কবিশ্রেষ্ঠ, অন্য অর্থে তিনি ভবরোগবৈদ্য। তাঁহার মধ্যে জ্ঞান, প্রেম এবং বৈরাগ্যের ত্রিবেণী সঙ্গম সমকালে লক্ষিত হয়। এই অপ্রাকৃত মহাজন মহাকবি সংসারমরু-পথিকের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তিনখানি অমৃতময় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন—'শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত' নামে সংস্কৃত মহাকাব্য, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের 'সারঙ্গরঙ্গদা' নাম্নী সংস্কৃত টীকা এবং সর্বশেষে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গভাষায় লিখিত এই ষষ্ঠ বেদস্বরূপ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। এই গ্রন্থে তিনি অলৌকিক অনন্যসাধারণ মনস্বিতা, অভূতপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বসমূহ এবং শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ উজ্জ্বল মধুর কাব্যরস বিশ্লেষণ, সহজ এবং সুস্পষ্ট ভাষায় পরিবেশিত হইয়াছে। ফলে অতি বড় পণ্ডিত পাঠকেরও মন জ্ঞানভক্তিপূর্ণ আশ্চর্যবিস্ময়রসে পরিপ্লুত হয়।

পূজ্যপাদ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস মহাশয় বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নৈতিক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েরই স্থূল ও সূক্ষ্ম মর্ম—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অশেষ দক্ষতা ও পরম রসজ্ঞতার সহিত সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের হস্তে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় যে কার্য অবলীলাক্রমে সাধিত হইয়াছে তাহা বর্তমান শতাব্দীর উন্নততর ভাষাতেও সরলতররূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। * * *"

কবিত্বের সহিত তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যানকার্যে শ্রীকৃষ্ণদাস যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে নহে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আবহমান ইতিহাসের ক্ষেত্রে জয়স্তম্ভরূপে চিরদিন বিরাজ করিবে।

এই মহাজনের প্রশস্তি রচনা করিবার দুঃসাহসে আমি লিখিয়াছিলাম :—

রসরাজ মহাভাব সিন্ধুজলে ডুবুরির মত
রূপে রসে ভাবাবেশে ভজনের নিমজ্জনে রত,—
সাধনের শ্রেষ্ঠ ধন লভিতেই সঁপিলে অমনি
উন্নত উজ্জ্বল রস অ-পরশ প্রেম-চিন্তামণি।
'না সো রমণ' গানে রামানন্দ কণ্ঠ উঠে কাঁপি
অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব তাই প্রভু ধরে মুখ চাপি।
গম্ভীরায় গৌরচন্দ্র দ্বাদশাব্দ রভসে তন্ময়—
বিরহের দশ দশা অহরহ পরিপূর্ণ রয়।
তপ্ত ইক্ষু বিষামৃতে ভক্তগণে প্রসাদি সন্দেশ,—
তুমি কবিরাজ কবি রসায়ন করিলে বিশেষ।
কৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা, 'সারঙ্গরঙ্গদা' সুধাময়ী
'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত'—'চৈতন্যচরিতামৃত' ত্রয়ী।
ত্রিধারে ত্রিবেণী ঝরে জ্ঞান প্রেম বৈরাগ্য ঝরণা
গৌড়জন করে নতি আরতির দীপ নীরাজনা॥

চৈতন্যচরিতামৃতকে এত উচ্চে স্থান দিবার কারণ এই যে এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অমূল্য রত্নরাজি সঙ্কলিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে যুক্তিসিদ্ধ অনবদ্য সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রীস্বরূপ দামোদর ও মুরারি গুপ্তের কড়চা শ্রীগৌরাঙ্গ

লীলার ব্যাস শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' প্রভৃতিও তিনি মন্থন করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র 'বিন্দু'—'উজ্জ্বল নীলমণি'র 'কিরণ' এবং 'ভাগবতামৃতে'র 'কণা' এই বিন্দু-কিরণ-কণাও তিনি অকৃপণভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্য চরিত' মহাকাব্য, 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত', রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ', 'চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ' প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ ও পদাবলীর পরিচয় তিনি পদে পদে প্রদান করিয়াছেন। অনন্যসাধারণ বিনয়ে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি 'শ্রীবৃন্দাবনদাসের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ' মাত্র করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দাস মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যভাগবত মহাপ্রভুর লীলার পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তাহার উত্তরার্দ্ধ। তত্ত্বে ও তথ্যে, ভজন ও সাধন-রহস্যে' দিব্যোন্মাদের বাগ্‌বৈদগ্ধি ও পরমোৎকৃষ্ট কাব্যরসের পূর্ণচন্দ্র প্রকাশে বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও দর্শনে ইহা এক অতুলনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

আধুনিক ধীমান ও শ্রদ্ধাবান পাঠকদের প্রতি কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। কাহারও কাহারও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা প্রতিষ্ঠায় হয় তো অন্ধভক্তির সঙ্কীর্ণতা আশঙ্কা হইতে পারে। ইহাতে কোনও সঙ্কীর্ণতা নাই। শ্রীভাগবত বলেন—

> বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

ভারতীয় সাধনায় গুরুতত্ত্বও এই একই তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাই "গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ'। চরিতামৃত বলেন—'জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে, শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মোহান্ত স্বরূপে'—। গুরু কে?

> কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়?
> যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।

বৈষ্ণব কে?—

> যাহারে দেখিলে মুখে স্ফুরে কৃষ্ণ নাম
> তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।

কৃষ্ণ কে—কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। সুতরাং গণিতের স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে সবই এক তত্ত্ব, কারণ—'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়াভূতং চরাচরম'

ইহা অপেক্ষা উদার সার্ব্বজনীন তত্ত্ব আর কোনও দেশে প্রচারিত হয় নাই। নাম কি—'নাম্নামকারি বহুধা'। রামপ্রসাদ বলেন—'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে'। এক সময় ছিল বটে যখন নিষ্ঠাকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বলা হইত কিন্তু এখন ভজননিষ্ঠা যে পরিমাণে কমিয়াছে,—মৌখিক উদারতা ও বিশ্বজনীনতাও সেই পরিমাণে বিজ্ঞাপিত হইয়া তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের উন্নাসিকতা বাড়াইয়াছে। অ-উ-ম এই ত্র্যক্ষরের সম্মিলিত প্রণবকে একাক্ষর ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ওঁ তৎ সৎ—ইহার খুব স্থূল অথচ ধ্রুব অর্থ—হাঁ তাই সত্য। তৎ বা তাহা ব্রহ্মের বাচক। যে কোনও শব্দে বা স্বরে তাঁহাকে যাহা নির্দ্দেশ করে তাহাই তাঁহার বাচক ও মন্ত্র। 'সৎ' অর্থে সত্য।

কোরাণের 'ইল ইলাহি ইল্লালাহি'—এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। ভাগবতের—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ"। ১১।২।৩৭ চিন্তাশীল ব্যক্তি একটু নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেই শাস্ত্র এবং মহাজনদের বাক্যের মধ্যে এবং বিভিন্ন ধর্মের উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে সঙ্গতি দেখিতে পাইবেন।

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে। দ্বয়মেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥"—ইহাই আসল কথা; ভাবের ঘরে চুরি অচল যদিও বর্ত্তমান প্রবন্ধের তাহা বিষয় বস্তু নহে। তাই শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর মত বিরাট পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বৈদান্তিকের কথায় প্রবন্ধের উপসংহার করি—

ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকন্তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মনো ধাবতি॥

অথবা—"কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে"। অথবা—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"। ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা শ্রীভগবানের ভগবত্তা উপলব্ধির উৎকৃষ্টতর উপায় বা উপাদান আর কিছুই পাওয়া যায় না।

সমাগত বিদ্বজ্জনগণ ও বৈষ্ণবগণের নিকট করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি,

আমার ধৃষ্টতা যেন তাঁহারা মার্জ্জনা করেন। তাঁহাদের প্রশ্রয় ও করুণাই আমাকে সাহসী করিয়াছে। তাই উপসংহারে বলি—

"শূন্যঞ্চ পূর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যমৃতায়তে
আপৎসম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমাৎ।

পুনরায় প্রণাম করি—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দসহোদিতৌ
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥*

---

* শ্রীশ্রীচরিতামৃত জয়ন্তী দিবসে ১০ই আষাঢ় ১৩৬৬ তারিখে শ্রীঅনঙ্গ মোহন হরিসভায় প্রদত্ত ভাষণ

রবীন্দ্র-প্রতিভার দিগ্‌দর্শন

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বতোমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে নানা বিদগ্ধ ব্যক্তি নানা কথা বলেছেন. বিভিন্ন প্রবন্ধে ও ভাষণে, বিভিন্ন দিক থেকে,—তাঁর সাহিত্য ও ব্যক্তিত্বের সমালোচনা করে। সামগ্রিকভাবে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রবন্ধ বিশদ হয়ে পড়ে, অথচ আংশিকভাবে আলোচনায় একদেশদর্শিতার জন্য ভুল ধারণা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই কথা চিন্তা করে বক্তব্যের ভারসাম্য যথাসাধ্য বজায় রেখে আমি দু-চারটি কথা বলা উচিত মনে করছি।

তাঁকে মহাকবি, বিশ্বকবি, মহামানব, প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি যুগপৎ কবি এবং ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি—আবার কেউ বা কবির নিজের বিনয়বচন উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি ব্রহ্মবিদ্‌ বা মরমিয়া সাধক নন। তিনি তাঁর স্বীকৃতি এবং স্বয়ংকৃত কথিতি অনুসারে—শুধু কবিমাত্র। কেহ এমন কথাও বলেছেন যে, গীতাঞ্জলিতে কবি কাব্য হিসাবে অধোগতির পথে চলেছেন! জানি না সমালোচক হয়ত নিজের মানসিক বিকারবশতঃ উর্দ্ধকেই অধঃ এবং অধো-দিককেই উর্দ্ধ বলে ভ্রম করেছেন, কারণ মহাকাশ সম্পর্কে এগুলি আপেক্ষিক শব্দ মাত্র।

ব্রহ্মবিদ্‌ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেছেন যে—ব্রহ্মতত্ত্ব "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌," তাই উপনিষদে দেখি একজন মুনি-বালক অন্য একজন

মুনি-বালককে দেখে জিজ্ঞাসা করছেন—"ব্রহ্মবিদ্ ইব সৌম্য প্রতিভাসি"—হে সৌম্য, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছ,—ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের আলেখ্যের দিকে চেয়ে আমাদের যা মনে হয়েছে তা তাঁরই ভাষায় বলা যায়, যেন সে এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়।' তাঁর উপলব্ধিমূলক রচনাগুলি পড়েও আমাদের মনে হয়েছে যে, তিনি যুগপৎ—ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষি।

তিনি ব্রহ্মর্ষি, 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর উপাসনায়, এবং 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' তৎস্বরূপ সেই অখণ্ড ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বারা। শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞের যে লক্ষণ আমরা পাই তাতে কবি যে ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন, প্রত্যক্ষ ব্রহ্মোপলব্ধি যে তাঁর হয়েছিল—সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না।

ভূমার আত্যন্তিক সুখস্পর্শ, ব্রহ্মের আনন্দরূপ অমৃতের আস্বাদ তিনি শুধু যে পেয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর মত এমন করে অক্ষরের মাধ্যমে অক্ষর-ব্রহ্মের পরিচয়,—আর কোনো ব্রহ্মবিদ্ কবি, পৌরাণিক যুগের পর অদ্যাপি দিয়ে যেতে পেরেছেন বলে আমরা অবগত নই। তাই তিনি জাতীয় স্তর থেকে অতি সহজেই—সার্বভৌম স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাই তিনি বর্জনের কবি ছিলেন না—ছিলেন গ্রহণের, বা অর্জনের কবি। 'আমি সব নিতে চাই' এবং আপনাকে জগতের সম্মুখে মেলে ধরতে চাই,—এই ছিল তাঁর অন্তরের কথা। এ নেওয়া কার জন্য এবং কিসের জন্য? 'আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব', মেঘের মতই তাঁর জল আহরণ, মেঘের মতই নিঃশেষে বর্ষণ বা বিসর্জন করবার জন্য। তিনি যা কিছু গ্রহণ করেছেন—তা সুদসমেত পরিবেশন করে পরিশোধ করে গেছেন পূর্বসূরীদের ঋণ, তা ছাড়া কে না জানে তাঁর স্বকীয় মৌলিক দান কত অপরিমেয় এবং অপর্যাপ্ত।

সমন্বয়বাদী রবীন্দ্রনাথ

বেদান্তের সূত্রে পাই, 'তত্তু সমন্বয়াৎ' (১।১।৪) রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বয়ং মূর্তিমান সমন্বয়। মানব-সংস্কৃতির সমন্বয় (Synthesis of Culture) এবং ধর্মমতের সমন্বয় (Syncretism of Faith) ছিল তাঁর জগদ্দর্শনের বা জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর বিশ্বভারতী রচনার মূলমন্ত্র। যেখানে Rudyard Kipling বলেছিলেন: "East is East and West is West and ne'er the twain shall meet," অর্থাৎ স্পষ্টাক্ষরে ভাবজগতে

ও সাহিত্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে Apartheid-এর অনতিক্রমণীয় ভেদবাদ প্রচার করেছিলেন—সেখানে অভেদবাদী রবীন্দ্রনাথ "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্", —এই উদার সংকল্পে বিশ্বভারতী রচনা করে গেছেন। এবং "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে", তাঁর মাতৃভূমির মুক্তিস্নানের অভিষেক-ঘট পূর্ণ করে রেখে গিয়েছেন।

জীব এবং ঈশ্বরকে অতি সহজে তিনি তাঁর কাব্যে স্থান বিনিময় করিয়েছেন। 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—এ কথা তাঁর শ্রুতির উদ্ধৃতি মাত্র নয়, এ কথা তাঁর স্বকীয় গভীর উপলব্ধির কথা. তাই তিনি বলতে পেরেছেন—'আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে'; বলেছেন—'তাই তোমার আনন্দ আমার' পর তুমি তাই এসেছ নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে"। তাঁর ঈশ্বর শুধু মহিমান্বিত জগদীশ্বর বা Lord God ন'ন, তিনি দীনবন্ধু এবং প্রতিজীবের দহরাকাশ-নিবাসী ক্ষেত্রজ্ঞ। তাঁর ঈশ্বর যুগপৎ immanent বা সর্বানুস্যূত এবং transcendent বা সর্বাতিগ। 'যস্য জগৎ শরীরম্',—জগৎ যাঁহার শরীর; তাই রবীন্দ্রনাথ শঙ্করের জগৎ-মিথ্যাবাদ বা বিবর্তবাদ গ্রহণ করেন নি। তিনি বৈষ্ণব দর্শনের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং স্রষ্টার লীলাকৈবল্যবাদ গ্রহণ করেছেন. একথা—আমি আমার 'বৈষ্ণব ভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথ' ('প্রবাসী'—মাঘ ১৩৬৩) নামক প্রবন্ধে বিশদ করে বলেছি।

ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লিখিত পত্রে (১৬ই কার্তিক ১৩১৮) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যেমন মেশে, তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে।"

তিনি দেবর্ষি।—যেহেতু দেবর্ষি নারদের মত দেবলোক-নরলোকের মধ্যে অর্থাৎ ভাবজগৎ ও বস্তুজগতের মধ্যে 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা' করেছেন অবলীলাক্রমে। তাই তিনি মন্ত্রোচ্চারণবৎ কবি-সত্যের (Poetic Truth) পরম এবং চরম সত্যটি বলতে পেরেছেন—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি—
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

(ভাষা ও ছন্দ)

তাঁর জৈবসত্তা দীপ্তিমন্ত দেবত্বে উন্নীত মানবসত্তা,—তাঁর কবিচিত্ত ঋষিচেতনার দ্বারা উদ্ভাসিত। তাই তিনি দেবর্ষি।

তিনি রাজর্ষি।—যেহেতু তিনি গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগী। বৈরাগ্য-সাধনের মুক্তি তাঁহার নহে। 'যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ' (১৮।৫ গীতা) তিনি বর্তমানযুগে প্রাক্তনযুগের জনকাদির প্রতীক। তাঁর সেই রূপ আমরা দেখেছি তাঁর জমিদারীতে, তাঁর বিশ্ব ভারতীতে, শ্রীনিকেতনে এবং অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে। তিনি কাব্য, সাহিত্য এবং দর্শনের মধ্যেই ফুরিয়ে যান নি। তিনি ধ্যান ধারণায় সমাহিত হয়েই থাকেন নি,—তিনি নিজের সুখ শান্তি এবং অবসর বিনোদন বিসর্জন দিয়ে নরদেবতার সেবা করেছেন। গীতার 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ'—এই সত্য উপলব্ধি করে, তিনি কর্মের পত্রপুষ্প দ্বারাই কর্ম-প্রেরয়িতা পরব্রহ্মের পূজা করেছেন এবং সে পূজার নির্মাল্যও 'যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ' বলে তৎপ্রীত্যর্থেই বিনিয়োগ করেছেন। তিনি নিঃশেষে নিজের প্রাণ দান করে গেছেন, এবং তাঁর সে দান সাহিত্য দর্শন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভাণ্ডারে অক্ষয়-পদবী লাভ করেছে।

সীমার মাঝে অসীমকে, রূপের মাঝে অরূপ এবং অপরূপকে, ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্তকে এমন করে আর কেউ দেখতে বা দেখাতে পেরেছেন বলে—আমরা জানি না।

'শ্রেয়' এবং 'প্রেয়'—পরস্পর বিরোধী তা আমরা কঠোপনিষদেই পেয়েছি ;

> "শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ।
> তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ॥
> শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে।
> প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।"

অর্থাৎ শ্রেয় আর প্রেয় মানুষকে আশ্রয় করে। ধীর ব্যক্তি বিচার করিয়া ইহাদের পৃথক্ বলিয়া জানেন। জ্ঞানী প্রেয় ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি আপাত মনোরম প্রেয়কেই বরণ করেন। কিন্তু এই আপাত বিরোধী বস্তুদ্বয়কে তিনি মিলিয়েছেন। যদিও তার মিলনসূত্রেও সেই উপনিষদ থেকেই তিনি আবিষ্কার করেছেন। উপনিষদে 'প্রিয়' বলেই ব্রহ্মকে উপাসনা করবার উপদেশ আছে।

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ,
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

আত্মা সকল হতে প্রিয় এবং অন্তরতর। তাই 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি'র পথ ছেড়ে তিনি ঐ প্রিয় আত্মার 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' মুক্তির স্বাদ লাভের জন্য অনুরাগের পথেরই পথিক হয়েছেন। দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবতা করার মন্ত্র তিনি, বৈষ্ণব পদাবলীর পন্থায়, তাঁর কাব্যের মাধ্যমে প্রচার করেছেন। চির-সুন্দরের পথেই, প্রিয়মিলনার্থী হয়ে তিনি শ্রীমতীরাধার মতই অভিসারিণী হয়েছেন,—মানস লোকে—ভাবময় দেহে।

তিনি তাঁর সাকার নিরাকার উপাসনা প্রবন্ধে নিরাকার উপাসনার উপর অধিক যুক্তিমত্তা প্রদর্শন করেও স্বীকার করেছেন যে নিরাকার ব্রহ্ম ভক্তিতে জমে জলের মত সান্দ্রঘন রূপ পরিগ্রহ করেন এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামপ্রসাদের নাম উল্লেখ করে তাঁদের উপাসনার পন্থা সমর্থন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবিধ সাধনা ও বহুধর্মমতের সমন্বয় সম্বন্ধেও তিনি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছেন তাঁকে—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।"

যুক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ

"যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং" এই তাঁর আদর্শ ছিল এবং যুক্তি বিচার অবলম্বন করে নিজেকে সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। কারণ,

'যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।'

তাই তিনি বেদান্তের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শঙ্করের বিবর্তবাদ বা জগৎ-স্বপ্নবাদ গ্রহণ করেন নি।

তিনি বুদ্ধদেবের নীতি শান্তি অহিংসা ও প্রেম গ্রহণ করেছিলেন। সর্বভূতে সমান মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠান বা 'ব্রহ্ম বিহার' গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর অক্রোধ, অহিংসা, দয়া, ক্ষমা ও প্রেমের সাধনা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের জটিল হেঁয়ালি ও শূন্যবাদের মধ্যে যেতে চাননি।

ভক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ

তিনি বৈষ্ণব-দর্শনের রাগমার্গের পদাবলী প্রদর্শিত প্রেমভক্তি গ্রহণ

করেছিলেন—কিন্তু তার মূর্তিপূজা ও ভাবোন্মত্ততা গ্রহণ করেন নি। তাঁর গীতাঞ্জলি ও ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রভৃতি পাঠে মনে হয় যে তাঁর উপাস্য—তাঁর দয়িত—কবিজনোচিত আদর্শে সাবয়ব কিন্তু নিরাকার। তাঁর বাঁশি থাকতে পারে—অসি থাকতে পারে— সর্ব অবয়বে সকল কিছু ভূষণ থাকতেও পারে,—কিন্তু তাঁর ইয়ত্তা নাই, এতাবত্তা নাই, কোনও বিশেষ আকারও নাই। গোবিন্দ বিগ্রহের বিগ্রহত্ব বর্জন করে ব্রহ্মসংহিতার ভাষায় বলা যায়—

"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দ চিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।"

তাঁর দেবতা এবং দেবালয় সবই প্রেম দিয়ে গড়া, তাই তিনি প্রতিবাদ করে বলেন—

"ভগবান্ চান প্রেম দিয়ে তাঁর গড়া হবে দেবালয়
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে ইট পাথরের জয়।"

রবীন্দ্র প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনো কবির রচনা যুগপৎ 'আনন্দ বেদনারসে' এত সমুচ্ছল' এবং সমুদ্রের মত সমুদ্বেল ও তরঙ্গায়িত হতে আমরা দেখিনি। জ্ঞান, প্রেম এবং কর্মের এমন সমন্বয় এবং এমন সুসমঞ্জস সর্বতোমুখী প্রকাশ-মুখর প্রতিভাও ইতিপূর্বে আর দেখিনি। ইংরাজ কবি বলেছেন :—'A true poet must be a true poem,—' রবীন্দ্রনাথ আকৃতি এবং প্রকৃতিতে যেন একটি অনির্বচনীয় অনিন্দ্যসুন্দর ছন্দোবদ্ধ কবিতা। তাঁর বাক্যে কাব্যে সাহিত্যে সঙ্গীতে কোথাও কোনও অ-সুর অসচ্ছন্দ নেই। তিনি প্রার্থনা করে ছিলেন—"আমারে কর তোমার বীণা,—সুরভারতী তাঁর সে প্রার্থনা পূর্ণ করে, একটি একটি করে পুরাণো তার খুলে, তাঁর সেতারখানি নূতন করে বেঁধে তুলেছেন।

তিনি একদিকে যেমন সর্বাঙ্গসুন্দর কবি—অন্যদিকে তেমনি তিনি পরিবেশন করেছেন সর্বতোভদ্র রস—অশেষ কল্যাণময়, অসীম তাৎপর্যময় এবং অগাধ আনন্দময় রস।

তিনি অশুচি কথনো উচ্চারণ করেন নি এবং পাপকে কথনও প্রশ্রয় দেন নি। নর-নারীর যৌন প্রেম সম্বন্ধে তিনি অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ তত্ত্বদর্শিতার

পরিচয় দিয়েছেন—বলেছেন—“প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়—লোভের কাছে স্থূল মাংস।” বলেছেন “আসক্তি তাকে (প্রেমের বস্তুকে) সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে, তার পরে তোলা ফুলের মত অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়।” তাই “রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী—রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত—সেইখানেই তাঁর সত্য প্রকাশ।”

তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভাকে আমরা যুগপৎ বহ্নি-ভানু-শশি-সন্নিভ' বলে অভিনন্দন করতে পারি। বহ্নির মত তিনি অন্যায়কে পাপকে অপবিত্রতাকে দগ্ধ করেন, সূর্যের মত তিনি অজ্ঞান এবং কুসংস্কারের অন্ধকারকে দূর করেন এবং চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ কৌমুদী বিকিরণ করে তিনি আমাদের অন্তরকে আনন্দে আহ্লাদে পরিপ্লুত করেন।

তাঁর বিশ্বতোমুখী প্রতিভায় প্রভাবিত এবং তাঁর আলোকে উদ্ভাসিত আমাদের চিন্তাজগৎ, ভাবজগৎ, সাহিত্যজগৎ এবং সঙ্গীতজগৎ, বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব, ভারতবর্ষের শীর্ষে কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যোদয়ের মত। তাঁর প্রতিভা বহু উত্তুঙ্গ শিখর সমন্বিত, শুভ্রতুষার কিরীটী নগাধিরাজ হিমালয়ের মত। তার বিকাশ যেমন বিশ্বতোমুখী, উচ্চতাও তেমনি আকাশস্পর্ধী।

তিনি অজস্র রূপ ও রীতি, নব নব আঙ্গিক ও প্রকাশ ভঙ্গী নিয়ে বাংলার সাহিত্যগগনে যুগস্রষ্টির নূতন সূর্যের রূপে সমুদিত হলেন এবং অশীতি বর্ষ ধরে তাঁর প্রতিভার সহস্রাংশু ভূগোলের উভয় গোলার্ধে বিকীর্ণ করলেন—সমান ভাবে, অকৃপণ হৃদয়ে এবং অম্লান জ্যোতিতে। তাঁর এই আনন্দ এবং অমৃত, আলোক এবং পুলক পরিবেশনের প্রসঙ্গে তাঁরই কবিতা মনে পড়ে—যেন :—

চঞ্চল পুলকরাশি কোন স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্মে আসি লাগে!

প্রকৃতপক্ষে বাংলার সাহিত্যাকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যেন আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশ্বরূপ দর্শন করি—মনে হয় “দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।” বাংলা সাহিত্যের সমস্ত দিক্ তাঁর দক্ষিণ হস্তের দানে, তাঁর সারস্বত সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ।

Dryden, Shakespeare সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন যে—সেক্সপীয়র ছিলেন—

A man, so various and versatile—that he seemed to be not one man but all mankind's epitome."

এই উভয় উক্তিই রবীন্দ্রনাথে পরম সার্থকতা লাভ করেছে।

মিলনের কবি রবীন্দ্রনাথ

তিনি যুগন্ধর পুরুষ, জনগণের পথপ্রদর্শক নেতা, নিয়ন্তা এবং নায়ক। স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গদেশকে তিনি রাখীবন্ধন দ্বারা একতাবদ্ধ করেছেন। তিনি জাতির কণ্ঠে তাঁর জনগণ-মনের ছন্দে ছন্দিত এবং মহতী আশা ও আকাঙ্ক্ষার হৃৎস্পন্দনে স্পন্দিত জাতীয় সঙ্গীত দান করতে পেরেছেন। তিনি যে শুধু পশ্চিমের ভেদবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন তাই নয়—তাঁর অপরিসীম অধ্যবসায় ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন বলিষ্ঠ সাধনার বলে—ভেদবাদী পরাক্রমশালী পাশ্চাত্ত্যের ব্যাঘ্রকেও অভেদবাদী শান্তিকামী প্রাচ্যের—বলীবর্দকে (অর্থাৎ কিপ্লিং কথিত 'West' এবং 'East'কে) তাঁর বিশ্বভারতীর সার্বভৌম সম্মিলনে একত্র করে—এক ঘাটে জল খাইয়েছিলেন—তাঁর ভারততীর্থের 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।

প্রেমের এবং আনন্দের অবাধ আদান-প্রদানের মিলন মন্ত্র তিনি গান করেছেন, তাই বলতে পেরেছেন 'পুরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা।' সেখানে উদার আতিথ্যে সকলেই আমন্ত্রিত—'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।'

কবির যাদু ও কাব্যের ইন্দ্রজাল

কাব্যকলালক্ষ্মী কবির লেখনীতে তাঁর সোনার কাঠিটি ছুইয়ে দিয়েছেন, যার স্পর্শে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের শুষ্ক কাষ্ঠ, তার ইন্দ্রজাল-বলে,—ফলে ফুলে, স্বাদে ও সৌরভে, সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ রূপে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। যার সুষমায় আনন্দিত এবং মুগ্ধ হয়ে, ভট্টি কাব্যের ভাষায় স্বতঃ বলে উঠতে হয়—

ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্ যদলীনষট্পদম্।
ন ষট্পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং
ন গুঞ্জনং তন্ন জহার যন্মনঃ ॥

অর্থাৎ এমন কোন বিষয় ছিল না যাকে তিনি তাঁর সূর্যালোকে পঙ্কজের মত ফুটিয়ে তোলেন নি, এমন প্রস্ফুটিত পদ্ম ছিল না যাতে ভ্রমর এসে বসে নি, এমন ভ্রমর ছিল না যে, আনন্দে তার স্তুতিগানে গুঞ্জরণ করে নি এবং এমন ভাবে তারা গুঞ্জরণ করে নি যাতে শ্রোতা মাত্রেই মুগ্ধ না হয়।

রাজসভা বহিঃপ্রান্তে কাব্যলক্ষ্মীর স্বেচ্ছাবন্দী দাস হয়ে—তাঁর নিভৃত প্রসাধনে :—

"প্রতিসন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল, চরণ-অঙ্গুলি প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া নিয়া,—"

যে পুরস্কার কবি মানসলোকে লাভ করেছেন—তাই তাঁর কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ লাভ এবং রসসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা, 'নোবেল-পারিতোষিকে'র সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ

মানবতার (Humanism) আদর্শে তিনি এতই বড়, মানবত্বের মধ্যে দেবত্বকে তিনি এতই সত্য করে পেয়েছেন যে, তিনি সহজেই বিনয়ে এবং দৈন্যে দীনের হতেও দীন হতে পেরেছেন। তাঁর ভগবান্‌কেও তিনি টেনে এনেছেন দীনের সঙ্গী দীনবন্ধু রূপে :

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে—সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।"

নিজে নির্বাচন করে নিয়েছেন 'স্বর্গভূমি' ব'লে—সেই ধূলাময় ভূমিকেই, বলেছেন—

"বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধূলাময় যে ভূমি,
সেই ত স্বর্গভূমি—
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি,
ওগো সেই ত আমার তুমি।"

তাঁর অন্তর ছিল আন্তর্জাতিক উপাদানে গঠিত এবং তাঁর প্রকৃতি বিশ্বমৈত্রীর রসে অভিষিক্ত। বিরোধ ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি ছিলেন মিলনের এবং সংগঠনের কবি, সমন্বয় এবং সমাহারের কবি। তিনি সর্বজনীন—সর্বভূতানুভূতিসম্পন্ন সার্বভৌমপ্রেমের দরদী কবি,—তাই তিনি বিশ্বকবি। সব ঠাঁই তাঁর ঘর, সব ঘরে তাঁর পরমাত্মীয়, সব জাতিই তার স্বজাতি, এবং একজন্মেই তিনি দেশ-দেশান্তরে গিয়ে বহুজন্মের সাধ মিটিয়ে নিয়েছেন। তিনি দ্বাদশবার পৃথিবী পর্যটন করেছেন।

ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়ে বৃহৎকে, অল্পের ভিতর দিয়ে ভূমাকে পাবার আকুলতা নিয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পর তারই গতিবেগ এবং মিলনের পিপাসা নিয়ে মহাসাগর সঙ্গমে ছুটে চলেছেন, বলেছেন—

"আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

তিনি যুগপৎ ব্যষ্টি-নরের কবি এবং সমষ্টি-নারায়ণের কবি, তাই

"হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে
উদারছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।"

ব'লে, বেদব্যাসের মত একই সঙ্গে 'নর-নারায়ণ' এবং 'নরোত্তম'কে বন্দনা করেছেন।

'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্'—মহাভারতের এই ব্যাসোক্ত মানব-বন্দনার যে অর্থ আমার মনে প্রতিভাত হয়েছে তা এই। ইহাতে 'নর'-অর্থে বুঝি সকল সাধারণ নরনারী। 'নারায়ণ' অর্থে (নর + ফায়ন) নরস্যাপত্যং বা সেই নরনারীর পুত্র কন্যা রূপ ভবন্ এবং ভাবী বংশধরগণ' এবং 'নরস্তোম' অর্থে গীতার পুরুষোত্তম (=Ideal Man বা Best Man) বা শ্রীভগবান্ যিনি বাইবেলের মতে মানুষকে নিজের মত করে সৃষ্টি করেছেন, "God made Man in His own image,—in His own image did He make Man."

আমাদের পুরুষোত্তমবাদই অন্যধর্মের ঈশ্বরবাদ। এ ছাড়াও আমরা ঈশ্বরকে বা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপেও দেখি। ব্রহ্মরূপে তিনি সর্বব্যাপী 'সর্বানুভূঃ' এবং পরমাত্মারূপে প্রাণশক্তিমান সকল জীবাত্মার সমষ্টি, "ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"—(গীতা)।

ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্ যদলীনষট্‌পদম্।
ন ষট্‌পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং
ন গুঞ্জনং তন্ন জহার যন্মনঃ॥

অর্থাৎ এমন কোন বিষয় ছিল না যাকে তিনি তাঁর সূর্যালোকে পঙ্কজের মত ফুটিয়ে তোলেন নি, এমন প্রস্ফুটিত পদ্ম ছিল না যাতে ভ্রমর এসে বসে নি, এমন ভ্রমর ছিল না যে, আনন্দে তার স্তুতিগানে গুঞ্জরণ করে নি এবং এমন ভাবে তারা গুঞ্জরণ করে নি যাতে শ্রোতা মাত্রেই মুগ্ধ না হয়।

রাজসভা বহিঃপ্রান্তে কাব্যলক্ষ্মীর স্বেচ্ছাবন্দী দাস হয়ে—তাঁর নিভৃত প্রসাধনে :—

"প্রতিসন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল, চরণ-অঙ্গুলি প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া নিয়া,—"

যে পুরস্কার কবি মানসলোকে লাভ করেছেন—তাই তাঁর কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ লাভ এবং রসসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা, 'নোবেল-পারিতোষিকে'র সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ

মানবতার (Humanism) আদর্শে তিনি এতই বড়, মানবত্বের মধ্যে দেবত্বকে তিনি এতই সত্য করে পেয়েছেন যে, তিনি সহজেই বিনয়ে এবং দৈন্যে দীনের হতেও দীন হতে পেরেছেন। তাঁর ভগবান্‌কেও তিনি টেনে এনেছেন দীনের সঙ্গী দীনবন্ধু রূপে :

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে—সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।"

নিজে নির্বাচন করে নিয়েছেন 'স্বর্গভূমি' ব'লে—সেই ধূলাময় ভূমিকেই, বলেছেন—

"বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধূলাময় যে ভূমি,
সেই ত স্বর্গভূমি—
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি,
ওগো সেই ত আমার তুমি।"

তাঁর অন্তর ছিল আন্তর্জাতিক উপাদানে গঠিত এবং তাঁর প্রকৃতি বিশ্বমৈত্রীর রসে অভিষিক্ত। বিরোধ ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি ছিলেন মিলনের এবং সংগঠনের কবি, সমন্বয় এবং সমাহারের কবি। তিনি সর্বজনীন—সর্বভূতানুভূতিসম্পন্ন সার্বভৌমপ্রেমের দরদী কবি,—তাই তিনি বিশ্বকবি। সব ঠাঁই তাঁর ঘর, সব ঘরে তাঁর পরমাত্মীয়, সব জাতিই তাঁর স্বজাতি, এবং একজন্মেই তিনি দেশ-দেশান্তরে গিয়ে বহুজন্মের সাধ মিটিয়ে নিয়েছেন। তিনি দ্বাদশবার পৃথিবী পর্যটন করেছেন।

ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়ে বৃহৎকে, অল্পের ভিতর দিয়ে ভূমাকে পাবার আকুলতা নিয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পর তারই গতিবেগ এবং মিলনের পিপাসা নিয়ে মহাসাগর সঙ্গমে ছুটে চলেছেন, বলেছেন—

"আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

তিনি যুগপৎ ব্যষ্টি-নরের কবি এবং সমষ্টি-নারায়ণের কবি, তাই

"হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে
উদারছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।"

ব'লে, বেদব্যাসের মত একই সঙ্গে 'নর-নারায়ণ' এবং 'নরোত্তম'কে বন্দনা করেছেন।

'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্'—মহাভারতের এই ব্যাসোক্ত মানব-বন্দনার যে অর্থ আমার মনে প্রতিভাত হয়েছে তা এই। ইহাতে 'নর'-অর্থে বুঝি সকল সাধারণ নরনারী। 'নারায়ণ' অর্থে (নর + ষ্ফায়ন্) নরস্যাপত্যং বা সেই নরনারীর পুত্র কন্যা রূপ ভবন্ এবং ভাবী বংশধরগণ' এবং 'নরত্তোম' অর্থে গীতার পুরুষোত্তম (=Ideal Man বা Best Man) বা শ্রীভগবান্ যিনি বাইবেলের মতে মানুষকে নিজের মত করে সৃষ্টি করেছেন, "God made Man in His own image,—in His own image did He make Man."

আমাদের পুরুষোত্তমবাদই অন্যধর্মের ঈশ্বরবাদ। এ ছাড়াও আমরা ঈশ্বরকে বা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপেও দেখি। ব্রহ্মরূপে তিনি সর্বব্যাপী 'সর্বানুভূ:' এবং পরমাত্মারূপে প্রাণশক্তিমান সকল জীবাত্মার সমষ্টি, "ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"—(গীতা)।

জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ .

কূপমণ্ডুকের মত অহংসর্বস্ব আত্মম্ভরি এবং আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদ (aggressive Nationalism বা Jingoism) তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। অথচ তিনি স্বদেশপ্রেমে প্রথমত: জাতীয় কবি, পরে সার্বভৌমপ্রেমে আন্তর্জাতিক কবি বলে পরিচিত হন। তিনি বলেন, "পশ্চিমদিকের উপর আড়ি করলেই যে পূর্বদিকটাকে বেশী পাওয়া যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, বরঞ্চ ঠিক এর উল্টো।"

রবীন্দ্রনাথ মানবতার সাম্যবাদের উপর নূতন সমন্বয়বাদের ভিত্তি স্থাপন করেন, এবং তাহা পরমহংসদেবের—'যত মত তত পথ'-রূপ ধর্ম-সমন্বয়ের উদার মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। তবে পরমহংসদেবের ভিত্তি আধ্যাত্মিক ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি মানবতার সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 'মানুষের ধর্ম'। তাহারই উপর তিনি নিখিল নর-নারীর মিলনতীর্থ রচনার পরিকল্পনা করেন তাঁর 'ভারততীর্থে'।

মহিম্নস্তোত্রের ভাষায় বলা যায়, 'নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব' অর্থাৎ সকল নরনারীর একমাত্র গম্য তুমিই, যেমন সকল তটিনীর গম্যস্থান একই মহাসমুদ্র। তাই এ-তীর্থ সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর। মহাভারতের, তথা মহামানবের, এবং সেজন্য মহাসাগরের মতই সকল প্রবাহের মিলন-তীর্থ।

বিশ্বপ্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

তিনি 'বহুরূপ-জ্যোতির্ময়মান-স্বরূপা' বিশ্বপ্রকৃতির কুল-পুরোহিত এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁর 'প্রকাশ' কবিতায় তিনি প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য নিপুণভাবে করেছেন উদ্ঘাটন এবং পরে অসংখ্য কবিতায় বিচিত্ররূপে তা প্রকাশ করে গেছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছেন—'অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে'। তৃপ্তি এবং তৃষ্ণা, আনন্দ এবং বেদনার স্বর্গীয় আকৃতি রূপ পরমা অতৃপ্তি (divine discontent) তাঁকে নিত্য নব নব সৃষ্টির প্রেরণা ও প্রারিপ্সুতা দান করেছে, তাঁর প্রতিভাকে দেহের বয়সের অনুপাতে স্থবির হতে দেয় নি, তাঁর কাব্যপ্রতিভা তাঁর উর্বশীর মতই অনন্ত-যৌবনা হয়ে থাকতে পেরেছে।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

আমাদের সমাজে নারীর স্থান, মান এবং মর্যাদার কথা চিন্তা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে নারীকে সহমরণের চিতাগ্নি থেকে রক্ষা করেছেন রাজা রামমোহন। তাকে বাল-বৈধব্যের তুষাগ্নির তিলে তিলে দহন থেকে রক্ষা করেছেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু তার পরেও নারী প্রাণে বেঁচে থাকলেও সমাজ-শরীরে যেন অহল্যার মত পাষাণ-প্রতিমা হয়ে বেঁচেই ছিল মাত্র। তার দেহে সচেতন স্পর্শ-কাতরতা সঞ্চার করলেন— আশার স্বপ্ন দেখালেন এবং স্বাধীনতা দান করে, আনন্দের খোরাক জোগালেন—যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর নারীর চিত্রে পাই :

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী,
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।"—(মানসী)

তিনি কবি এবং স্রষ্টা হয়ে তাকে 'সোনার উপমা' দিয়ে 'নূতন মহিমা' দিয়ে 'বর্ণ'-'গন্ধ'-'ভূষণ'-দিয়ে, 'সিন্ধু হতে মুক্তা' এবং 'খনি হতে সোনা' দিয়ে 'লজ্জা দিয়ে সজ্জা দিয়ে'—'আবরণ' এবং আভরণ দিয়ে এই মর্মর প্রতিমায় নূতন প্রাণ এবং নূতন চৈতন্য সঞ্চার করেছেন—যার ফলে দেখতে পাই :

"পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।"

এই কল্পনা সমাজের বিভিন্ন স্তরে বাস্তব রূপ লাভ করেছে, কবির সঞ্চারিত শক্তিতে বাঁচার মত বেঁচে থাকবা" এবং বাঁচিয়ে তোলব' প্ত বাসনায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ন্যাকড়ার পোঁটলার মত নারীকে,—আগে" ং স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'সবলা' কবিতায় নারীকে তিনি সবলার রূপ দিয়েছেন। অবলা এবং সরলা নারীকে সাধনার পথ দেখিয়ে বলেছেন—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা ?"

তার মুখ দিয়ে বলেছেন :

"আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্র-বীণা।

উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে, নির্বারিত স্রোতে !
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয় ।"

তিনি 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে'—গড়ে তুলেছেন তাঁর 'মানসী প্রতিমা'কে। তাই আজ 'নারী' সমাজ-জীবনের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে গৌরবময় অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে,—স্বকীয় শিক্ষায় ও সাধনায়, যোগ্যতায় ও মর্যাদায় আপন শক্তি, নিষ্ঠা ও কর্ম তৎপরতার পরিচয় দান করে।

প্রেমের কবিতায় কবির উত্তরলিঙ্গত্ব

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা সম্পর্কে এবং সাহিত্যে তাঁর যৌন মনোভাব সম্পর্কে ফ্রয়েডের কামবাদ বা libido theory-র আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক।

নরের যে নারীর প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি-প্রবণতা বা প্রেম (কান্তা প্রেম) এবং নারীর যে নরের প্রতি তদনুরূপ আকর্ষণ বা প্রেম (কান্ত প্রেম), যাকে বৈষ্ণব দার্শনিকরা মধুর রস বা আদি রস বলে ধরেছেন, তাকেই ফ্রয়েডও সর্বরসের মূল রস বলে ধরেছেন। বৈষ্ণব দার্শনিকরা ফ্রয়েডের বহু শতাব্দী পূর্বে প্রেমের পাঁচটি প্রকার বা স্তরভেদ বর্ণনা করেছেন যথা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। আরও বলেছেন যে "আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার। অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥" এ থেকে দেখা যাবে যে ফ্রয়েডের চার শত বৎসরে পূর্ব্বে চৈতন্য-চরিতামৃতে এই মধুর রসতত্ত্ব অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারও বহু শত বৎসর পূর্বে আমরা ব্রহ্মসংহিতায় পাই :

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫ অ ৫১॥

অর্থাৎ আনন্দচিন্ময়রসস্বরূপতা হেতু, যিনি প্রাণীদিগের মনে প্রতিফলিত

হয়ে, স্মরভাব বা কামভাব ধারণ করে, প্রতিপ্রাণীর মনে কামভাব দ্বারা সর্বদা সকল ভুবন জয় করছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এ থেকে দেখা যাবে, এই কামতত্ত্ব ও পুরুষ-প্রকৃতি মিলিত অর্ধনারীশ্বরতত্ত্ব ভারতবর্ষে প্রাচীনতম কাল থেকেই পরিচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রমণী' কবিতায় লিখেছেন: "যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক—আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ, * * * হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে, চিত্ত ভরি, দিলে সেই রহস্য-আভাসে।"

এর গোড়ার কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই—

"স একাকী নৈব রেমে।"

তাই দেবী-ভাগবত বলেন—

"যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্ধাঙ্গং বামার্ধং প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥"

৯ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়।

ফ্রয়েড প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরা নিতান্তই সাম্প্রতিক। একথা স্বয়ং ফ্রয়েডকেও শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলে এসেছেন। (পশ্চিমের যাত্রী পৃঃ ০ দ্রষ্টব্য।)

ভারতের ঋষিদের সঙ্গে ফ্রয়েডের পার্থক্য এই যে ভারত এই তত্ত্বকেই উৎকৃষ্টতম আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত করেছেন।

পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে এই কামবৃত্তি (libido) নিবেদন করে, তার ঊর্ধ্বপাতন (sublimation) সাধন করে, তাকে প্রেমে পরিণত করে, তদ্দ্বারা রাগমার্গের সাধকেরা মরমী সাধনা বা mysticism-এর পথে অগ্রসর হন। কিন্তু ফ্রয়েড তাঁর অদূরদর্শী মনন চিন্তনের দ্বারা, চোখ বুজলে শুধু অন্ধকার ব্যতীত আর কোন তত্ত্বই উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে মৃত্যুর অর্থ জীবনদীপের নির্বাণ এবং তাতেই জীবনজীবনের একান্ত পরিসমাপ্তি

বৈষ্ণব সাধকগণ, রবীন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, প্রভৃতি পরবর্তী মরমী সাধকগণ, তথা খ্রীশ্চান মিষ্টিক ও মুসলিম সুফী সাধকগণ সকলেই প্রায় একই পথের পথিক। নারদ ভক্তিসূত্রেও পাই—"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ং তস্মিন্নেব করণীয়ম্",—অর্থাৎ মনের এবং মানসিক বৃত্তিসমূহের মোড় ফিরিয়ে কামক্রোধাভিমানাদি সকল বৃত্তিকেই ভগবন্মুখী করতে হবে, তাহলেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

সকল আনন্দ সকল মাধুর্যই তাঁর—তাই শ্রুতি তাঁকে বলেছেন "মধুব্রহ্ম"। এই সাধনার মূল কথাটি বৈরাগ্য সাধনা নয়, সবকিছু থেকে বিরক্ত হয়ে ঈশ্বরে অনুরক্ত হওয়া নয়, সকল কিছু সংসারের ভোগ্যবস্তুর আসক্তির মধ্যে ঈশ্বরের মাধুর্য অনুভব ক'রে ঈশ্বরানুরাগের পুষ্টিসাধন করা এবং তাঁকে নিবেদন করে প্রসাদ পাওয়া,—ঈশোপনিষদ্ যাকে বলেছেন—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"প্রদীপের মত, সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।"

ব্রাউনিং ও বলেছেন—

"Where pleasure is, there is God."

যৌন আসক্তিকে ঈশ্বরের প্রতি পরমাসক্তিতে পরিণত করার জন্যই ভক্তেরা প্রার্থনা করেন—

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা
সা প্রীতির্ভবতান্নাথ ত্বয়ি জন্মনি জন্মনি।

যৌনমানস সম্বন্ধে রবীন্দ্রকাব্যে আরও কিছু বলবার আছে। তাঁর কবি-প্রতিভা উভয়লিঙ্গ (hermaphrodite) অর্থাৎ যুগপৎ স্ত্রীভাব এবং পুরুষভাবে ভাবিত হয়ে ঠিক তত্তদ্ভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার সমান শক্তি বা সামর্থ্য রাখে। যখন তিনি নারীর প্রতি 'পুরুষের উক্তি'কে রূপ দিয়েছেন তখন যেমন দেখা যায় তিনি ষোল আনা পুরুষত্বের অধিকারী, তেমনি যখন অপরপক্ষে তিনি পুরুষের প্রতি নারীর উক্তিকে রূপ দিয়েছেন তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে নারীত্বসত্তায় সাযুজ্য লাভ করেছেন। তাঁর 'বধূ', 'ব্যক্তপ্রেম', 'গুপ্তপ্রেম', 'দুর্বোধ' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায় এই প্রমাণের সার্থক নিদর্শন মেলে: এই উভয় লিঙ্গত্ব রবীন্দ্র-প্রতিভার এক বিস্ময়কর বিশেষত্ব।

এ বিষয়ে কবি নিজেও সচেতন। তাঁর 'বাঁশরি' নাটকে বাঁশরীর মুখ দিয়েই তিনি বলিয়েছেন যে প্রত্যেক মহৎ শিল্পী পৌরুষের ও নারীত্বের

সংমিশ্রণ। সে নিছক স্ত্রীপুরুষের চেয়ে পূর্ণতর জীব। প্রত্যেক মহৎ শিল্পী অর্ধনারীশ্বর।

গীতাঞ্জলিতে তাঁর ঈশ্বর "রসঘন আনন্দ স্বরূপ"—Supremest Delight, Dulce Amore বা Sweetest Love. "এই রস হতেই রাস শব্দ যেখানে রসের, প্রেমের প্রমূর্তি (acme)"—(হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)

'স এষ রসানাং রসতমঃ'—(ছান্দোগ্য ১।১।২-৩)

এই প্রেমলীলায় ভগবান্ 'রমণ'—ভক্ত 'রমণী'। ভগবান-'পিতম্' বা প্রিয়তম। সুফিদিগের ভাষায় ভক্ত আসিক্ (Lover) এবং ভগবান্ মাসুক (Beloved), 'মাসুকের' সহিত 'আসিক্' এর 'আশনাই' বা প্রেম করাই আমাদের চরম বা পরম পুরুষার্থ। খ্রীশ্চান মিষ্টিক কার্ডিন্যাল এফ. ডব্লিউ নিউম্যান বলেছেন—

'If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness it must become woman,—yes, however manly you may be among men'. রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—"আমার মাঝারে রয়েছে কেগো সে কোন্ বিরহিণী নারী"।

সেজন্য ঠাকুর নরোত্তম দাস বলেছেন—'ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব'। কারণ এই প্রেমরাজ্যে শ্রীভগবান্ একাই পুরুষ, বাকী সব প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি ভাব প্রাপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ পূর্ণার্থেই প্রকৃতিস্থ হয়েছেন বলা যেতে পারে। নিজের অন্তরের বিরহিণী'র সঙ্গে তাঁর প্রশ্নোত্তর শুনুন—

"কহিলাম তারে তুমি চাও কারে ওগো বিরহিণী নারী,
সে কহিল আমি যারে চাই তার নাম না কহিতে পারি।"

মনোহারিণী নায়িকা

তাঁর আর একটি অদ্ভুত সৃষ্টি তাঁর মনোহারিণী নায়িকা। এই বিদেশিনী মধুর-হাসিনী একান্ত রহস্যময়ী নারী,—জীবনের সংশয়ময় পরিবেশে আশার মতই স্বপ্নময়ী ইঙ্গিতময়ী এবং অস্পষ্টভাষিণী। দিক্চক্রবালের মত সে দূর থেকে প্রলুব্ধ করে, হাতছানি দেয় এবং তাকে অনুসরণ করলে মায়াবিনী হাস্যেলাস্যে নানা বিলাস প্রকাশ করে,—"Tempts from far, but as I follow flies!"

কাব্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব

কবি কাব্যলক্ষ্মীর পথ চেয়ে ছিলেন—কবে কোন ফাল্গুনে, তাঁর 'কনকাঞ্চল আবরণ' ও 'নবচম্পক আভরণে' সজ্জিত হয়ে আসবার প্রতীক্ষায় কিন্তু তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব হয়েছে 'জলভরা বরষায়'। এমনি হয়ে থাকে, আশাতীত আকাঙ্ক্ষাকে শুধু আশার আহ্বানে,—প্রতীক্ষার মূল্যেই পাওয়া যায় না। শ্রুতিবাক্য বদ্‌লে নিয়ে যদি বলা যেত—"যমেবৈষা বৃণুতে তেন লভ্যা" —তাহলে হয়ত কিছুটা ঠিক বলা হ'ত। এই আবির্ভাবের উপলব্ধির কথা মহাকবির নিজের ভাষাতেই বলা ভাল,—

"দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়,
সে ছাড়া সে কেহ বুঝে না কভু।"

এই 'দৈব' আর কিছুই নয় দৈবী ইচ্ছামাত্র।

শিশুসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শিশুদের প্রসঙ্গে মহাকবির অনন্ত প্রশ্রয়। বাইবেল শিশুদের জন্য স্বর্গরাজ্যের দ্বার অবারিত রেখেছেন। মহাকবি নিজেই চিরশিশু তাই বলেছেন—

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পরে দৃষ্টি চান কেন?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
আমি সবার একবয়সী জেনো।"

শিশুদের জন্য তাঁর দ্বারও সর্বদা অপাবৃত। পরম এবং চরম জ্ঞানলাভ করে আমাদের দেশের পরমহংসকল্প জ্ঞানিগণ দ্বিতীয় শৈশবকে আশ্রয় করেন। ইহা তাঁহাদের বালক ভাব। তাঁরা বলেন—'জ্ঞানে ব্রহ্মের পাই না সীমা, বুদ্ধি করে যায় না জানা'—অর্থাৎ 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', তাই শ্রুতি বলেন—

"তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ"

অর্থাৎ পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করে বাল্যভাবে থাকবে।

বৃহঃ ৩।৫।১

শিশুর খেলা ধূলাবালি নিয়ে, তুচ্ছ তৃণ নিয়ে। মহাকবিরও দেখি "তুচ্ছের 'পরে তৃষিত দৃষ্টি।" তাই তাঁর লেখায় পাই—

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন,—
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে 'ভাল আছো ভাই'!

অথবা—

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করে বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু,—
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

তিনি বলেন, প্রবীণ এবং প্রধানের দল থেকে খেলার ওস্তাদ তাঁকে ছুটি দিয়েছেন—তিনি মাটির তলে, ছোটদের দলে, ছেলেদের দলে, স্বেচ্ছায় ভর্তি হয়েছেন। বলেছেন—"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,—তবু শিশির টুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।" তিনি শিশুর কাছে শিশু হয়েই ধরা দিয়েছেন। তাঁর 'জন্মকথা' কবিতাটিতে বাৎসল্য রসের কচি করপুটে,—মধুর রসের বৃহৎ রসাল ফলটি,—অতি কৌশলে এবং অসামান্য প্রতিভাবলে মানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন এবং এই প্রকার সমাধান আর কোনও কবির প্রতিভায় সম্ভব হয় নি।

রবীন্দ্রকাব্য শাশ্বতিক

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য শাশ্বত কালের—কবি কীট্‌স্-এর ভাষায়:

"A thing of Beauty is a joy for ever
Its loveliness increases, it will never
Pass into nothingness"—(Endymion)

'পড়া পুঁথিসম' অথবা দ্বিতীয় বার বলা গল্পের মত (like a twice told tale) রবীন্দ্রনাথের কাব্য নীরস হবার নয়, ফুরোবার নয়—

"নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।"

মাটির কুটিরে রবীন্দ্রনাথ

তিনি নিজে যত বড়, যত মহৎ ছিলেন, ঠিক তত সহজেই তিনি ছোটদের সঙ্গে, শিশুদের সঙ্গে, এমন কি নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক বাউল ও সাঁওতাল প্রভৃতিদের সঙ্গে মিশতে পারতেন একান্ত সরল মনে এবং অবাধে। তিনি লিখেছেন :—

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি রহেন তফাতে।

এ কথা তাঁর নিজের সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং সার্থক। তিনি ইদানীং অট্টালিকা বর্জন করে মাটির কুটিরে থাকতে ভালবাসতেন। শান্তিনিকেতনের 'উত্তরায়ণ' অট্টালিকা বিশেষ। তার উত্তর দিকে একটি ছোট মাটির বাড়ী, তার নাম শ্যামলী ; তার ছাদ শুদ্ধ মাটির, এই মাটির কুটিরে তিনি বহুদিন ছিলেন পরম আনন্দে। তিনি এর সম্বন্ধেই লিখেছেন :—

"আমার শেষবেলাকার ঘরখানি, বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে, তার নাম দেবো শ্যামলী, ও যখন পড়বে ভেঙে সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,—মাটির কোলে মিশবে মাটি।" তিনি মাটিকে ভালবাসতেন, তাই বলেছেন : "হে পৃথিবী দিও তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে।"

শ্যামলীর কথা তুললাম এই প্রসঙ্গে যে, তিনি যেমন 'মহতো মহীয়ান্' ছিলেন তেমনি অপর দিকে নিজেকে 'অণোরণীয়ান্' এবং তৃণাদপি সুনীচ মনে করতে পারতেন ; তাই তিনি বলেছেন :—

ধূলির ধূলি আমি এসেছি ধূলি 'পরে,
জেনেছি ভাই ব'লে জগৎ চরাচরে।

জীবন-দেবতা

তাঁর 'জীবন-দেবতাকে', তাঁর অন্তরের ভাবধারার প্রেরয়িতাকে তিনি সব সময়ে মনে মনে এবং চোখে চোখে রেখেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত শক্তিই তাঁর গান করবার 'গায়ত্রী' শক্তি এবং ধ্যান করবার সাবিত্রী শক্তি—তিনি বুদ্ধিবৃত্তির

প্রচোদয়িতা বা প্রেরয়িতা একথা তিনি নানাভাবে নানা প্রবন্ধে নিবন্ধে বলে গেছেন তাঁর পিতৃদেব কর্তৃক গায়ত্রী দীক্ষার পর, তাঁর ব্রহ্মোপলব্ধির পর থেকেই। 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লিপ্ত'—তাঁর উদ্দেশেই তিনি বলেছেন :

হে চিরপুরাণো চিরকাল মোরে গড়িছ নূতন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর, রবে চিরদিন ধরিয়া।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি

তিনি বিশ্বকবি যেহেতু তিনি সমগ্র পৃথিবীর বৃহত্তর মানব-পরিবারের সকল সুখ-দুঃখের স্পন্দন, নিজের অন্তরের রেডিও যন্ত্রের তরঙ্গ প্রভাবে জানতে বুঝতে এবং সর্বান্তঃকরণে অনুভব করতে পারতেন, তাই বলেছেন :

"মনে হয় যেন জানি
সেই অকথিত বাণী
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।"

তাই তিনি বলতে পেরেছেন :

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার উঠে যত ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে অমনি।"

রবীন্দ্রনাথের চক্ষে মৃত্যু

সব্যসাচীর মত তিনি সাহিত্যের বহু কঠিন লক্ষ্য বহুবার ভেদ করেছেন কিন্তু তাঁর শেষ-'মার' ওস্তাদের 'মার',—দেখি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের পরিণয়ে। 'ধূসর গোধূলি লগ্নে' এবং 'জন্মদিনে' এমন কি ভানুসিংহের পদে মরণের সঙ্গে শ্যামের তুলনায় তার আভাস পাওয়া যায়। বরবধূর মত হয়েছে এদের উভয়ের মিলন :—

"আজ আসিয়াছে কাছে,
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা সম
একমন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।"

অথবা :—

"ধূসর গোধূলি-লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা, চিনিলাম তখনি দোঁহে,
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক বরের চরমদান মরণের বধূ—
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তরের পানে।"

ত্রিধারার সমন্বয়

রবীন্দ্রনাথ একাধারে পর্যবেক্ষণকারী বৈজ্ঞানিক, চিন্তাশীল মনস্বী, ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ বৈদান্তিক অথচ তাঁর ভিতরের সমগ্র মানুষটি ধূলির আসনে বসে ভূমাকে ধ্যান-চোখে দেখবার জন্য একান্ত লালায়িত।

এ যেন পবিত্র বিল্বপত্রের মত তিনটি বিভিন্নমুখী পাতা একই বৃন্তে এসে মিলিত হয়েছে, জ্ঞান প্রেম এবং কর্মের ত্রিধারা যেন মিলিত হয়েছে এক পুণ্যময় ত্রিবেণীসঙ্গমে। তাঁর মহীয়সী প্রতিভার ইন্দ্রজাল পাঠকের চিত্তকে স্পর্শমাত্রেই অভিনব সৃষ্টির মাধুর্যরসে নিষিক্ত করে।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

আজকাল একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, অমুক সাহিত্যিক বা কবি নাকি রবীন্দ্র-প্রভাবান্বিত এবং অমুক সাহিত্যিক বা কবি নাকি রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত। এই প্রসঙ্গে আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিক মাত্রই রবীন্দ্র-প্রভাবান্বিত, কেউ বেশী কেউ কম। সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন, "তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার, নমস্কার তাঁরে নমস্কার"। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসের ভোগবতী অলকানন্দা এবং মন্দাকিনী ধারায় যে সাহিত্যিক অবগাহন-স্নান করেছেন, যিনি সে ধারা যতটুকু পান করেছেন তিনি সেই পরিমাণে চরিতার্থ এবং ধন্য হয়েছেন।

বিদ্যা যাঁকে বিনয়রূপ অলঙ্কারে ভূষিত করেছে, এবং বিবেক যাঁকে কপটতাবর্জিত করেছে, তিনি নম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতার সহিত মহাকবির প্রভাব স্বীকার করেন। অবিদ্যা যাঁর চিত্তকে অহমিকায় আধ্মাত এবং উদ্ধত করেছে, তিনি কৃতঘ্নতাবশতঃ তা অস্বীকার করে আত্ম-প্রবঞ্চনা করেন মাত্র।

পূর্বেই বলেছি যে, রবি-প্রতিভায় প্রভাবিত আলোকিত এবং উদ্ভাসিত আমাদের চিন্তাজগৎ, ভাবজগৎ, কল্পনাজগৎ এবং সঙ্গীতজগৎ। এই কথা যেন

আমরা চিন্তা করি এবং শ্রদ্ধার সহিত উপলব্ধি করি। তা হলে যা আমরা অহঙ্কারের অন্ধতায় আজও পাই নি বলে বঞ্চিত আছি, তা অকপটে স্বীকার করে নিতে এবং পেতে পারব এবং পেয়ে ধন্য হতে পারব। নইলে কবির অন্তরের যে পরম আকুতি—"গ্রহণ করেছো যত ঋণী তত করেছো আমায়"—বলে আমাদের অন্তরের দ্বারে করাঘাত করে ফিরছে,—'অত্যন্ত ঘুর পথে দেশের লোকের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশের অবারিত অধিকার লাভ করা গেল',—বলে অভিমান প্রকাশ করছে,—তাকে উপেক্ষা করে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ফলে আমরা তো ব্যর্থ হবই, মহাকবির দানসাগরের রস-পরিবেশনও সম্পূর্ণ সার্থক হবে না।

শরৎচন্দ্র. অমল হোমকে লিখেছিলেন (সামতা বেড়, ২৮শে পৌষ ১৩৩৮) "আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই। আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু বলে। আমার চাইতে কেউ বেশী মক্সো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস,— তাঁর 'চোখের বালি', তাঁর 'গোরা', তার 'গল্পগুচ্ছ'। আজকের দিনে যে এতলোক আমার লেখা প'ড়ে ভাল বলে,—সে তাঁরি জন্য।" এত বড় সাহিত্যিকের মুখে এমন অকপট উদার উক্তি,—গুরুশিষ্য উভয়ের প্রতি আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত করে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত এবং ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মহীয়সী কবি সরোজিনী নাইডুর ভাষায় "Rabindranath is Time's contribution to Eternity." এই মহাজীবন তার উভয় শতাব্দীর সাধনার দানে মহাকালের করকমলে চিরদিন সাদরে বিধৃত হ'য়ে থাকবে।

প্রবাসী ভাদ্র ১৩৬৮

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন

'কান্তকবি'—রজনীকান্ত সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি পুণ্যোজ্জ্বল মহিমান্বিত নাম। তিনি একাধারে কবি, সুরকার, গায়ক, সাহিত্যরসিক এবং পরম ভাগবত সাধক ও ভক্ত ছিলেন।

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই লর্ড কার্জন আইন প্রণয়ন ক'রে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেন। সে আঘাত, অপমান এবং অত্যাচার বাংলার জনগণ নীরবে সহ্য করেনি। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলশ্রেণীর লোক একজোট হয়ে উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সে সময় আনন্দমঠের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধনের সূত্র—'বাঙ্গালীর

প্রাণ, বাঙালীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, এক হউক হে ভগবান!' এবং কান্তকবির গানের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা :—

আজকে মোরা মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই
(আমরা) পরের জিনিস কিনবো না যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।"

তখন বাংলার নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে সকলের মুখে মুখে ধ্বনিত হ'য়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করছিল।

১২৭২ বঙ্গাব্দের ১২ই শ্রাবণ (ইং ২৬শে জুলাই ১৮৬৫) বুধবার সকালে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ভাঙাবাড়ী গ্রামে বৈদ্যবংশে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে রজনীকান্তের জন্ম হয়। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন মুনসেফ ছিলেন পরে সাবজজ হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত, ফার্সি ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর নিষ্ঠাবতী আদর্শ সহধর্মিণী মনমোহিনী দেবী ছিলেন রজনীকান্তের মাতা।

রজনীকান্তের পিতা সুকবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কবি তাঁর কাছ থেকেই কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রেরণা ও উৎসাহ পান। কান্তকবির মানসক্ষেত্র সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ উর্বর ছিল এবং সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অসাধারণ অনুরক্তি ছিল। পিতা গুরুপ্রসাদ এবং জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দপ্রসাদ উভয়েই সুররসিক এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কোনো বিশেষ রাগরাগিণী তিনি মন দিয়ে একবার শুনলে তা আর ভুলতেন না এবং প্রায় শ্রুতিধরের মত তা গেয়ে শোনাতে পারতেন।

পাবনায় নিবাস হলেও রাজসাহীতেই তিনি শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের কর্মক্ষেত্রও রাজসাহীতে। বোয়ালিয়া স্কুলে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। কুচবিহার জেন্‌কিন্স্ স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাস করেন ১৮৮২ খৃঃএ দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১০৲ বৃত্তি পান। এবং রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় স্কুলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, ইংরাজী প্রবন্ধ রচনায় প্রতিযোগিতায় মাসিক ৫৲ প্রমথনাথ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৫ খৃঃতে তিনি সিটি কলেজ থেকে ফার্স্ট আর্ট্‌স্ পাস করেন। ১৮৮৭ খৃঃতে বি. এ. এবং ১৮৯১ খৃঃতে বি. এল. পাস করেন। তিনি যেমন মেধাবী ছিলেন তেমনি নিজের পাঠ্য বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন, তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর কবিমন, পাঠ্যবিষয়ের সীমার মধ্যে বাধ্যতামূলক বন্দিত্ব স্বীকার করতে নারাজ ছিল।

পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত, মনের মতো ইংরাজী বাংলা কবিতা, গান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনে সহজেই ডুবে থাকতে চাইতো।

রাজসাহীতে পিতা ছিলেন সাবজজ, জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন খ্যাতনামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, তাই তিনি ওকালতির জন্য রাজসাহীকেই নির্বাচন করেন। এখানেই ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সাহিত্যিক জলধর সেন, এবং কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং কালক্রমে তা নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

ওকালতিতে তিনি মন দিতে পারেন নি। তিনি সাহিত্য চর্চা ও সঙ্গীতের মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে এবং একান্ত তন্ময় হয়ে থাকতেন। ১৮৯২ খৃঃতে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন মুন্সেফের কাজও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিমন আইনের জটিলতার মধ্যে যেন—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে হাঁপিয়ে উঠত।

তিনি একটি পত্রে লেখেন—"আমি আইন ব্যবসায়ী কিন্তু আমি আইন ব্যবসা করিতে পারি নাই…আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ করিতে পারে নাই… আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম, আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল।"

তার উপর তিনি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন তাই ওকালতি তাঁর কোনো ক্রমেই মনঃপুত হয়নি। তাঁর ডায়েরির এক পাতায় তিনি লিখেছেন :—

"সত্যপথে থেকে ওকালতি করা বড় কঠিন হয়েছে। এতে টাকার লোভ এতই হবে যে, সত্যাসত্য বিচার ক্ষমতা blunt হ'য়ে যাবে, heart callous হ'য়ে যাবে। তখন টাকা হ'তে পারে—অর্থ হতে পারে, কিন্তু তার পায়ে পরমার্থটি রেখে তবে হবে!" এরূপ সত্যানুরাগ, আদর্শানুরাগ,—এ যুগের কথা ছেড়ে দিলেও,—সে যুগেও অতি বিরল ছিল।

তিনি উন্নতচরিত্র, তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ, দেশভক্ত ও ভগবদ্ভক্ত এবং অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

এই নির্লোভ, নিঃস্বার্থ, আদর্শ নিষ্ঠার জন্য তিনি জীবনে, অর্থকৃচ্ছ্রতা অনেকবার অনেক প্রকারে ভোগ এবং সহ্য করেছেন কিন্তু তা ব'লে অর্থের জন্য কখনও মাথা হেঁট করেননি। মিথ্যার সঙ্গেও কখনও আপস করেননি।

তাঁর জীবৎকাল মাত্র ৪৫ বৎসর (১৮৬৫—১৯১০ খৃঃ)। কিন্তু এই অল্পকালীন জীবনে এবং অল্প সংখ্যক রচনার দ্বারা তিনি তাঁর দেশবাসীর

পরম শ্রদ্ধা, সম্মান এবং প্রীতির পাত্র হয়েছেন এবং স্বাধীনতার ইতিহাসে শাশ্বত আসন লাভ করেছেন।

আইন পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তাঁর প্রথম কবিতা 'আশা' তৎকালীন 'আশালতা' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'উৎসাহ' নামে আর একটি কাগজেও তাঁর আরও কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। পয়ার রচনাতেই কবির কবিতা লেখায় হাতে-খড়ি হয়। তিনি সংস্কৃত খুব ভালবাসতেন এবং সেজন্য কতকগুলি সুভাষিত সংস্কৃত শ্লোক সে সময় বাংলা কবিতায় অনুবাদও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ কারণ তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে স্বরচিত গানগুলি: তরুণ বয়সে তিনি দুর্দান্ত, চঞ্চল এবং কিয়ৎ পরিমাণে উদ্ধত ছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অমায়িক মধুর শান্তচরিত্র হাস্যকৌতুকপ্রিয় পরিহাস-রসিক আসর-জমানো মানুষ হয়ে ওঠেন।

স্বরচিত সঙ্গীতের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যখন তিনি অবাধে অক্লান্ত অবিশ্রান্তভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান ক'রে যেতেন তখন সকলেই তাঁর ভাবে ভাবিত, মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়তেন। তাঁর অন্তর্নিহিত পরিহাসরসিকতা তাঁহার হাসির গানে অপরূপ রূপ নিয়েছে এবং তাঁকে ও তাঁর এই অনবদ্য রচনাগুলিকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছে সর্বকালের জন্য।

তখনকার দিন হিসেবে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে,—এণ্ট্রান্স পাসের পরই তাঁর বিবাহ হয়।

ঢাকা মাণিকগঞ্জ নিবাসী, স্কুল বিভাগের ডেপুটি ইন্স্‌পেকটার তারানাথ সেনের কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীকেই তিনিই পত্নীরূপে লাভ করেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে তাঁর পারিবারিক জীবন সুখে এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল।

কান্তকবির জীবনের সঙ্গে রাজসাহীর বহু স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। তাঁর জনপ্রিয়তার জন্য শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তাঁকে 'রাজসাহী শহরের উৎসবরাজ' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আনন্দের উচ্ছ্বাসে এবং প্রাণপ্রাচুর্যে নিকটবর্তী সকল লোককে মশ্‌গুল এবং ভরপুর ক'রে রাখতেন। আলাপে আত্মীয়তায় হাস্যপরিহাসে তাঁর সঙ্গে ও সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যেত তা কেউ বুঝতেও পারত না।

লোকে যেন যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে থাকত।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিবৃত করেছেন—তা থেকেই তাঁর অসীম মনোরঞ্জন শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজসাহী থেকে দামুকদিয়া ঘাট পর্যন্ত ষ্টীমার সার্ভিসে কান্তকবি মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। গ্রীষ্মকালে নদীর চড়ায় প্রায়ই ষ্টীমার আটকে যেতো, এবং সেই অবস্থায় যাত্রীদের সারারাত আটকে পড়ে অসীম দুর্দশা ভোগ করতে হ'ত। সৌভাগ্যক্রমে কবি রজনীকান্ত যেদিন যে ষ্টীমারে থাকতেন, সেদিন যেন সেই ষ্টীমারে রাত্রিবাস রূপ নরকযন্ত্রণা একেবারে স্বর্গবাসের সঙ্গে তুলনীয় হত। সমস্ত রাত্রি ধরে এক আনন্দের মহা-মহোৎসব চলত। তিনি গল্পের, কবিতার ও গানের পরিবেশনে সে মজলিসে আনন্দের বন্যা এনে দিতেন। তাই থেকেই তাঁকে 'রাজসাহীর উৎসবরাজ' নাম দেওয়া সার্থক হয়েছে।

রজনীকান্তের কবিতা ও গানগুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: প্রথম ভগবদ্‌ভক্তিমূলক, দ্বিতীয় দেশাত্মবোধক, তৃতীয় নীতিমূলক সংস্কৃত সুভাষিত শ্লোকের অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের কণিকার মতো ছোট ছোট কবিতা এবং চতুর্থ, —হাসির গান।

কান্তকবি, রবীন্দ্র সমসাময়িক রবীন্দ্রভক্ত কবিগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। তাঁর ভগবদ্‌ভক্তির কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হলেও তার নিজস্ব সুরে এবং রীতিতে তার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলির মূলে আছে তাঁর ঈশ্বরে পরমানুরাগ—বা 'পরানুরক্তিরীশ্বরে।'

কালের গতি দ্রুত এবং নদীর মতো বাঁকা, তাই যুগে যুগে সে মোড় ঘুরে ঘুরে সাপের মতো বক্র গতিতে চলেছে। তাই এক যুগের রুচি এবং সেই রুচির অনুমোদিত কবিতা পরের যুগে ঠিক তেমন ভাবে অনুমোদিত না হতে পারে। তবে কতকগুলি রসোত্তীর্ণ কবিতা আছে, যেগুলি শাশ্বতিক অর্থাৎ, সবকালের. সেগুলি লৌকিক ভাষায় 'পুরানো চাউল' এবং 'ভাতে বাড়ে।' তারা Keatsএর ভাষায় 'Joy for ever'। কান্তকবির তেমনি ভক্তিমূলক কতকগুলি গান চিরকালের মতো প্রার্থনা সঙ্গীতরূপে দেবতার দেউলে এবং প্রত্যেক ভক্তের অন্তর মন্দিরে স্থান পেয়েছে। সেগুলির ভাষা এবং ভাব সহজ সরল বলিষ্ঠ এবং সুস্পষ্ট। সেগুলি আত্ম-সমর্পণ, শরণাগতি, আত্ম-নিবেদন প্রভৃতি ভক্ত-হৃদয়ের অপূর্ব অভূতপূর্ব ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে যেন স্তোত্রের মতো রূপ নিয়েছে। এগুলি ভক্তি-সাহিত্যের অমোঘ রসায়ন ভবদাবদগ্ধ জীবের তপ্ত প্রাণ শীতল করবার জন্য অফুরন্ত অমৃতরসে নিষিক্ত হয়ে আছে।

এ রচনাগুলি অল্প হলেও অতুলনীয়। লৌকিক 'তৌলে' এই অলৌকিক সম্পদগুলি ওজন করা বা তার মূল্যমান নির্ণয় করা কোন মতেই চলে না। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করি :—

'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে,
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে।'

আজও এই গান,—এই প্রার্থনা সঙ্গীত আমাদের 'মলিন মর্ম মুছাতে' এবং 'মোহ কালিমা ঘুচাতে' ঔষধের মতই কাজ কচ্ছে। গানের ভাষা অতি অকপট—আর্তি এবং আকুতি ও আন্তরিক আকুলতাপূর্ণ। তাঁর গানের ভাষায় যেমন স্বচ্ছন্দ ছন্দ-কুশলতা এবং নির্বাচন পারিপাট্য আছে, সুরেও তেমনি অধিকাংশ সঙ্গীতেই প্রচলিত রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—ভৈরবী, গৌরী, সোহিনী, পরজ, ইমন কল্যাণ, দরবারী কানাড়া, সিন্ধু, কাফি সিন্ধু, বেহাগ, বিভাস, বারোয়াঁ, ভৈরোঁ বা প্রভাতী, আলাহিয়া, সুরট মল্লার, হাম্বীর, টোড়ী, বসন্ত বাহার, নট, বেহাগ, কালেংড়া, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, ভূপালী, রৈণী, (লাউনি), মূলতান। এছাড়া বাউল সুর, কীর্তন সুর, রামপ্রসাদী সুর ইত্যাদি জনপ্রিয় সুরেও তিনি অনেক গান রচনা করেছেন।

আমাদের নিত্যকার জীবন-যুদ্ধে যে সমস্ত সংশয়, ভয় বিষাদ, বিরহ, সন্তাপ সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়—যে-যুদ্ধে অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়—কান্তকবি তাঁর বৈদ্যকের থলি থেকে যেন তার উপর বিশল্যকরণী লেপন করে আমাদের সকল ব্যথা জুড়িয়ে দেবার জন্যই পারঙ্গম চিকিৎসকের দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। নিজের জীবনেও তিনি দুঃখকষ্ট কম পাননি, না হলে—'চিরসুখী জন' হ'লে কি তিনি এই 'ব্যথিত বেদন' বুঝতে পারতেন ? তাঁর পুত্র-বিয়োগে যখন সকলের অন্তর যেন বজ্র নিষ্পীড়নের মতো মুচড়ে মুচড়ে উঠছে তখন তিনি নিজেকে এবং সেই বিয়োগবেদনাকে একান্ত ভাবে নিবেদন ক'রে দিলেন ভগবচ্চরণে 'তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ' রূপ রবীন্দ্রনাথের মন্ত্র দীক্ষায়। ঐ বেদনারই প্রকাশ হয়েছে তাঁর অপরূপ সঙ্গীতে :—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।

তোমারি দু নয়নে তোমারি শোক-বারি
তোমারি ব্যাকুলতা তোমারি হা-হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি তোমারি কেড়ে নেওয়া
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে
তোমারি সান্ত্বনা শীতল সৌরভ।
তোমারি সকলি গো আমিও তোমারি তো
জানিয়ে জানে না এ মোহহত চিত
আমারি বলে কেন ভ্রান্তি হল হেন
ভাঙো এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব।"

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বলেছেন—"দ্বৈতাদ্বৈতানুভূতির এমন স্বচ্ছ প্রকাশ বাংলা গানে বড় বেশী নাই। যেন এক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি সরল সহজ ভাষায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। * * রজনীকান্ত অনেক গানেই সুরের উপর নির্ভর করিয়াছেন, কথার সৌষ্ঠব বা মাধুর্য সম্বন্ধে তত চিন্তা করেন নাই। কিন্তু রজনীকান্তের অজস্র গানের মধ্যে যে কয়টা সার্থক ভক্তি সঙ্গীত হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার মূল ভাব ভক্তহৃদয়ের দ্বৈতাদ্বৈতবোধ। এই ভাবের এক মহৎ প্রকাশ রজনীকান্তের গানে পাওয়া যায়:—

"কবে তোমাতে হয়ে রব আমার আমি-হারা
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা
এ দেহ শিহরিবে ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক স্পন্দনে।"

রজনীকান্তের গানের বড় অংশটাই ভক্তির আত্মনিবেদনের বা প্রার্থনার। এই প্রার্থনা বিশেষ কোন চিহ্নিত ধর্ম সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ছাপমারা নয়। ইহা Universal Prayerএর মতো,—শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর সকল ভাবই তিনি 'তদর্পিতাখিলাচার' হ'য়ে তাঁকে অর্পণ করেছেন। অথচ এই সকল গানে ধর্মীয় ঘটনার কোনো ছাপ পড়ে নাই। ভাবটা এইরূপ—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব।

শ্রীশিশিরকুমার দাস লিখেছেন :—"রজনীকান্ত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন ন'ন। ** কিন্তু তার জন্য তাঁর দুঃখ ছিল না। কারণ তিনি শুধু কবি নন, তিনি ভক্ত। ভক্ত নিবেদন করছেন ভগবানকে। গানের ডালি সাজিয়ে দিয়েছেন দেবতাকে।"

যাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে জীবনের মায়া মোহ নশ্বরত্ব ধরা পড়েছে তাঁর কাছে দেশ এবং দেশপ্রেম এত সত্য এত নিত্য হল কেমন করে? এর উত্তরে শিশিরকুমার বলেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে দেশ প্রেমের যে উদ্বোধন হ'য়েছিল তার স্বরূপ ছিল ইউরোপীয় দেশপ্রেম থেকে ভিন্ন। ঋষি বঙ্কিম থেকে তার সূচনা। দেশপ্রেম আমাদের দেশ-ভক্তদের কাছে ঈশ্বর সাধনার একটি সোপান মাত্র। আমরা 'দেশ'কে 'মা' বলি, 'মা'কে ঈশ্বর বলি, ঈশ্বরকে মা বলি। দেশই দেবী—'বন্দেমাতরম্'-এ যে-মাতার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে তিনি দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী তিন শক্তির সম্মিলিত রূপ। দশ বাহু তাঁর দশ দিকে প্রসারিত রয়েছে। "রজনীকান্তও এই সহজ সমীকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর বাণীর উদ্বোধন সঙ্গীত তাই 'জাগো সুমঙ্গলময়ী মা'—মাতৃরূপা ভারতবর্ষের; তাঁর দেশ-বন্দনা কবিতাগুলির পরেই—'মা' এর বন্দন'—যাঁর 'স্নেহ-বিহ্বল করুণা ছল-ছল' আঁখি আমাদের শিয়রে সদা জাগ্রত রয়েছে।

"চরণ ধূলি মাথে আশিস হাথে মাথে
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে—"

তাই নিরাশ্রয় শিশুর মতো প্রণাম করেন কবি-
"নমো নমো নমঃ জননি দেবি মম
অচলা মতি পদে মাগি রে।"

আমাদের ঋষিরা যাঁকে প্রণাম করেছেন—"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্"- কান্তকবিও ঠিক তাকেই উপলব্ধি ক'রে তারই প্রতিধ্বনি করেছেন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গানটীতে—

"আছ অনলে অনিলে চিরনভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে
আছ বিটপিলতায় জলদেরি গায়—
শশিতারকায় তপনে।"

রবীন্দ্রনাথও এই দৃষ্টিতে দেশের মাটিতে মাথা ঠেকাতে গিয়ে বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা উপলব্ধি করেছেন। এই উপলব্ধি একান্ত সাত্ত্বিক এবং প্রেমভিত্তিক।

'বন্দেমাতরম্' এই মাতৃশক্তির ও দেশশক্তির রূপক সমন্বয় মন্ত্রটি বুঝতে না পেরে অনেকে তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা কল্পনা করেছেন। দেশ যে মৃন্ময়ী মাত্র নয়, তা'র চিন্ময়ী সত্তা যে প্রকৃত মাতৃসত্তা তা-ই আমাদের দেশ-মাতৃকার ধ্যানের মূল কথা। এ বিষয়ে বঙ্কিম, রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল কান্ত কবি এমন কি নজরুল পর্যন্ত কেউ ভুল করেন নি।

পরম ভাগবত শ্রীদিলীপকুমার রায় বলেছেন :—

"পিতৃদেবকে তিনি গুরুদেব বলতেন, বিশেষ করে পিতৃদেবের 'হাসির গান' তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল 'হাসির গান' রচনায়। * * রজনীকান্ত নানা কারণে, বিশেষ ক'রে অর্থাভাবে পড়ার দরুন তাঁর সহজাত শক্তিকে আবাদ করতে পারেন নি আরও নিখাদ সোনা ফলাতে, কিন্তু তবু তিনি দাগ রেখে গেছেন—আমাদের সাহিত্যে,—অল্প বয়সেই বৈ কি,—এ কৃতিত্ব সামান্য নয়।"

রামপ্রসাদ অভিমান ক'রে গেয়েছেন—

"মায়ের এমনি বিচার বটে—
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে, তার কপালে বিপদ ঘটে॥"

কান্তকবিরও এই বিপদ ঘটেছিল এবং এই কঠিন বিপদে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি অতি অপূর্ব এবং সেটির ভাব নিয়ে আমি যে কবিতাটি লিখেছি তা আমার "রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী গ্রন্থে" প্রকাশিত হয়েছে।

দিলীপকুমার বলেছেন, আমার পিতৃদেব তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন, দেখে এসে চোখের জল ফেলেছিলেন,—আজও মনে আছে—বলেছিলেন 'ওরে এ ঘোর কলিতেও ভক্ত জন্মায় রে—যা দেখে এলাম তা দেখবার মতো,—তা কালে ভদ্রে চোখে পড়ে, ঐ দারুণ রোগ কিন্তু মুখে কী নির্মল হাসি রে! কথা বলার শক্তি নেই, কিন্তু প্রণাম করলে তেমনি, প্রসন্ন মুখে। করুণা যার কাছে সত্য নয়, সে এ পারে না রে পারে না! * * এমন ভক্তের গুরু হওয়া তো ভাগ্যের কথা রে? যে অসহ্য যন্ত্রণায় নির্বাক হয়েও গান বাঁধে :—

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছো গর্ব করিতে চুর
যত বাধা ছিল সবায়ে দয়াল করেছো দীন আতুর।

* * ক'জনের গানে জগন্মাতার ডাক বেজে ওঠে এমন প্রাণকাড়া সুরে :—

'কোলের ছেলে ধুলা ঝেড়ে কোলে নে তুলে
ফেলিস্ নে মা ধুলা কাদা মেখেছি বলে।
সারা দিনটা ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা
(এখন) মনে হল মায়ের কথা নয়নের জলে'।

এই শিশুসুলভভাব সহজ নয়। * * কান্ত কবির—'আমি জানি তুমি আমারি দেবতা, তাই আমি হৃদে বরিহে, ** ভক্তিকে বহু লালন করলে তবেই সে—* * 'অহং'কে পুড়িয়ে ফেলতে পারে,—আর তখন,—বলতে পারে—'আমি দেখি বা না দেখি,—বুঝি বা না বুঝি সতত শিয়রে জাগো'। (কান্ত কবির 'কল্যাণী')। * * শুধু তাঁ'কে (ভগবানকে) চাওয়া নয়, আর কিছুই না চাওয়া,—এরই নাম অনন্যা ভক্তি। এই শরণাপত্তি সাধনাকেই বরণ করেছিলেন কান্ত কবি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন—"যদি দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের হৃদয়-তন্ত্রীতে,—কাহারও সঙ্গীত অত্যধিক পরিমাণে ক্রিয়া করিয়া থাকে তবে তাহা কবি রজনীকান্তের"।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছেন :—"কান্ত কবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'—নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সঙ্গীত সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গানটি গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্র প্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুলবাগানে প্রাতঃসূর্যের মৃদুকিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে।

যে-গান দেববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং তারই মতো সফল, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে,—নিয়তির বিধান আছে,—সে অশ্রু পুরুষের—বিলাসিনীর নহে।"

তাঁর হিন্দু মুসলমানের 'মিলন' গানটিও মর্মস্পর্শী :—'আয় ছুটে আয় হিন্দু মুসলমান ঐ দেখ ঝরছে মায়ের দু-নয়ান। আজ এক করে দে সন্ধ্যা নমাজ মিশিয়ে দে আজ বেদ কোরাণ। থাকি একই মায়ের কোলে,—করি একই মায়ের স্তন্য পান,—আমরা পাশাপাশি প্রতিবাসী দু'গোলারি একই ধান।'

কান্তকবির দেশ-বন্দনা যেটি 'বাণী'র—সূচনা সঙ্গীত গৌরী রাগিনীতে গেয়,—সেই উদাত্ত সঙ্গীতটি কখনও বাঙালী গায়করা বিস্মৃত হবেন না :—

"সেথা আমি কি গাহিব গান
যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম ঝঙ্কারে "কাঁপিত দূর বিমান।"

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মন্তব্য করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ কবি সত্যেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতি-তর্পণে যে কবিতাটি তাঁর কীর্তির পরিচায়িকা হিসেবে লিখেছিলেন সেটি কান্তকবি সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য :—

"তুমি বঙ্গ ভারতীর তন্ত্রী পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা,—আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্র রবে
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে।"

প্রকারান্তরে কান্তকবি যেন তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের epitaph নিজেই লিখে গেছেন :—"ফুল যে ঝরিয়া পড়ে কথা নাই মুখে,—তার ক্ষুদ্র জীবনের বিকাশ বিনাশ,—তার ক্ষুদ্র আনন্দের তুচ্ছ ইতিহাস—রয়ে গেল কিনা এই মর-মর্ত্য বুকে, সে কি তা দেখিতে আসে?—হেসে ঝরে যায়।" তিনি ফুলের মতো হেসেই ঝরে গেছেন।

কান্তকবির হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেরণা ও ব্যঙ্গোক্তি থাকলেও, সে গানের পরিধি ও ব্যাপ্তি, ইঙ্গিত এবং বক্রোক্তি, তীক্ষ্ণতা ও মর্মান্তিকতা তাঁর গুরুর তুলনায়—অবশ্য লঘুতর ঋজুতর এবং সহনীয়তর। দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রীর প্রতি তাঁর শ্লেষোক্তির গানটি তখন মুখে মুখে ফিরতো :—

"বাজার হুদ্দা কিন্ত্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিচি পায়
তোমার লগে কেমন পারুম হৈয়া উঠছে দায়।
আরশি দিচি কাঁকই দিচি, গাওমাজনের হাপান দিচি
চুল বান্দনের ফিতা দিচি আর কি ত্যাওন যায়!"

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সর পুরিয়া
গড়েছো কি নিধি, দয়াময় বিধি,—কত না যুক্তি করিয়া!

* * পেলাম না শুধু হরি হে
খাইতে হৃদয় ভরি হে
(আহা) না খেতেই যার উদর ভরিয়া সন্দেশ থাকে পড়িয়া
(ওহো) মনের বাসনা মনে র'য়ে যায় চোখে ব'হে যায় দরিয়া॥

এবং কান্তকবির—যদি "কুমড়োর মতো চালে ধরে রোতো পানতুয়া শত শত" অবশ্য তুলনায় সহধর্মী কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কবিতার পরিধি অনেক বেশী ব্যাপক। উভয়েরি ব্যঙ্গের ভিতর সমাজ কল্যাণের কামনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কান্ত কবির 'তিন কড়ি শর্মা' 'জেনে রাখো' 'জাতীয় উন্নতি' 'হজমী গুলি' 'বরের দর' 'বেহায়া বেহাই' প্রভৃতি ব্যঙ্গ কবিতাগুলি পরিহাস রসে সার্থক হয়ে উঠেছে।

নমুনা উদ্ধৃত করা যায়:—

শ্বশুর কিম্বা ভগিনীর পতি কেহ নাহি মোর আপিসে
নিজের কিম্বা পিতার শ্যালক না-খুড়ো না-জ্যাঠা না-পিসে!
সুতরাং আর motion দিবে কে intertia র law জানো?
(আর) নিজেরো একটু tact থাকা চাই কর্তৃ নিচয়
ভজানো!

তাঁহার ইঙ্গবঙ্গ মিশ্রিত ডেপুটী', 'উকিল' প্রভৃতি কবিতাগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই'এর সুরে এবং সেই ধাঁচেই রচিত।

ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সাধনার ধনে ('কল্যাণী' দ্রষ্টব্য) অতি আট পৌরে চলতি ভাষায় সরল হাস্যরসের একটি চিত্র পাওয়া যায়:—

"সে কি তোমার মতো, আমার মতো, রামের মতো
শ্যামের মতো
ডালা কুলো ধামার মতো যে পথে ঘাটে দেখতে পাবে?
* * মাম্‌লাতে চলে না দাওয়া,—
ওয়ারিস্ সূত্রে যায় না পাওয়া
সে যে নয় মলয় হাওয়া যে বাহার দিয়ে বেড়িয়ে থাবে!"

তাঁর একটি নিখুঁত নিজস্ব নিস্পৃহ নিরপেক্ষ হাস্যকৌতুকের সুর আছে—যা আঘাত করে না—শিল্পীর মতো চিত্র আঁকে,—কবির মতো বর্ণনা করে—ক্ষুব্ধ করে না—কুণ্ঠিত করে না—বিচার বিশ্লেষণ করে এবং উপদেশ ও আনন্দ দেয়। তাঁর নিজের ভাষায় তাঁর comic গান Covertly instructive অর্থাৎ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো—সে হাসির গান গোপনে উপদেশের ধারা বহন করে।

'কল্যাণী'তে—পিতার পত্রে—বিষ্ণু 'পেসাদ' শর্মার—স্বাক্ষরে পল্লীগ্রামে আজও যে শব্দবহুল বিকৃত ও বিচিত্র ভাষার প্রয়োগ দেখা যায় তার অনবদ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে, পুত্রের প্রতিক্রিয়া এবং তার 'মুক্‌খু' বাবার প্রতি যে মনোভাব তাও অনাবিল হাস্যরসের উদ্রেক করে।

তাঁর নীতিমূলক 'অমৃতে'র ছোট ছোট কবিতাগুলি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক' এবং রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র ধাঁচে লিখিত। নিঃস্বার্থ ত্যাগের উদাহরণ যথা :—

"নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল"
"গিরি শিরে বৃষ্টি পড়ে জন্মায় তুষার
নিদাঘে গলিয়া জল হয় পুনর্বার।" ইত্যাদি

কবির 'প্রোজ্‌ঝিত কৈতব' বা একান্ত অকপট বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভগবদ্ভক্তির ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর সঙ্গীতে। তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে তিনি রচনা করেন—

"তোমারি দেওয়া নিধি তোমারি কেড়ে নেওয়া···আমারি বলে কেন ভ্রান্তি হল' হেন, ভাঙো এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব।"

যখন কণ্ঠাক্রান্ত কর্কোটক (ক্যান্সার) রোগে তিনি মৃত্যুর দিন গণনা কচ্ছেন—তখনও সেই আত্মসমর্পণ দেখি বাক্‌রুদ্ধ কবির সানন্দ নিবেদনে।

নিশ্চিত মৃত্যু যখন দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে তখন তিনি তাঁর কবিগুরুর ভাষায়—

"মরণরূপে আসিলে সখা চরণ ধরি মরিব হে"

বলেছেন সর্বান্তঃকরণে। তাই স্বয়ং কবিগুরু তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে তাঁর মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে বলেছিলেন—'আপনাকে পুজো করতে ইচ্ছে করে।"

এই দিনই কান্ত কবি তাঁর সেই অবিস্মরণীয় গানটি রচনা করেন। এবং রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন,—তিনি সেটি পেয়ে তাঁকে লেখেন মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে—"সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি।'

(কান্ত কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত পত্র)

অবশেষে কবির জীবনদীপ যখন নির্বাণোন্মুখ তখনও তিনি সেই একই সুরে আত্মসমর্পণ করেছেন :—

"দাও ভেসে যেতে দাও তারে···তারে দিও না গো বাধা···আসিয়াছে যেথা হ'তে সে চরণে ফিরে যাক চলে"—সেই—তাঁর শেষ কবিতা :

"আমার দয়াল ওই বসে আছে নিরজনে—
আমারে দিও না বাধা ভেসে যাই একমনে।"

শাক্ত পদাবলীর রসিকচন্দ্রের গানে পাই—

"ভয় নাই রণে,—শঙ্কা নাই মরণে,—
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন—

কবির এই মৃত্যুজয়ী 'মৃত্যু' যেন তারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন। মৃত্যুর সে দুঃখকে, কান্তকবির উদ্দেশে কবি সুধীন্দ্র দত্ত বলেছেন,—"ভক্তের বিভব" ও সে-দুঃখ "মৃণালের কমল সৌরভ।"

এই নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সূচী :—

—কান্তকবি রজনীকান্ত—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত।

সংহতি—শারদীয়া ১৩৭৫

—নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কান্তকবির শতবার্ষিক স্মারক সংখ্যা, সম্মেলনী, ৮ম বর্ষ—অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭২ (১৯৬৫ খৃঃ)।

—কান্তকবি রজনীকান্ত সেন শতবর্ষ প্রবন্ধ—শ্রীঅজিত রায় 'পুনর্জন্ম' পত্রিকা—১৩৭২।

—কান্তকবি রজনীকান্ত প্রবন্ধ—শ্রীঅশোক চৌধুরী 'সাধনা' পত্রিকা—বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২।

"বন্দে মাতরম্" ও বঙ্কিমচন্দ্র

হিন্দীতে একটা কথা আছে, "পহিলে দর্শনধারী, পিছে গুণ বিচারি।" বঙ্কিমচন্দ্র যে একজন অলোকসামান্য পুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। "সেই সম্মিলনের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র, যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সহিত মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ততেজ দেখিলাম যে ··এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র—তিনি কে ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমচন্দ্র তখন বড় বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সেকথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। তাঁহার খড়্গ নাসায়, চাপা ঠোঁটে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন। কাহারও সঙ্গে যেন তাঁহার কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।"—(রবীন্দ্ররচনাবলী-শতবার্ষিক-সং ১০ম খণ্ড পৃঃ ১১৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী থেকেও তাঁর অন্তরের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, যথা "যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত হইল না সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থে না লিখিল সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।"

বন্দে মাতরম্ ও অন্যান্য রচনার কাহিনী

বঙ্গদর্শন প্রকাশকালেই (১৮৭২ খ্রীঃ) বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি রচনা করেন। বঙ্গদর্শনের ছাপাখানার পণ্ডিত সেটি বঙ্গদর্শনেই প্রকাশ করতে চান, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সেটি না দিয়ে দেরাজে রেখে দেন। পরে যখন তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১৮৮০-১৮৮২ খ্রীঃ) ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয় তখন সেটী আনন্দমঠের মধ্যে সংযোজিত ক'রে দেন।

বন্দে মাতরম্ রচিত হয় শতবর্ষ পূর্বে (১৮৭৫ খ্রীঃ) হুগলী চুঁচুড়া শহরে গঙ্গাতীরে জোড়াঘাটের একটি বাড়ীতে। কবি নবীন সেন "আমার জীবন গ্রন্থে" বলেন, "একদিন এই সঙ্গীতটি সমস্ত ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হইবে। কিন্তু মাঝে মাঝে বাঙ্গলা ছত্রগুলি গানটির মর্যাদা নষ্ট করিয়াছে, আগাগোড়া সরল সংস্কৃত হইলে ভাল হইত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশ চন্দ্র তাঁর বঙ্কিমজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে এই গানটির প্রসঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা শরৎকুমারীকে বলেন, "এখন থেকে বিশ ত্রিশ বৎসর পরে এমন একটা দিন আসিবে যেদিন এই গানে বাঙ্গলা মাতিয়া উঠিবে। ঋষি বঙ্কিমের এই বাণী সফল হয়েছিল। শুধু বাঙ্গলা নয় সমগ্র ভারত উত্তাল হয়ে উঠেছিল (১৯০৬ খ্রীঃ)। ইংরাজ সরকার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি পর্যন্ত (কার্লাইল সার্কুলার দ্বারা) নিষেধ করা সত্ত্বেও দেশের শহীদ যুবকবৃন্দ ফাঁসির মঞ্চে এই মন্ত্রেই জীবনের জয়গান গেয়ে গিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে ওস্তাদ যদু ভটের নিকট মার্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কৈশোরে কবিতা লিখেই তাঁর সাহিত্যের 'হাতে খড়ি' হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজে পঠদ্দশায় কবিতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যজীবন স্থরু হয়। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত তার 'কামিনীর উক্তি' কবিতাটি পুরস্কৃত হয়।

তাঁর প্রথম যুগান্তকারী উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫ খ্রীঃ) প্রকাশিত হবার পূর্বেই তাঁর ইংরাজী উপন্যাস কিশোরী চাঁদ মিত্রের সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, 'Raj Mohan's Wife' নামে।

পাদরী হেষ্টি সাহেব ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করলে, স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তার প্রতিবাদ করেন, তাঁর Letters on Hinduism দ্বারা 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনামে। তা'ছাড়াও তিনি হিন্দু ধর্ম, উৎসব, সমাজসাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ইংরাজীতে লিখে গভীর স্বদেশ প্রীতি জ্ঞান ও মনীষার পরিচয় দিয়ে যশস্বী হন।

তাঁর বন্দে মাতরম্ ও স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সঙ্গত হবে যে তাঁর রচিত ১৪টি বাঙ্গলা উপন্যাসের মধ্যে ৪টি উপন্যাস 'রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম দেশপ্রেমে পরিপ্লুত।

'বন্দে মাতরম্' ও তার সুর

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ হ'লেও গানটিতে প্রথম মল্লার রাগিণীর সুর দেন তাঁরই এক বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্। তিনি তাঁর জোড়াঘাটের বাড়ীর পাশের বাড়ীতেই থাকতেন। তাঁর নাম ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তিনিও ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি।

বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের সর্বজনপরিচিত সুরটি দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ (১৮৯৬ খ্রীঃ) বিডন স্কোয়ারে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং নিজেই স্বকণ্ঠে সঙ্গীতটি পরিবেশন করেন।

বঙ্গভঙ্গের পর কাশীধামে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গোপালকৃষ্ণ গোখলে সভাপতিত্ব করেন। সেই অধিবেশনে সরলা দেবী সঙ্গীতটি গাইবার সময় 'সপ্ত কোটিকণ্ঠের স্থলে, 'ত্রিংশকোটি কণ্ঠ' পরিবর্তন ক'রে গান করেন, ফলে সমগ্র ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রাণে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতটি জাতীয় সঙ্গীতরূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের সূতিকাগার

শ্রীগোরাচাঁদ আঢ্যরচিত প্রবন্ধ 'বন্দে মাতরম্—একটি সঙ্গীতের জন্মকথা,' ও তাঁহার সম্পাদিত বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের স্বরলিপি সংবলিত বন্দে মাতরম্ শতবার্ষিকী স্মরণিকা ১৮৭৫-৭৬—১৯৭৫-৭৬ একটী অমূল্য সংযোজন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে জোড়াঘাটস্থিত বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনে এই সঙ্গীত বা মুক্তিমন্ত্রটী প্রস্তুত হয়। সেই সূতিকাগৃহে গত ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ খ্রীঃ একটী স্মারকলিপি স্থাপিত হয়েছে এবং সে সভার উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র। স্মৃতিশিলাটীর ব্যয়ভার বহন করেন প্রখ্যাত সার্জন শ্রীমুরারি মোহন মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানের স্বপ্ন দেখেন আমার আত্মীয় প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপতি মজুমদার (৭ই জুন ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে)। এই অনুষ্ঠান যেন এই মহামন্ত্রের বর্ধাপন উৎসব পালন ক'রে, শতবর্ষ পরে, দেশবাসীকে ঋষিঋণ শোধ করতে শিক্ষা দিল।

মনস্বীদের মন্তব্য

মনস্বী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন—"বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন ··· সব গিয়া একপথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা, জন্মভূমিকে

মা বলা, জন্মভূমিকে ভালোবাসা, জন্মভূমিকে ভক্তি করা ···· ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করেন নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য্য,—তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ মন্ত্রদ্রষ্টা,—সে মন্ত্র বন্দে মাতরম্।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"The supreme service of Bankim to his nation was that he gave us the vision of our Mother. The mantra 'Bande Mataram' had been given and in a single day, a whole people had been converted into the religion of Patriotism." শ্রীঅরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরও বলেছেন,—"When posterity comes to crown with her praises, the makers of India,—she will place her most splendid laurel not on the sweating temples of a place-hunting politician, nor or the narrow forehead of a noisy social reformer,—but on the serene brow of that gracious Bengalee, who never clamoured for places of power, but worked in silence···and was able to create a language a literature and a nation."

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বঙ্কিমের অবদান

স্নান করার জন্য পুষ্করিণী খনন করা, এবং তারপর সেই স্বখাত পুষ্করিণীর জলে স্নান করার মত বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার গদ্য ভাষার সংস্কার সাধন ক'রে তাকে নূতন রূপ দিয়ে, তাতে নূতন নূতন উপন্যাস (রোমান্টিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রভৃতি), দার্শনিক ও বিতর্কমূলক প্রবন্ধ এবং প্রতিবাদ ও রঙ্গরসাত্মক লোকরহস্য আদি বিচিত্র সৃষ্টি ও সম্পদ তাঁর দেশকে ও জাতিকে দিয়ে গেছেন।

আনন্দমঠের প্রথম অনুবাদ

আনন্দমঠের ইংরাজী অনুবাদ শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত (পরে ডক্টর) The Abbey of Bliss নামে ইং ২৮শে ডিসেম্বর ১৯০৬ খ্রীঃ প্রথম প্রকাশ করেন। পরে শ্রীঅরবিন্দও ইহা ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন।

আধ্যাত্মিক মুক্তি ও দেশমুক্তি

মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন—দেশমাতৃকার এই তিন মূর্তির অর্চা বিগ্রহ বা প্রতিমার পরিকল্পনাকে তিনি 'ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ' সেই জগৎপ্রসবিনী, জগৎপালিনী ও জগৎপ্রলয়কারিণী মহাশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আত্মার মুক্তির সাধনাকে দেশমুক্তির সাধনায় রূপায়িত করেছেন, তাই তিনি ঋষি।

তাঁর গভীর মনস্বিতার আর এক পরিচয়, তিনি আনন্দমঠের সন্তানদের শক্তি সাধনায় বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের সঙ্গে "হরে মুরারে মধুকৈটভারে'র ধ্বনি মিলিয়ে শাক্ত বৈষ্ণব দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁর আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব ও গীতার ভাষ্য প্রভৃতি পড়লে মনে হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ' তাঁর অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল।

"শক্তি শক্তিমতোরভেদ বিবক্ষয়া যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ"—এই সমন্বয় তত্ত্ব সাহিত্যের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রই জনগণের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন।

বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ

কোন কোন সমালোচক বলেছেন "ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিম তাঁর আনন্দমঠে আত্মভ্রষ্ট"। বলেছেন, "আনন্দমঠ লক্ষ্যহীন,—বাঙালী সমাজই ওই উপন্যাসের মধ্যে লক্ষ্য আরোপ ক'রে আনন্দমঠকে স্বাধীনতার জীবনবেদ করতে চেয়েছে,—বঙ্কিম তা চাননি। বঙ্কিমের বিজ্ঞাপনী ও উপক্রমণিকা তার প্রমাণ।" এঁদের সমালোচনা একদেশদর্শী ও পক্ষপাতপূর্ণ। তাঁরা তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে চান না। তাঁরা ভুলে যান যে তখন যেমন সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ ছিল না, তেমনি জাতীয় সংহতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রভৃতিরও কোন আদর্শ ছিল না। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা, ফরাসী বিপ্লব ও বিশেষ করে ইংরাজী ভাষার নিকট কী পরিমাণে ঋণী তা একদেশদর্শী সমালোচকরা চিন্তা করেন না,—ফলে মনে করেন যে তৎকালীন রাষ্ট্রনেতাদের অসম্মান করলে এবং ইংরাজদের অধিকতর ঘৃণা করলেই বুঝি রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানের ও স্বদেশপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হবে।

বঙ্কিম চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সার সঙ্কলন করতে,—স্বদেশপ্রেমে হৃদয় পূর্ণ করতে, অথচ বিদেশবিদ্বেষ বর্জন করতে।

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করেছেন—আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নত ধ্বনি,"—তা কিছু মাত্র অত্যুক্তি নয়। মাতৃভাষাকে তিনি বলবতী মহীয়সী ক'রে গেছেন।

"তিনি বঙ্গ ভাষার ক্ষমতা ও বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত একতারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল,—বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটী করিয়া তার চড়াইয়া বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়াছেন।"

—রবীন্দ্রনাথ

কেহ কেহ আবার বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িকতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। তাঁরা ভুলে যান যে তাঁর শিল্পমানসে বা চিন্তাধারায় সাম্প্রদায়িকতা থাকলে তিনি 'আয়েষা'র মত অপরূপ চরিত্র সৃষ্টি করতে পারতেন না।

যাঁরা আকাশবাণীর 'সুভাষিত' শুনে থাকেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে তিনি কত জোর দিয়ে বলেছেন যে এখানকার রাজা জমিদারগণ যেন বিস্মৃত না হন যে দেশের স্বার্থে ও সমাজের ভারসাম্যে, তাঁরা ও গ্রামের কৃষক করিম সেখ প্রভৃতিরা সমানভাবে নিরপেক্ষ বিচারের পাত্র এবং দেশীয় সম্পদেরও অধিকারী। কোনো সমালোচক বলেছেন বঙ্কিম নাকি বাঙ্গলার প্রাদেশিকতার ভাবটা সর্ব প্রথমে ফুটাইয়া তোলেন। এই বিষয়ে হাস্যকর অসম্ভাব্যতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহলে রবীন্দ্রনাথকে প্রাদেশিকতার দ্বিতীয় স্থানটী অবশ্যই দিতে হয়। যেহেতু তিনি রাখীবন্ধনের গান রচনা করেছিলেন "বাংলার মাটি বাংলার জল"—ধন্য হোক বলে তিনিও গেয়েছিলেন "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—"আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।" 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তো"—একলা চলার জন্য রবীন্দ্রনাথ ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু সে ডাক সকলকেই সকলে দিয়েছিলেন- কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় ছিল। তাঁরা জানতেন যে "ঘন্টা যখন উঠবে বেজে, দেখবি সবাই আসবে সেজে, এক সাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে—নিশিদিন ভরসা রাখিস্ ওরে মন হবেই হবে।"

সমালোচকেরা আমাদের মনের ক্রমবিকাশের কথাটা চিন্তা করেন নাই

ব'লেই এরূপ অন্যায় ভাবে প্রাদেশিকতার অভিযোগ করেছেন বঙ্কিমের বিরুদ্ধে এই দেশপ্রীতির ক্রমবিকাশের কথাই পাওয়া যায় এই ইংরাজী প্রবাদটীতে,— Charity begins at home'। আমিও আমার 'বাংলার গানে' এই ভ্রান্ত অভিযোগের প্রতিবাদ ক'রে বলেছি—

"দেখিয়া শুনিয়া চিনিতে শিখিবে আগে আপনার ঘর
ঘর না বাঁচায়ে বা'র পানে চায় তারে বলে বর্বর।
ঘর হতে পরে পাড়া প্রতিবেশী ভিন্ন প্রদেশে দেশে
বিশাল বিশ্বে মিশে গিয়ে হও বিশ্ব-প্রেমিক শেষে।
ঘরে শুরু ক'রে একতারা পরে পরেরে শুনায়ো 'বীণা,'—
ঘরে পরে কোনো ভেদ নাই জেনো, 'শুরু' আর 'সারা' বিনা।

বন্দে মাতরম্ মন্ত্র

'বন্দে মাতরম্' শুধু গান নয় এটী পরাধীনতারূপ মহাব্যাধিমুক্তির মন্ত্র-স্বরূপ। যা মনকে ত্রাণ করে তাই মন্ত্র। পরাধীন পরপদানত জাতির 'জো হুকুম হুজুর'—রূপ হুকুম-বরদারী মন থেকে 'দাস-জতিকে জাগিয়ে তুলেছে, মুক্তি দিয়েছে এই মন্ত্র। "গায়ত্রী আমাদের ব্রহ্মবিদ্যালাভের বা আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের মন্ত্র। "গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী সা ততঃ স্মৃতা"—এই গায়ত্রী মন্ত্রদাতা হলেন বিশ্বামিত্র। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গভঙ্গের পর এই মন্ত্র দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বরিশালে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। সভাপতি আবদুল রসুল। লেঃ গভর্ণর স্যার ব্যামফিলড্ ফুলার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ করেন। তিনি বড়াই করতেন তাঁর অন্তঃপুরে হিন্দু জাতি ও মুসলমান জাতি নামে দুই স্ত্রী। তিনি প্রকাশ্যভাবেই বলতেন যে মুসলমান জাতিই তাঁর সুয়োরাণী! এইরূপে দুই জাতির মধ্যে পক্ষপাত, বিরাগ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়। এই অধিবেশনে নেতারা প্রথমে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দেননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ যখন শোভাযাত্রীদের উপর বেপরোয়া লাঠি চার্জ সুরু করে তখন সেই আহত ক্ষুব্ধ জনতার কণ্ঠ হতে ধ্বনি উঠল 'বন্দে মাতরম্'। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার ছেলে চিত্তরঞ্জন রক্তাক্ত কলেবরে ধ্বনি তুলেছে 'বন্দে মাতরম্'—তাকে মারতে মারতে পুলিশ একটা পুকুরে ফেলে দেয়। এরপর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে বিরাট স্বদেশী প্রদর্শনী হয় তাতে আহত লাঞ্ছিত চিত্তরঞ্জনের এক মর্মান্তিক চিত্র প্রদর্শিত হয়। আমরা স্বয়ং তা প্রত্যক্ষ করেছি। তাতে জনমানসে এক অভূত-

পূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তারপর ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, মাষ্টার দা, দীনেশ গুপ্ত প্রভৃতি অসংখ্য শহীদ ফাঁসির মঞ্চে এই মন্ত্রের ধ্বনি দিয়ে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করেছেন।

শহীদের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে কবিকণ্ঠে,—

"বেত মেরে কি মা ভোলাবে
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?"

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের জেলাশাসক পেডির আদেশে বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়েও জনাব সিরাজুল হক্ এই 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র বলা ছাড়েননি। এখন আমার 'বঙ্কিমচন্দ্র বন্দনার' কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বন্দে মাতরমের জয়গান গাই।

"বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বালি
জাতির মুক্তির যজ্ঞে সঙ্কল্পের যজ্ঞহবিঢালী
দিলে দেশবাসিকরে।
... ...
শুনি সম্মিলিত জয়ধ্বনি
উজ্জীবিতা জীবন্মৃতা,—উদ্বোধিতা মূর্ছিতা জননী
তব সঞ্জীবন মন্ত্রে ...
বঙ্গভারতীরে দিলে ঐশ্বর্য মাধুর্যপূর্ণ ভাষা—
সাহিত্যে সৌহিত্য দিলে সঞ্চারিলে উচ্চতর আশা
... ...
... জাগাইলে আর্য অভিমান
অসাধ্য সাধন মন্ত্রে স্বাধীনতা তব শ্রেষ্ঠদান।
... ...
তোমারে প্রণাম করি পথস্রষ্টা দিব্যদ্রষ্টা ঋষি
যুগসন্ধিক্ষণে তুমি যুগন্ধর তপস্বী মনীষী ॥"

'শিক্ষা' পত্রিকার—'বন্দে মাতরম্ শতবার্ষিকী' সংখ্যায়
(৩০ চৈত্র ১৩৮৩) প্রকাশিত

রবীন্দ্র কাব্যে প্রেমের ক্রমবিকাশ

প্রেম বহুমুখী—তার স্বকীয় সত্তা অনির্বচনীয় হলেও তার বহিঃপ্রকাশ আমরা নিত্য নানারূপে প্রত্যক্ষ করি। তাই আমরা বলি, 'পিতা স্বর্গঃ' ;—বলি, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমরা শুধু যৌন প্রেমের ক্রমবিকাশের কথাই আলোচনা ক'রব। প্রেমের এই দিকটার দৃষ্টান্ত 'যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা' অর্থাৎ যে প্রেম যুবতীর মন টানে যুবকের প্রতি এবং যুবকের মনকে আকর্ষণ করে যুবতীর প্রতি। অর্থাৎ 'এই প্রেমগীতি-হার গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়' (রবীন্দ্রনাথ), কিন্তু তাই বলে এই প্রেমের পরিণতি শুধু 'মিলন মেলাতে'ই আরম্ভ হয়ে—বিরহ বেলাতেই পর্যবসিত হয় না। তাই তার বিচিত্র প্রকাশ এবং প্রকারভেদ তথা ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রব রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে।

এই প্রেমধারা নদীর মত 'সমুদ্রবাহিনী' সে চলে অনন্তের পথে অসীম সমুদ্রের সঙ্গম লাভ করতে, কারণ 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। তাই কবি বলেন,—তাঁর কাব্যে একটিই 'পালা', সে 'পালা', সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনে।

"..... সেই সুধা স্রোতে
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু আপন কুটিরে
আপনার তরে।"

কিন্তু তার পর ফুলের মতই,—বিভিন্ন পাত্রে এই প্রেম অর্পিত হয়ে বিভিন্ন পরিণতি লাভ করে।

আমাদেরি কুটির কাননে
ফুটে পুষ্প কেহ দেয় দেবতাচরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে।
*   *   এই প্রেমগীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ, বঁধুর গলায়।

প্রেমের এই দান কখনো 'তাঁরে' কখনো 'বঁধুর গলায়' অর্পিত হয়। কবি বলেন যে এই দুইয়ের মধ্যে কোনো আত্যন্তিক ভেদ তো নাই-ই পরন্তু—তত্ত্বতঃ অভেদই উপলব্ধ হয়।

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে আর পাবো কোথা
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

প্রেমের দ্বারা অতি সহজেই 'প্রিয়' এবং 'দেবতা' স্থান বিনিময় করে থাকেন, তাই প্রিয় যেমন দেবতায় পরিণত হ'ন—দেবতাও তেমনি 'প্রেয়ো পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ যদয়মাত্মা' হয়ে উঠেন। তাই কবি বলেন—

"তুমি আমার আপন, তুমি আছো আমার কাছে
মোরে এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে
শুধু এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।"

বিল্বমঙ্গল বলেন—

"হে দেব, হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো!"

যিনি 'দেব' তিনিই 'দয়িত' এবং যিনি দয়িত তিনিই 'দেবতা' অর্থাৎ 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'।

রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতি নিজে অনুযোগ করে বলেন—

"দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপনা, জেনে আদর করিনে
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দুহাতে ধরিনে।"

প্রিয়কে 'দেবতা' করাকেই প্রেমের ঊর্ধ্বপাতন বা Sublimation বলা হয়, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

এই প্রেম যাঁর ধন,—তিনি লীলাময় দ্রষ্টা এবং তিনিই আনন্দময় ভোক্তা, তাই তিনি এই প্রেমলীলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিত্য অভিনয় করছেন এবং অভিনয় দর্শনও করছেন—আপনাকে 'বহু'রূপে বহুরূপীতে পরিণত ক'রে।

কবি বলেন—

"যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।"

এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই ব্রহ্মসূত্রে "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্",—তাঁর 'লীলা কৈবল্য' ও লৌকিক লীলার তুলনার দ্বারাই আমরা আমাদের মানবিক বোধভূমিতে কিছুটা অনুমান বা অনুভব করতে পারি।

মানবিক ভূমির প্রেম দৈবী ভূমিতে উন্নীত হবার ক্রম এবং ক্রমবিকাশই এই প্রবন্ধের বিষয়।

প্রথম স্তরে, মানবিক ভূমির প্রেম, মোহময়ী প্রমোদ মদিরার রঙে রাঙা,—নরনারী সেই নেশার আবেশে বিভোর। এই মোহ রূপজ মোহজনিত। যে দ্রষ্টা সে দেখে Helen's beauty in the brow of Egypt,—সে বলে 'আমার চোখে যদি লাগে ভালো কেন চাইব না',—না চাওয়ার নীতি নিয়মের বিরুদ্ধে সে প্রকৃতির বশেই বিদ্রোহী হয়। গীতা বলেন—

"প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ?"

এই মোহের কবিতার উদাহরণ যথা—

'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়াছিল সে কি
আমার পানে ভুলে পড়িবে না ? ··· ···
ও মুখ মনোরম, শ্রবণে রাখি মম,
নীরবে অতি ধীরে ভ্রমর গীতিসম
দু'কথা বল যদি, প্রিয় বা প্রিয়তম
তাহে তো কণা মধু ফুরাবে না।" (রবীন্দ্রনাথ)

অথবা,

"অলি বার বার ফিরে যায়, বার বার ফিরে আসে
তবে তো ফুল বিকাশে।
কলি ফুটিতে চাহে ফুটে না মরে লাজে মরে ত্রাসে।
····· ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয়-রতন-আশে—
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ
নিশিদিন রহ পাশে।" (রবীন্দ্রনাথ)

বৈদান্তিকরা বলেন, অবিদ্যার অস্পষ্ট আলোকের ভ্রান্তদর্শনে দড়িই হয় সাপ, রজ্জুতে সর্পভ্রম অধ্যস্ত বা আরোপিত হয় বলে। প্রকৃত ক্রান্তদর্শী কবি এবং রসিক প্রেমিকও বলেন, প্রেমই হয় কাম, দেহে আত্মবুদ্ধি অধ্যস্ত হয় বলে, এবং সেই ভ্রমবুদ্ধিতে দেহের সুখে আত্মসুখ-কামনা 'হানা' দেয় বলে। এই আত্মসুখ-কামনায় রাঙানো, আত্মসুখাকাঙ্ক্ষা অধ্যস্ত যে-দেহের দেউলে 'আত্মা' বাস করেন, সে বাড়ীটাই কামরূপের হানাবাড়ী। তাই চৈতন্য চরিতামৃত বলেন,—"দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্তের স্থান", এবং মহর্ষি শাণ্ডিল্য তাঁর ভক্তিসূত্রে বলেন—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পিত পরমাসক্তিই প্রেম।

তবে তত্ত্বতঃ সেই প্রেমই এই প্রেম এবং এই প্রেমই সেই প্রেম—ব্যবধান শুধু এইটুকু যে উভয়ের মধ্যে একটু অগ্নিসংস্কারের প্রয়োজন হয়,—যাকে বলা যায় Baptism of Fire,—তার ফল হয় অভাবনীয়। ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ যখন,—যারা,—'ধরার নরক সিংহ দুয়ারে',—নিত্য সন্ধ্যাবাতি জ্বালায় তাদেরই এক বারাঙ্গনার মুখের পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে বলে উঠেন—

"আনন্দময়ী মুরতি তুমি
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"

তখন সেই পতিতারও অন্তরের সুপ্তদেবতা জেগে উঠেন। কারণ সুন্দরের স্মরণে, ধ্যানে এবং দর্শনে,—এমন কলুষিত কলঙ্কমলিন কেউ নেই,—যে অন্তরে বাহিরে শুচি এবং সুন্দর হয়ে না ওঠে। তাই দেখি বাহ্য শৌচের আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিক স্মার্ত ব্যবহারের মধ্যেও সুন্দরের পূজারী আমাদের ঋষিরা বিধান করেছেন যে,—'সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা,—যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।'

—অর্থাৎ সেই কমলনয়ন পরমসুন্দরকে ধ্যান করবামাত্র আমরা যে কোন অবস্থায় অন্তরে বাহিরে শুচি হতে পারি।

তাই সেই পতিতা নারীর মুখে শুনি—

"আনন্দে মোর দেবতা জাগিল
জাগে আনন্দ ভকত প্রাণে,—
সে-বারতা মোর দেবতা-তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।......

……শুনি সে-বচন হেরি সে-নয়ন
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি—
নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।—('পতিতা')

মহাকবি এই অগ্নিদীক্ষার প্রার্থনা করেই বলেছেন—

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন ধন্য কর, এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে।"

প্রশ্ন উঠে যে, এই অগ্নি-সংস্কারে কি হয় দগ্ধ? কি হয় পবিত্র, পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত? উত্তর,—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছারূপ 'মহাশনো মহাপাপ্‌মা' (গীতা) মহাবৈরীরূপ যে জৈব কাম-প্রবৃত্তি বা ভোগলালসা,—তাই বৈষ্ণব কবির ভাষায়, দয়িতের প্রীতিইচ্ছায় বা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'রূপ নিখাদ প্রেমে পরিবর্তিত বা পরিণত হয়। ফলে 'অন্ধতম যে কাম' তাই 'প্রেমরূপ উজ্জল ভাস্করে' পরিণত হয়। তখন প্রেমই অগ্নি (fire) প্রেমই আলোক (light) এবং প্রেমই আনন্দ (delight) প্রেমই যুগপৎ সংস্কারের অগ্নি, নয়নের আলো এবং অন্তরের আনন্দ।

এই প্রেম তখন সর্বতোভাবে প্রকৃতিগত, প্রেমিকের অস্থিমজ্জাগত হয়ে ওঠে তখনকার প্রেমে প্রতিদানের আশা আকাঙ্ক্ষার কোনো বনিকৃবৃত্তি থাকে না,

"ভালোবাসিবে বলে ভালো বাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"
(নিধু বাবু)

মহাকবির অননুকরণীয় ভাষায় শুনুন—

"আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই তুমি তাই গো
তোমা ছাড়া আর, এ-জগতে মোর,
কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও
যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়-মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো।

আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী
দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর কারে ভালবাসো,
যদি আর ফিরে নাহি আসো
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও
আমি যত দুখ পাই গো। —(মায়ার খেলা)

অর্থাৎ তাই ভালো যা তোমার ভালো। "তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী"……"দাও দুখ দাও তাপ সকলি সহিব আমি।" অথবা "ওহে জীবন বল্লভ তুমি সাধন দুর্লভ,…তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।" (রবীন্দ্রনাথ)

এই অবস্থা সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের অবস্থা তখন একান্ত ভাবে 'তদেকপ্রাণতা', 'তদর্থ-প্রাণ-স্থান' এবং 'তদীয়তা' লাভ হয় প্রেমিকের। তাই চণ্ডিদাস বলেন 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়'। এই রজকিনী প্রেম অন্য অর্থেও সার্থকনামা। কারণ ইহাতে dyeing এবং cleaning দুই-ই আছে। প্রথমে হয় ধোলাই (cleaning) যার ফলে 'নিমেষে ধৌত নির্মলরূপে' বারাঙ্গনার অন্তর থেকে তার বরাঙ্গনারূপে পুনরুজ্জীবিত কুমারী-সত্তা নিয়ে তার পবিত্র অন্তরাত্মা আবির্ভূত হয়—'বাহিরিয়া' আসে এবং তখন তার গায়ে নবানুরাগের রাঙারঙের (dyeing) ছোপ লাগে। চণ্ডিদাসের বর্ণনায় পাই—

"বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা
হসিত বদনে চাহে মেঘপানে না চলে নয়ন-তারা।"
ইহাই "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" (গীতা)

প্রেমতত্ত্ববিদ্‌রা যৌন প্রেমকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রেম বা রতি তিন প্রকার,— সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা।

প্রথম 'সাধারণী রতি' আত্মসুখসর্ব্বস্ব, বা egoistic hedonism. নিজের সুখই তার তাৎপর্য্য। ইহা প্রেমের দস্যুবৃত্তি। উদ্দেশ্য সুখ আহরণ।

"সাধারণ প্রেম সুখের প্রবাহ আমার সুখের লাগি
আমি করি প্রেম তুমি কর প্রেম দেহের মিলন মাগি।"
(মৎপ্রণীত 'পঙ্কজ ও প্রেম')

দ্বিতীয় 'সমঞ্জসা রতি', ইহাতে উভয়েই. উভয়ের সুখ এবং তৃপ্তি কামনা করে। যেন ভাগচাষীর, চাষের উৎপন্ন প্রাপ্য শস্যের অর্ধেক, মালিকের সঙ্গে বখরা হয়। ইহাই সমঞ্জসা রতি—এখানে দেখি আপোষে সমন্বয়,—

"দ্বিতীয় যে প্রেম সমন্বয়ের উভয়-সমঞ্জসা
অর্ধেক দিয়া অর্ধেক নিয়া, আপোষে হিসাব কষা।"

(তদেব)

ইহাতে প্রেমের বণিক্‌বৃত্তি সূচিত হয়—উদ্দেশ্য—সুখ বণ্টন করে আপন আপন ভাগ উপভোগ করা।

তৃতীয় 'সমর্থা রতি'। এখানে বণিক্‌বৃত্তির লাভ বা বখরা ভাগের লেশমাত্র চিন্তাও নাই। এখানে শুধু দান এবং আত্মসমর্পণ, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি মাত্রও নেই।

"প্রেমের তৃতীয় সমধিক প্রিয় উজলে মধুরে খাঁটি
উজাড় করিয়া দেয় সেই প্রেম 'সমর্থ' পরিপাটি।
তুমি সুখী হবে আমারে বাসিয়া তোমারে বাসিয়া আমি
দেহের গেহের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া অলকানন্দা গামী।
অবধির সীমা প্রেমের মহিমা পরিধি না মানে কভু
আরো আছে, আরো দাও তবু আরো,—
নাহি সে ফুরায় তবু।"

(তদেব)

রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"নাই সীমা আগে পাছে যত চাও তত আছে
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।"
এবং "সারাটি জীবন তাই আর কোন কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।"

এবং সেই মানসী প্রতিমাকে তাঁর ঈপ্সিততমের পদতলে সমর্পণ করেন। তাই বলেন—

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো।
যেদিন গেছে তোমা বিনা
তারে ফিরে আর চাহি না
যাক্ সে ধূলাতে
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ।......
......কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনো যে আছে বাকী
মনের গোপনে
আমায়, তার লাগি আর ফিরায়ো না
তারে আগুন দিয়ে দহো॥ (গীতাঞ্জলি)

ফ্রয়েড ও রবীন্দ্রনাথঃ—রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা প্রসঙ্গে, এবং সাহিত্যে তাঁর যৌন মনোভাব সম্পর্কে, ফ্রয়েডের 'কামবাদ' বা Libido theory'র কথা সহজেই মনে পড়ে। অধুনা বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিকগণ অনেকেই উক্ত মতকে অনুসরণ করেন।

নরের প্রতি নারীর যে প্রেম (কান্ত প্রেম) এবং নারীর প্রতি নরের যে স্বাভাবিক প্রবণতা বা যৌন আকর্ষণ (কান্তা প্রেম) যাকে কাম বা প্রেম বলা হয়, তাকেই বৈষ্ণব দার্শনিকেরাও মধুর রস, শৃঙ্গার রস বা আদিরস বলেছেন। ফ্রয়েডও তাকেই সর্ব্বরসের মূলরস বলে ধরেছেন। ফ্রয়েডের প্রায় চারশত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্য চরিতামৃতে এই প্রেমের পাঁচটি স্তরভেদ দেখানো হয়েছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুররূপে।

তারও বহুশত বৎসর পূর্ব্বে আমরা ব্রহ্ম সংহিতায় পাই—

আনন্দ-চিন্ময়-রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (৫অ ১১)

অর্থাৎ আনন্দ চিন্ময়রসস্বরূপতা হেতু যিনি প্রাণিগণের মনে প্রতিফলিত হয়ে স্মরভাব বা কামভাব ধারণ ক'রে প্রতি প্রাণীর অন্তর এবং সেই হেতু সকল ভুবন জয় করছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এই কামতত্ত্ব ও আদি রসাত্মক প্রকৃতি-পুরুষের মিলিত অর্ধনারীশ্বর তত্ত্ব,—ভারতবর্ষে প্রাচীনতম কাল থেকেই আবিষ্কৃত, স্বীকৃত এবং প্রচারিত হয়ে আসছে, দর্শনে এবং উপাসনায়। প্রেমের আদিরসের আদিম কথাটি আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই। ব্রহ্ম অবিভিন্ন নির্বিশেষরূপে একান্ত একাকী ছিলেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। কিন্তু একাকী কোন খেলা, লীলা বা আনন্দ উপভোগ হয় না,—তাই তিনি তাঁর অন্তর্গত আত্মলীন অভেদাত্মিকা মূল-প্রকৃতিকে পৃথক ক'রে দ্বিধা বিভক্ত হলেন,—হলেন লৌকিক দম্পতির মত জায়াপতি রূপে মিথুন বা যুগল মূর্তি, যেন নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ [সংপরিষ্বক্ত] পতি পত্নীর মত। "স বৈ নৈব রেমে তস্মাৎ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। সঃ অকাময়ত 'জায়া মে স্যাৎ'। স হ এতাবান্ আস, যথা স্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ। স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নীচ অভবতাম্। [বৃহঃ ১।৪।৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মরণ' গ্রন্থে 'রমণী' কবিতায় যেন ঠিক এরই অনুবাদ করে বলেছেন, তদ্ভাবভাবিত হয়ে—

"যে-ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী,
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি।
যে-ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব চরাচরে,
যে-ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে।
যে-ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে-ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী।
যে-ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান।
যে-ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক,
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ।
দুয়ের মিলন-ঘাতে বিচিত্র বেদনা,
নিত্যবর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা।

হে রমণী ক্ষণকাল আসি মোর পাশে;
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য আভাসে ॥

ফ্রয়েডের সঙ্গে ভারতের ঋষিদের তথা রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এই যে,—ভারত এই তত্ত্বকেই পরমার্থ তত্ত্ব বলে মেনে নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত করেছেন বহু শতাব্দীর পূর্বে থেকে।

'পুরুষোত্তম' শ্রীভগবানে [গীতা ১৫শ ১৭-১৭ শ্লোক] এই কামবৃত্তি বা libido নিবেদন করে, তার ঊর্ধ্বপাতন বা sublimation সাধন করে তাকে প্রেমে পরিণত করে, তদ্দ্বারা রাগমার্গের সাধকেরা মরমী সাধনা করেন এবং পরে ক্রীশ্চান ও মুসলিম মিষ্টিক এবং সুফী সাধকেরাও আপন আপন সাধনার অঙ্গীভূত করেন।

'গীতাঞ্জলির' ঈশ্বর 'রসঘন আনন্দ স্বরূপ'। Christian Mysticদের ঈশ্বর 'Supremest Delight', Dulce Amore' বা Sweetest Love', সুফীদের ভাষায় ভগবান 'মাশুক' Beloved, ভক্ত 'আশিক্' বা Lover,—মাশুকের সহিত 'আশিক' এর 'আশনাই' বা প্রেম করাই আমাদের চরম বা পরম পুরুষার্থ। বৈষ্ণবের চক্ষে ভগবান—

"শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্তি ধর
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্বচিত্ত হর।"

ফ্রয়েড তাঁর অদূরদর্শী মননের দ্বারা চোখ বুজলে অন্ধকার ছাড়া আর কোন তত্ত্বই উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁর দৃষ্টিতে মৃত্যুর অর্থ জীবন-প্রদীপের নির্ব্বাণ এবং তা'তেই জীব-জীবনের একান্ত অবসান বা পরিসমাপ্তি।

বৈষ্ণব সাধকগণ রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ,—বিজয়কৃষ্ণ, নিত্যগোপাল, প্রভৃতি মরমী সাধকগণ তথা ক্রীশ্চান, মিষ্টিক ও মুসলিম সুফী সাধক ('রাবেয়া' প্রভৃতি) সকলেই প্রায় এক পথের পথিক।

নারদ ভক্তিসূত্রে পাই, "তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কাম ক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ং, তস্মিন্নেব করণীয়ং।" অর্থাৎ মনের এবং মানসিক বৃত্তি সমূহের মোড় ফিরিয়ে, কামক্রোধ অভিমানাদিকে ভগবন্মুখী করতে হবে। তাহলেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া ॥"

সকল আনন্দই তাঁর,—সকল মাধুর্য্যই তাঁর,—তাই শ্রুতি তাঁকে বলেছেন 'মধুব্রহ্ম'। এই সাধনার মূল কথাটি বৈরাগ্য সাধনা নয়,—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" [রবীন্দ্রনাথ] সংসারের 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে' ভোগ্য বস্তুর আসক্তির মধ্যে 'মহানন্দময়'—'মুক্তির স্বাদ' অর্থাৎ ঈশ্বরের মাধুর্য্য অনুভব লাভ করে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের পুষ্টি সাধন করা এবং তাঁকে নিবেদন করে প্রসাদ পাওয়া। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—এই বাক্যে ঈশোপনিষদও সেই কথাই বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"প্রদীপের মত, সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়, জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়,—তোমার মন্দির মাঝে।"

রবীন্দ্রনাথের যৌন মানসের উভয় লিঙ্গত্ব

রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার বিস্ময়কর বিশেষত্ব এই যে,—তার যৌন অভীপ্সা এবং আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে তাঁর প্রতিভা অবলীলাক্রমে উভয় লিঙ্গ (hermaphrodite) অর্থাৎ ইচ্ছামত স্ত্রীভাব এবং পুরুষভাবে ভাবিত হয়ে, ঠিক তত্তদ্ভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার সমান শক্তি বা সামর্থ্য ধারণ করে। তিনি যৌনপ্রেমাত্মক কবিতা রচনায় এই নূতন অর্থে সব্যসাচী।

যখন তিনি নারীর প্রতি 'পুরুষের উক্তি'কে রূপ দিয়েছেন, তখন যেমন তিনি ষোল আনা পুরুষত্বের অধিকারী, তেমনি যখন অপর পক্ষে তিনি পুরুষের প্রতি নারীর উক্তিকে রূপ দিয়েছেন তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে নারী সত্তায় সাযুজ্য লাভ করেছেন। তাঁর 'বধূ', 'ব্যক্তপ্রেম', 'গুপ্তপ্রেম', 'দুর্বোধ' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায় এই প্রমাণের সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায়। এই উভয়লিঙ্গত্ব রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার এক বিস্ময়কর অনন্যসাধারণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। বাহুল্য ভয়ে অধিক উদ্ধৃতির দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

[২৭শে জানুয়ারী, ১৯৬১ তারিখে আসানসোল 'মিলনী'র সাধারণ অধিবেশনে গ্রন্থকার প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ।] 'সন্তুষ' মাঘ ১৩৬৮

বৈষ্ণব ভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথ

মহাকবির স্বরূপ ও সংজ্ঞা :—

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ 'কবি' শব্দের বাচ্য,—শুধু কাব্য-রচয়িতা হিসাবে নন,—তিনি প্রত্যক্ষদর্শী দরদী মানুষ, ঋষি-চেতনায় উদ্ভাসিতদৃষ্টি কবি, ভারতীয় মালঞ্চের মালাকর, মানসমুকুল ফুটিয়ে তোলার বাউল, ভাগবত ভাবের বৈষ্ণব, প্রেমপন্থী মরমিয়া সাধক এবং তত্ত্বদর্শী ক্রান্তদর্শী আচার্য্য।

তিনি যুগ-সন্ধিক্ষণে—জাতির পথপ্রদর্শক নেতা, নিয়ন্তা এবং নায়ক।

গতানুগতিক বৈষ্ণবতাকে, তার অচলায়তন প্রকোষ্ঠ-পরায়ণতা থেকে মুক্ত ক'রে, তিনি তাকে বিশ্ব-বৈষ্ণবতার উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন।

ভাব থেকে রূপে, রূপ থেকে অরূপে এবং অরূপ থেকে অপরূপের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর জীবন-দর্শনের বিচিত্র বিস্ময়কর উপলব্ধি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অনুভব করে বদান্য সম্রাটের মত বিতরণ করেছেন। দুঃখ-দৈন্য-হিংসা-দ্বেষ-পীড়িত বিশ্বের নরনারীকে দান করে গেছেন মুক্তি, শান্তি এবং প্রেম। এই দানই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু তাঁর বৈষ্ণব ভাবধারা সম্বন্ধে কিছু বলতে চেষ্টা করব।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব

'বিষ্ণু' শব্দ বৈদিক যুগ হতেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে বিষ্ণু আরাধনার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যথা "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে স ত্রেধা নিদধে পদম্" ইত্যাদি বিভিন্ন সূক্তে এবং ঋকে।

'বৈষ্ণব' শব্দের বাচ্যার্থ তিনি, যাঁর উপাস্য দেবতা হলেন 'বিষ্ণু'।

'বিষ্ণু' শব্দের ব্যুৎপত্তি নানাবিধ। "বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ"—অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী হয়ে যিনি আছেন। যাঁকে শ্রুতি বলেছেন "বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।" অপর অর্থে "বেষতি (বিষ্ সেচনে—to sprinkle) সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্বম্" অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে নিজের রসে রসায়িত আপ্যায়িত করেন। আর এক অর্থ "বিষ্ণাতি (বিষ্ বিপ্রয়োগে—বিযুক্ত বা পৃথক্করণে) বিযুনক্তি ভক্তান্ মায়াপসারণেন সংসারাদিতি বা" অর্থাৎ মায়া অপসারণ করে সংসার থেকে ভক্তকে যিনি সরিয়ে নেন।

সুতরাং মৌলিক অর্থ ধরলে 'বিষ্ণু' ও 'ব্রহ্ম' সেই এক এবং অদ্বয় তত্ত্বকেই বুঝায়, শ্রীভাগবত যাঁকে উদ্দেশ করে বলেছেন :

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

দর্শনে ও সাহিত্যে 'রস'

প্রশ্ন উঠবে এর সঙ্গে সাহিত্যের তথা কাব্যের সম্পর্ক কি? সে সম্পর্ক সনাতন এবং শাশ্বতিক।

কাব্যের কষ্টিপাথর হ'ল 'রস' কারণ "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। এই 'রস' অনির্ব্বচনীয়। কটু তিক্ত অম্ল মধুরাদি যেমন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, —মনবুদ্ধির প্রতীতির বিষয়,—কাব্যরস ততোধিক সূক্ষ্ম এবং অনির্ব্বচনীয়।

দেবর্ষি নারদ বলেছেন—"মূকাস্বাদনবৎ"। এই সাহিত্য কাব্য এবং সঙ্গীতের রস "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর:"—শ্রুতি বলেছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে —মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্" ইত্যাদি। মহাকবি বলেছেন—"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে, আমার সুরগুলি ছোঁয় চরণ আমি পাইনে তোমারে"—কারণ এই গানের সুর, প্রাণের প্রেম এবং কাব্যের রস এই সকলেরই মূল উৎস সেই 'রস'স্বরূপ।

শ্রুতি বলেছেন—'রসো বৈ সঃ' যে রস লাভ করলে "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা নন্দীভবত্যমৃতী ভবতি"—জীব আনন্দিত হয়,—স্তব্ধ বা অভিভূত হয়, অমৃতত্ব লাভ করে। তিনিই মধুব্রহ্ম অমৃতব্রহ্ম আনন্দব্রহ্ম, তিনিই ভূমানন্দ বা অতিভূমীমানন্দস্য (acme of joy), তিনি 'রসানাং রসতমঃ' (বৃহদারণ্যক) রসঘন—আনন্দঘন। বৈষ্ণবের অভিধায় তিনি 'হরি'-'কৃষ্ণ'-'রাম'। 'হরি অর্থাৎ, সকল মলিনতা হরণ করেন। 'কৃষ্ণ' কারণ তিনি সকল চিত্তাকর্ষক—'হরে সবার মন'। 'রাম' যেহেতু তাঁকে—মনোভিরামং বচোভিরামং··· সদাভিরামং সততাভিরামম্' বলা হয়। তিনি আত্মারাম।

প্রেমে 'তুমি' ও 'আমি'

ক্রীশ্চান মিষ্টিকদের ভাষায় তিনি Dulce Amore বা sweet Love—মুসলমান সুফীদের ভাষায় তিনি 'মুক' বা প্রেমাস্পদ, ভক্তকবি 'আসিক' বা প্রেমিক। তাঁর বাঁশী শুনে ব্রজগোপী বলেন—"শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎপঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে"। তাঁর আহ্বান শুনে ভক্তকবি বলেন—'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে'? বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী বলেন—'যাইগো ঐ বাজায়

বাঁশী প্রাণ কেমন করে।' মহাকবিও সেই বাঁশী শুনেই বলেন—'সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে না মনমাঝে।" তিনি 'সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারী লীলা-কল্লোলবারিধিঃ'।

এই প্রেমের পরিণতি কোথায়? Browning বলেন, "All love assimilates the soul to what it loves." ক্রীশ্চান মিষ্টিকরা বলেন Apotheosis বা Deification বা Attainment of Divine Similitude Divine Assimilation—গীতার 'মম সাধর্ম্যম্'-আগতি বা প্রাপ্তি।

এই প্রাপ্তির ফলেই মহাকবি ঋষিপদবাচ্য হয়েছেন। তাঁর মধ্যে এবং কবির মধ্যে যেটুকু ব্যবধান সেটুকুর কথা কবির ভাষায় "আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দ পূর্ণিমা।" যখন সে ব্যবধানটুকুও থাকে না তখন—

"তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে"

এই 'তুমি', এই মহান্ 'তুমি', এই মহতো মহীয়ান 'তুমি', ইনি কবির 'আমি'কে চান কেন? কবিই তার উত্তর দিয়েছেন:

"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে,
……তুমি তাই এসেছ নীচে।"

অবতরণ ও লীলা

এই 'নীচে'-আসাই অবতরণ এবং অবতারবাদের মূল সূত্র। এই প্রেম শুধু দয়া নয়, বরং বলব দয়াই নয়, কারণ দয়ার ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম এক নয়, এই প্রেমই তাঁর লীলা—তাই বেদান্তসূত্রে পাই "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (২।১।৩৩) দয়ার ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যপ্রধান, প্রেমের ধর্ম্ম মাধুর্য্যময়। কবি তাই বলেছেন:

"তাই তো প্রভু হেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

চরিতামৃত বলেন:

'ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান,
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান।'

এবং 'বৃহৎ বস্তু ব্রহ্ম কহি,—শ্রীভগবান
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে বলছেন :

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর।

এই প্রেমে আগম আছে নিগম নাই। জীব আত্মনিবেদন করেও তবু লজ্জিত ভীত হয়ে পিছিয়ে আসে—"The self resists the pull……flees from the touch of Eternity and the Eternal seeks it, tracks it ruthlessly down"(—Underhill).

তাই দেখি "অঞ্চল ধরইতে চঞ্চল কান
রাই করল পদ আধ পয়ান।"

'দেবতাকে প্রিয় করা' 'প্রিয়কে দেবতা করা'র কাজে—রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব কবি, বাংলার বাউল কবি, এবং ক্রীশ্চান মিষ্টিক বা মরমিয়া কবি এবং মুসলমান স্থফী সাধকেরা,—সকলেই সগোত্র। 'এক' এবং 'অদ্বৈত' তিনি—"ওয়াহিদাহু লা শরিক্"—বলেন মুসলমান।

শ্রীভগবান উত্তম পুরুষ বা গীতায় বর্ণিত 'পুরুষোত্তম'।

কবি তাঁর প্রতীক্ষায়, পথিকবধূর মত, 'ব্রজসুন্দরস্থ সখি! নূপুরধ্বনিং—নিশময্য সংভৃত-গভীর-সম্ভ্রমা,'—হ'য়ে—

—ঈক্ষণোত্তরলা' হ'য়ে—চেয়ে আছেন,—
"আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম!
চাই যে বারে বার
পরাণসথা বন্ধু হে আমার।"

কখনও প্রগাঢ় প্রত্যয় বক্ষে আঁকড়ে বসে আছেন, দেখতে না পেলেও—

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছো নয়নে নয়নে,—
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।"

'মিষ্টিক' রবীন্দ্রনাথ

তাই যখন এই প্রসঙ্গে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়কে তাঁর রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকায় বলতে শুনি—'মিষ্টিকের সাধনা ও রবীন্দ্রনাথের সাধনা এ দু'য়ের কোথাও মিল

নাই" (!) তখন মনে না করে পারি না যে, তাঁর রবীন্দ্র সাহিত্যের 'ভূমিকা' থেকে 'ভূমি'-টাই সরে যাচ্ছে যেন !' চিন্তাশীল পাঠক পাঠিকারা তার বিচার করবেন, কারণ আমরা কবিগুরুর অন্তরলোকের এই অপরূপ দিকটাই দেখবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছি।

কোন আধুনিক সমালোচক গান্ধীর জীবন থেকে তাঁর আস্তিক্য বা ঈশ্বর বিশ্বাস বাদ দিয়ে গান্ধীজীর জীবন-বেদ বিচার করতে চেষ্টা করেছেন ! রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী থেকে তাঁর মিষ্টিক দৃষ্টি, মরমিয়া সাধনা বা বৈষ্ণব ভাবধারা বাদ দিতে গেলেও ঠিক তেমনি হয়—'বিচেষ্টিতং তেহর্ভক চেষ্টিতং যথা',—অর্থাৎ সে চেষ্টা বালকের চেষ্টারই মত !

কবির পত্র ও জীবনী

বৈষ্ণব কবিতার প্রতি তাঁর অনুরাগ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং একখানি পত্রে লিখেছেন, "আমার বয়স যখন তের-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ এবং আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলী পাঠ করেছি ; তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলাম।" (রবীন্দ্র-জীবনী প্রভাত মুখো:, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১) "আগাগোড়া গীত-গোবিন্দখানি তিনি নকল করিয়া লইয়াছিলেন"..."সংস্কৃতের শব্দলালিত্য রূপকল্পনা ছন্দমাধুর্য্য বাল্যবয়স হইতেই তাঁহাকে এই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে।" (ঐ, পৃঃ ৭০)

তাঁর উড়িষ্যা ভ্রমণের প্রসঙ্গে পাই—"অন্যবার বরাবর আমার সঙ্গে বৈষ্ণব কাব্য এবং সংস্কৃত বই আনি, এবার আনিনি সে জন্য ঐ দুটোরই প্রয়োজন বেশী অনুভব হচ্ছে।" (ঐ পৃঃ ২১৮)

"রবীন্দ্রনাথের মতে যেখানে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিত ভাবে কাজ করে বা এক কথায় যেখানে আদত মানুষ আপনাকে প্রকাশ করে, সেখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়। পর্য্যবেক্ষণকার মানুষ 'বিজ্ঞান' রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ 'দর্শন' রচনা করে,—আর 'সমগ্র মানুষ'-টি সাহিত্য রচনা করে।" (ঐ পৃঃ ২৫২)

'সাধনা' পত্রিকায় চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়তত্ত্বের' প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি-তর্ক,—বলিষ্ঠভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে বৈষ্ণব-দর্শনকেই প্রতিষ্ঠা করে। তিনি বলেন, "চন্দ্রনাথবাবু সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ী পাকাইয়া তুলিয়াছেন যাহা অভূতপূর্ব্ব। প্রথম কথা, ক্ষুদ্র অনুরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ

বুঝিতে পারি কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ হইতে নিরনুরাগের ক্রমবাহী যোগ কোথায় বুঝিতে পারি না।' দ্বিতীয় কথা, 'সৃষ্টি-কৌশলে'র মধ্যে 'বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা' দেখিয়া লয়প্রার্থী কি করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'লীলা' কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? লীলা কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র প্রকাশ নহে? 'সৃষ্টি-কৌশল' জিনিসটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোনও যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে? সৌন্দর্য্যের একমাত্র কার্য্য · হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেমস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন,—সৃষ্টির সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভালবাসেন এই সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অনেক নিয়মপাশে বাঁধিয়া, আমাদিগকে বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইতে চাহেন তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশেষ সৌন্দর্য্যে তিনি আমাদিগকে বংশীস্বরে আহ্বান করিতেছেন, তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান।

বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের রূপ এই বিশ্বসৌন্দর্য্যের এই প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্য্য বিরাট লয়প্রার্থীকে যে কি করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে 'মজাইতে' পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"···

"চন্দ্রনাথবাবু প্রমুখ শিক্ষিত সাহিত্যিকগণ ও 'বঙ্গবাসী'র লেখকগণ বাংলাদেশে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের প্রবর্তক না হইয়া তাহার বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন···দেশের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথবাবু উপলক্ষ্য মাত্র।" তিনি (রবীন্দ্রনাথ) "যে জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে, তাহার বিশ্বাসের বল পাকা চাই বিশ্বাস বলিতে কতকগুলি অমূলক বিশ্বাস কিম্বা গোঁড়ামির কথা বলি না, কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি "···সেই জন্য তিনি যুক্তির উপর জোর দিয়াছেন গুরুবাদের উপর নহে।

"আদিম সম্বল' প্রবন্ধটিতে তিনি বলিলেন যে, মানুষের যুক্তির পথ রুদ্ধ করিয়া, তাহাকে কলের মত চালাইয়া নির্বিরোধে কাজ আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের চরম সম্পদ মনুষ্যত্ব সেখানে লুপ্ত হইয়াছে। 'সেখানে চিন্তা, যুক্তি, আত্ম-কর্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে ভ্রম বিরোধ সংশয় প্রভৃতি মানবের

ধর্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কলের ধর্ম কাজ করা তাহাই চলিতে থাকিবে।' (সাধনা ১২৯১, আষাঢ় পৃঃ ১৮০) "কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।" (রবীন্দ্র-জীবনী, পৃঃ ২৫৪-৫)

প্রেম ও প্রেমিক

দার্শনিক প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। আমাদের চোখে বৈষ্ণব কবিদের ভগবৎ প্রেম,—ক্রীশ্চান মিষ্টিকদের মরমিয়া প্রেয—মুসলমান সুফী প্রেমিকের প্রেম এবং মহাকবির 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যের এবং গীতি কবিতার অঞ্জলিতে গীতিভরা প্রেমের মধ্যে 'অমিল' অতি অল্পই, মিল-ই বেশী। কারণ—

"শশীকো কুমুদন বহুৎ হ্যায়" কিন্তু "কুমুদন্‌কো শশী এক"।

এই শশীকে বৈষ্ণব কবি বলেছেন মহাপ্রভুর মুখে—

"ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর"। (চরিতামৃত)

এই 'কৃষ্ণ' কে 'কৃষ্ণ'ই বলুন 'খৃষ্ট'ই বলুন আর বৈজ্ঞানিকের ভাষায় 'x'-ই বলুন তাতে কিছুই আসে যায় না।

দেবর্ষি তাঁর ভক্তিসূত্রে ভক্তদের সম্বন্ধে বলেছেন :—

"নাস্তি তেষু জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদি ভেদঃ"

প্রেমভক্তিই বৈষ্ণব কবির পাথেয় এবং পথ, উপায় এবং উপেয়, সাধনা এবং সিদ্ধির ফল। প্রেম স্বয়ংই ফলরূপ—

"স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ" (নারদ ভক্তিসূত্র)।

এই প্রেমই তাঁদের মোক্ষের পরেও পঞ্চম পুরুষার্থ।

"পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম আনন্দের সিন্ধু,—মোক্ষাদির আনন্দ তার নহে এক বিন্দু"। তাই ভাগবতকার 'প্রোজ্ঝিত কৈতব' বা সকল প্রকার কৈতব (কপটতা) বর্জ্জিত এই প্রেমধর্মের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'প্রোজ্ঝিত কৈতব' শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেছেন, "প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি লক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ,—'প্র-শব্দেন' মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ, কেবলমীশ্বরারাধনা-লক্ষণো ধর্মো নিরূপ্যত ইতি"।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রেমে 'কেন' 'কি হবে' এ সব প্রশ্ন থাকতেই পারে না, প্রেম আপনাতেই আপনি জবাবদিহি, প্রেম আপনি আপনার লক্ষ্য"। অশ্বিনীকুমার দত্ত ভক্তিযোগে উদ্ধৃত করেছেন সুপরিচিত গানের একটি

কলি—"ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে···আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে"।

অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার বলেছেন, আনন্দছন্দধৃত জীবনে বন্ধন কোথায় যে মুক্তির জন্য হবে তার আস্পৃহা? প্রেম আনন্দস্বরূপ···বুদ্ধির সীমাকে অতিক্রম করে প্রেমের গতি। এই প্রেমের গতিতে দ্বৈত রূপান্তরিত হয় অদ্বৈতে, অদ্বৈত রূপান্তরিত হয় দ্বৈতে'। ('রবীন্দ্র স্মৃতি' 'পূর্বাশা-পত্রিকা পৃঃ ২৫)

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন :—

অস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহং ইতি ত্রিধা।

ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ।

অর্থাৎ সাধনার পরিপাকে, তার আমি,—আমার তিনি,—এবং আমিই তিনি,—ভক্তের এই ত্রিবিধ অনুভূতিই হয়ে থাকে।

এই প্রেমকে পাবার জন্য কোনও রহস্যাত্মক নিগ্রহপূর্ণ নৈষ্ঠিক বিধি-বিধানপূর্ণ তপস্যার প্রয়োজন হয় না, ধ্যান ইহার সহজাত তপস্যা। ইহার মূল্য সহজ এবং সুলভ হয়েও দুর্লভ। তাই আচার্য্যেরা বলেন,—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং কল্পকোটিসুকৃতৈ র্ন লভ্যতে।"

অর্থাৎ পাবার লালসা এবং চাইবার ঐকান্তিকতাই এর মূল্য। এই প্রেম ব্যতীত জীবনের একান্ত ব্যর্থতা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ তাই অনুযোগ করেছেন—

"যদি প্রেম দিলে না প্রাণে—
তবে কেন ভোরের হাওয়া ভরে দিলে এমন গানে গানে।"

আবার প্রাণে যখন প্রেমের স্পর্শ লাভ করলেন, তখন তিনি প্রেমিকার ন্যায় অনুযোগ ক'রে ব'লেছেন—

তবে, পরাণে ভালবাসা কেন বা দিলে রূপ না দিলে যদি বিধি হে
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?
* * যত গোপনে ভালবাসি পরাণভরি, পরাণভরি উঠে শোভাতে
যেমন কালো মেঘে, অরুণ আলো লেগে, মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।
* * তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহিনে তারে,—নীরবে থাকে তাই রসনা
মুখে সে চাহে যত, নয়ন করি নত, গোপনে মরে কত বাসনা।

'গুপ্তপ্রেম'।

প্রেমাস্পদ

ভক্তিসূত্রে নারদ বলেছেন "সা কস্মৈচিৎ পরম-প্রেমরূপা" অর্থাৎ নর বা নরোত্তম নির্ব্বিশেষে কাহারও প্রতি পরম প্রেমভাব। শাণ্ডিল্য বলেছেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। অর্থাৎ, "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা" (পঞ্চরাত্র)—বিষ্ণুর প্রতি প্রেমসম্মিত অনন্যমমতা।

রবীন্দ্রনাথ যেন নারদের সূত্রকে এনে শাণ্ডিল্যসূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন; 'প্রেয়'কে এনে 'শ্রেয়'কে সমর্পণ করেছেন,—যাতে "তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্ব প্রেমতৃষা"। 'কিম্' শব্দের এই অনির্দ্দেশ্য উদ্দেশ রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছেন—বলেছেন,—

"কে সে? জানি না কে, চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি তাঁরি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছেন 'অপরূপ' এবং সারাজীবন এই 'অপরূপকে দেখে' গেছেন 'দুটি নয়ন ভরে'। এই অপরূপকে কেউ বলেছেন 'শ্যাম' কেউ বা 'শ্যামা', এই সব ভিন্ন ভিন্ন অভিধা দ্বারা সকল ভাষা মিলে গিয়েছে সেই এক সমুদ্রে—"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি"—(শ্রুতি) কারণ "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" (শ্রুতি)

যদিও তিনি অনির্ব্বচনীয়—'ইদম্'-'এতদ্'-'এতাবৎ'-পদের অবিষয়, তথাপি যিনি কবি তিনি তাঁকে উপলব্ধি করে থাকেন—"তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম।" কৌতূহলী লোকের প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছেন:

কতো জনে এসে মোরে ডেকে কয়
'কে গো সে'—শুধায় তব পরিচয়
'কে গো সে'?
তখন কী কই নাহি আসে বাণী
আমি শুধু বলি 'কী জানি কী জানি'—
তুমি শুনে হাসো তারা দুষে মোরে
কী দোষে।"

তবু 'জানি না' বললেও সত্য বলা হয় না—তাই আবার বলেন,—

তাই—"তোমায় 'জানি না চিনি না' একথা বলতো কেমনে বলি
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও খনে খনে যাও ছলি।
কখনো—'আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায় লখিতে'
কখনো—'বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছো চরণ চকিতে'
তাই হাল ছেড়ে দিয়ে কবি বললেন,—
কাজ নাই তুমি যা খুসি তা করো
ধরা নাই দাও মোর মন হরো
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন পুলকি।"

কাম ও প্রেম

কাম ভোগাত্মক, প্রেম ত্যাগাত্মক। ভোগাত্মক কামকে যে চিন্তামণির প্রভায় এবং প্রভাবে ত্যাগাত্মক বিষ্ণুপদী-প্রবাহে পরিণত করে তাকে "নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" (মহিম্ন স্তোত্র) অথবা "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে" (মুণ্ডক) মিলিয়ে দেওয়া যায়—সেই চিন্তামণিই প্রেম।

নরনারীর অন্তর্দ্দাহকারী ভোগতৃষ্ণা বা 'তহ্না'কে "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেমে"—পরিণত করা—এই প্রেমের মহিমময়ী শক্তি।

(চৈতন্য চরিতামৃত)

নারদ বলেছেন, "তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্", রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমসূত্রকে নূতন ভাষ্যে উদ্ভাসিত করেছেন তাঁর অপরূপ "বৈষ্ণব কবিতায়",—

"দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

এই প্রেমের সুধাধারায় নরনারী অমৃতত্ব লাভ করে।

এই প্রেম যুগপৎ রসায়নের উর্দ্ধপাতন (sublimation) এবং প্রাণিতত্ত্বের metamorphosis বা রূপপরিবর্ত্তন। annihilation বা উচ্ছেদ নয়, transformation বা রূপান্তর—যেমন গুটিপোকা শূকদেহ থেকে প্রজাপতিদেহ লাভ করে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে—এই দেহমন ভূমানন্দময় হবে—বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে।"—'লয়'

হওয়ার অর্থ ছড়িয়ে গিয়ে বিশ্বে এবং বিশ্বাত্মায় লীন হওয়া। অন্তর তখন আপন অন্তরের সুখ-দুঃখে অভিভূত না হয়ে বিশ্বের সুখ-দুঃখ অন্তরে অনুভব করে। নিপীড়িত মানবের বেদনায় তখন কবির অন্তরের সহস্র নাড়ী পাক দিয়ে ওঠে। এই অনুভূতিই আইনষ্টাইনের 'Cosmic religious consciousness'।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

মহাকবির 'দুই পাখী' যেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "দ্বাসুপর্ণা।" সেখানে দেখি একটি পাখী স্বাদু পিপ্পল ফলটি বা বাইবেলের নিষিদ্ধ ফল (forbidden fruit)-টি ভোজন করে,—আর অপরটি 'অনশ্নন্ অভিচাকশীতি'—না খেয়ে শুধু দেখেন সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে চেতা এবং সাক্ষীরূপে।

এখানে দেখি মুক্তাত্মা বনের পাখী ডাকছে দেহের সোনার খাঁচাটিতে আবদ্ধ জীবাত্মাকে। 'দোঁহার ভাষা দুই মত'—খাঁচার পাখী বনের গান জানে না, তাই খাঁচার পাখী বলে "খাঁচাটি পরিপাটি কেমন ঢাকা চারিধার," বনের পাখী বলে "আকাশ ঘন-নীল কোথাও বাধা নাহি তার।"

"এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে তবুও কাছে নাহি পায়
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে নীরবে চোখে চোখে চায়।"

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

মহাকবি একাধারে ঋষি এবং কবি, যেমন মহাত্মা গান্ধী একাধারে ঋষি এবং অহিংস যোদ্ধা। উভয়েই কাব্যে এবং যুদ্ধে স্বাধীনতার নব জাগৃতির যুগশঙ্খ ধ্বনিত করেও, মানব অভীপ্সার শাশ্বত লক্ষ্য সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের অনুসরণ মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি। উভয়েরই 'জীবন' এবং বাণী'—'লাইফ' এবং 'মেসেজ'—কবিতার মতই মিত্রাক্ষর। 'যা বলি তাই কর—যা করি তা ক'রো না'—এ কথা বলবার অবকাশ নেই উভয়েরই জীবনে। রবীন্দ্রনাথকে তাই গান্ধীজি বলেছেন,—The Great Sentinel বা ভারত ঐতিহ্যের মহান্ প্রহরী

কবি তাঁর আত্ম-পরিচয়ে বলেছেন—

"আমার রচনার মধ্যে যদি কোনও ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে ত সে হচ্ছে এই যে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই সেই ধর্ম্মবোধ। যে প্রেমের একদিকে 'দ্বৈত' আর একদিকে 'অদ্বৈত'। একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন। একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম,—এক হয়ে গেছে। যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার

করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে। যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে,—মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে মানে,—এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।"

কবির উদ্ধৃত বাক্যে ভগবৎ প্রেমের এই যে যুগপৎ দ্বৈতাদ্বৈত উপলব্ধি এ যেন ভগবান শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের আক্ষরিক অনুবাদ—"ভেদং চিন্তয়িতুমশক্যত্বাৎ অভেদঃ—অভেদং চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদঃ"। এই তত্ত্ব অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয়। আচার্য্য শঙ্করও স্বীকার করেছেন শ্রুতির উভয়মুখিতা, স্বীকার করেছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"—তবু তাঁর কল্পনার ঘুড়ি এক কানাচে ঝোঁক থাকার জন্য একদিকেই ঢলে পড়েছে। কিন্তু সে কথা এখানে বলবার স্থান নয়।

মহাপ্রভুর মুখে একদিকে পাই "কৃষ্ণ যদি কৃপা করি, কহে মোরে প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী অভিমান।" আর অন্যদিকে শ্রীরামানন্দের গানের সমর্থনে পাই—"না সো রমণ না হাম রমণী, দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি" অর্থাৎ উপনিষদের সংপরিষ্বক্ত সত্তা।

রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে পুরাণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের মুখে,—

"মমার্দ্ধাংশ স্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী" (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

অথবা "আত্মাতু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞঃ প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ"

অথবা ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
রাধাহ্লাদ সমাশ্লিষ্টঃ মাধুর্য্যামৃতসাগরঃ ॥

শ্রুতি বলেন—

"স…একাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ, সোঽকাময়ত
জায়া মে স্যাৎ"—অতঃপর—"স হ এতাবান্ আস যথা
স্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ, স ইমম্ এব আত্মানং দ্বেধা
অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচ অভবতাম।" (বৃহ ১।৪।৩)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্বটি কবি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন (১৩০২ অগ্রহায়ণ—'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৪৯ দ্রষ্টব্য), এই পত্রে দ্বৈতাদ্বৈত মতকে বৈষ্ণব ধর্ম্মমত বলিয়া প্রকাশ করেন। (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৮)

রবীন্দ্রকাব্যে 'তত্ত্ব' ও 'রস'

রবীন্দ্র-রচনা একদিকে যেমন অন্তর্গূঢ় ভাবগম্ভীর অন্যদিকে তেমনি বাক্যের এবং অর্থের সামঞ্জস্য সাধনে প্রতিভান্বিত প্রকাশমুখর— বিশ্বতোমুখী।

'হৃদয় যমুনা'য় কবি আহ্বান জানিয়েছেন—"নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ, ঢেকে দিব সব লাজ সুনীল জলে"—কিন্তু জীবনের আশা রেখে এস না—"যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে··· মৃত্যুসম নীলনীর স্থির বিরাজে", "যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে, ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে'—কারণ এখানে কাজ নেই, লাজ নেই, ফিরে পাবার কিছু নাই।

এখানে 'look before you leap' নেই—you leap and be lost for ever, এক মরণে মরে চিরদিনের মত অমর হওয়ার এই বাণী।

'ব্যর্থ যৌবন' কবিতাটিতে 'বৃথা অভিসারে এ যমুনা পারে' আসার ব্যর্থতার নিঃশ্বাস সুস্পষ্ট।

'রবীন্দ্রজীবনী'কার বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মধ্যে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের বহু চিত্র ও পদাবলীর বহু শব্দ প্রায়শই দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বহুদিনকার। কিন্তু এ আকর্ষণ তত্ত্বমূলক না রসমূলক, তাহার সুবিচার হওয়া প্রয়োজন।"

আমাদের বক্তব্য এই যে, যে রাজ্যে গিয়ে এই তত্ত্বের কথা এবং 'রসের' কথা উঠেছে সেখানে তত্ত্বই রস এবং রসই তত্ত্ব। সেখানে ভাবের ঘরে সদর মফস্বল নেই, bed-room—drawingroom-এর প্রকোষ্ঠ ভাগ নেই; একটি কক্ষ, যবনিকার বালাই নেই, ধর্মের চিহ্নে বা রক্তের সম্পর্কে এই আত্মীয়তা হয় না শুধু এক সম্পর্ক প্রেমের,—"যে জনা গোবিন্দ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।" এ ভজনা রসের ভজনা, মরমিয়া ভজনা, ঋজুতা বা আর্জ্জবম্ এর প্রাণ, কিন্তু বাঁকা পথেই এর লীলাময়ী গতি প্রেম এখানে স্বতঃসিদ্ধ:—তাই রসিক বলেন, "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।"

স্বতঃস্ফূর্ত্ত এই প্রেম

মহাকবির ভাষায় শুনুন—

আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো
তোমা ছাড়া আর এ জীবনে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে আর কিছু নাহি চাই গো।

এ যেন মহাপ্রভুর উক্তির বঙ্গানুবাদ—

"পাদরতাং পিনষ্টু মাং" "মর্ম্মহতাং করোতু বা"

"যথা তথা বা বিদধাতু"—কিন্তু আমার—'তুমি ছাড়া

আর কেহ নাই—কিছু নাই—"স এব নাপরঃ"।

গীতায় আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী ভক্তের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলেছেন—

"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী"—অর্থাৎ এই পরা ভক্তিই জ্ঞানের লক্ষণ বা পরিচয়।

প্রেমবিহঙ্গের দুটি ডানা, একটি জ্ঞান অপরটি ভক্তি।

বায়রণ বলেছেন—

"To 'know' her is to 'love' her
And love but her for ever
For Nature made her what she is
And never made another."

রক্ত-মাংসের পুত্তলিকার প্রতি এই আকর্ষণ, চিন্তামণির পায়ে বিল্বমঙ্গলের এই আত্মসমর্পণ, ইহাই পরিণত হয় তাঁর কৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম পংক্তিতে—

"চিন্তামণি র্জয়তি সোমগিরি গুরু র্মে।"

চিন্তামণির লৌকিক প্রেম, চিন্তামণির একটি রশ্মি পেয়ে, চিন্তামণির অলৌকিক প্রেমে পরিণত হয়,—তখন সে হয় "নিকষিত হেম—কাম-গন্ধ নাহি তায়।" তখন তার অন্তরাত্মা আকুল হয়ে বলে—"যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।"

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ' (কঠশ্রুতি)—কিন্তু ঐ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি ঐরূপ বাঁশীর ডাক শুনেই পরমাত্মা বা অন্তরাত্মার দিকে দৃকপাত করে। বাঁশী শুনে ব্রজগোপী বাঁকা চোখে চায়—

"শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল।"

রবীন্দ্র-রচনাতেও ঠিক তাই—

"সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
বনমাঝে কি মনমাঝে।"

তাঁর বিরহিণী অন্তরাত্মা আক্ষেপ করে বলে—

"সখি—এত ভালবাসা প্রাণের পিয়াসা কেমনে আছে সে পাসরি
সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী সেথা কি বাজে না বাঁশরী?

হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন সেথা কি পবন বহে না—
সে যে তার কথা মোরে, কহে অনুখন,
মোর কথা তারে কহে না।
আমারে যদি সে ভুলিবে সজনি! আমারে ভুলালে কেন সে?
সারাটি জীবন করিব রোদন এই ছিল তার মানসে?"

দেবতা ও মানুষ

বৈষ্ণব-কবিতায় দেবতা ও মানুষ একান্ত সহজভাবে স্থানবিনিময় করেছে। যশোদা তাঁকে বেঁধেছেন,—রাখালরা—"কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপনা সেবন।" শ্রুতি বলেছেন, প্রিয়ং বলেই আত্মাকে উপাসনা করবে, কারণ তিনি "প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষশ্চক্ষুঃ"। গীতায় তাঁকে গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, শরণ, সুহৃৎ প্রভৃতি সকল সম্পর্কে সম্পর্কিত করা হয়েছে। সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করে একমাত্র তাঁর শরণ নিতে বলা হয়েছে—ভক্ত নিরাকার স্মরণে নিত্যই তাঁকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে থাকেন, বলেন,—"মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়ামি স্বাহা।" তাঁর সাধনার প্রথম কথা তৃণের চেয়ে সুনীচ এবং তরুর চেয়েও সহিষ্ণু হওয়া। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় কবির আত্ম-নিবেদন—

তোমার আসন তলে মাটির পরে লুটিয়ে রব
তোমার চরণ ধূলায় ধুলায় ধূসর হব
সবার শেষে বাকী যা রয় তাহাই লব।

এই 'বাকী' গ্রহণ করাই বৈষ্ণবের প্রসাদ পাওয়া—ঈশোপনিষদের ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'। "আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি"—গীতা ২।৬৪

গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতাতেও পাই এই বৈষ্ণব ভাব, কিন্তু ভাষায় এবং প্রকাশভঙ্গীতে, প্রাক্তন বাংলা ও সংস্কৃত উভয় পদাবলীকেই তা অতিক্রম করেছে। আমার মাথা তোমার চরণধুলার তলে নত কর; সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডোবাও—নিজেকে মান দিতে গিয়ে আমি নিজেকে কেবলই অপমান করছি, এবং নিজেকে কেন্দ্র করে নিজের চারিদিকেই ঘুরে মরছি। কথা কয়টি সহজ এবং সরল, কিন্তু "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" এই সহজ কথা কয়টি এমন ভাবে বোধ হয় একমাত্র মহাকবিই প্রকাশ করতে পেরেছেন। তিনি অবলীলাক্রমে নিসর্গের গুপ্ত কথা তাঁর 'প্রকাশ' কবিতায় প্রকাশ করে দিয়েছেন, তিনি রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতন আহরণ

করে তাঁর দয়িতের গলায় মুক্তার মালা পরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর আগমনীর জয়ধ্বনি করেছেন—

"ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ম্ময়, তোমারি হউক জয়—
তিমির-বিদার-উদার অভ্যুদয় তোমারি হউক জয়।"

তাঁর পায়ের ধ্বনি, অবিশ্বাসী অন্যমনস্ক আমরা শুনি নি বলে অনুযোগ করেছেন—

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে আসে আসে
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী সে যে আসে আসে আসে
গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে ক্ষ্যাপার মত
সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী।

ক্রীশ্চান মিষ্টিক বলেন,

"Our Lord says to every living soul, I become man for you. If you do not become God for me, you do me wrong."

তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, চোখের চোখ।

Closer is He than breathing, nearer than our hands and feet.

বৈষ্ণব কবির—"হাতকি দরপণ, মাথকি ফুল আঁখ কি অঞ্জন মুখকি তাম্বুল। শীতের ওড়নি পিয়া, গিরিষির বা বরিষায় ছত্র পিয়া দরিয়ার না।"

ভক্ত তাঁর 'আমি'র—শেষ লেশটুকু রাখতে চান তাঁর প্রেম আস্বাদনের জন্য। তাই রামপ্রসাদ বলেছেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি'। রামকৃষ্ণ একে বলেছেন 'দাস' আমি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তোমায় আমার প্রভু করে রাখি
আমার আমি সেইটুকু থাক বাকী।"

কবি কৃতার্থ হয়েছেন যখন ত্রিভুবনেশ্বর তাঁরই প্রেমের ভিক্ষায় হাত পেতেছেন—

"তাই ত তুমি রাজার রাজা হয়ে, তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছো কত মনোহরণ বেশে, প্রভু নিত্য আছ জাগি

তাই ত প্রভু হেথায় এলে নেমে,—তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,—মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে—সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

দৈন্যে তিনি দীনের হতেও দীন হয়েছেন, তিনি জেনেছেন যে, তাঁর ঠাকুর কাঙ্গালের ঠাকুর তাঁর পূজার পীঠস্থান সবহারাদের মাঝে—"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন, সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে, সঙ্গী হয়ে আছ সেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে—

সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।

কবি কামনা করেছেন 'মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্ম নিবেদনে'—তিনি বিশ্বাস করেছেন 'মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'।

তিনি এসেছেন, "ধরণীর মহাতীর্থে যেখানে সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা।"

চণ্ডিদাসের উপলব্ধিও অনুরূপ "শুনহ মানুষ ভাই,

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

তাই প্রত্যেক পুরাণে এবং মহাভারতে নারায়ণের বন্দনা নর এবং নরোত্তমের বন্দনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ

'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ'।

নর এবং নরোত্তম বলিতে বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্যে সাধারণ মানুষ এবং পুরুষোত্তম বা 'Best Manকেই বোঝায়, এই উভয় সীমায় সীমিত মানুষের নারায়ণ। এই সীমা অতিক্রম করেও তিনি আছেন—শ্রুতি যেন মানুষের ধীশক্তিকে পরিহাসের ছলেই বলেছেন,

"যো লোকান্ সকলান্ ব্যাপ্য অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্"

সকল লোক সকল সীমা—দেশকাল অতিক্রম করে তিনি 'দশ আঙুল' বেড়ে আছেন! এ যেন "বুঝ জন যে জান সন্ধানে"র মত হেঁয়ালি। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ'—তাদের চিন্তার বিষয়ীভূত করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা।

কবির পরিচয়

কবি শুধু কোন দেশ বা জাতি বিশেষের কবি নন—
সকলের কাছেই তাঁর এক পরিচয়,—
"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরি লোক—
আর কিছু নয়—এই হোক শেষ পরিচয়।"

কিন্তু কবির পরিচয়ের 'শেষ' পাবার উপায় নেই—সুরু হয় নব নব পরিচয়—

"যে আমি স্বপন মুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে ?
* * কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে।"

তাঁর ভাষাতেই বলি,—'তিনি জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্য্যে আপনাকে নির্ব্বিশেষে সর্ব্বলোকের উপরে বর্ষণ' করছেন। সে বর্ষণে অভিভূত হয়ে আমরা বলি—

"হায় ! গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা ?
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি নে সেবা !"

বৈষ্ণবের মতই তিনি হরিনাম গান করেছেন—এবং করিয়েছেন—

'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি বল ভাই ধন্য হরি।'

আপনাকে কবি যন্ত্রমাত্র মনে করে সেই যন্ত্রীর হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন—

'আমারে কর তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে।'

বলেছেন—'সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো—
এতদিন যে গেয়েছো গান, আজকে তারি হোক অবসান
এ যন্ত্র যে তোমার যন্ত্র সেই কথাটাই ভোলো—
একটি একটি কোরে তোমার পুরাণ তার খোলো।'

এই নূতন তারে নূতন সুর বেঁধে তোলাই তাঁর রূপান্তর গ্রহণ—মার্কণ্ডেয়ের নব জন্মলাভ—transformation, transmutation বা metamorphosis —অধ্যাত্মিক 'খোলস ছাড়া' বা spiritual ecdysis.

নূতন বাঁধা সেতারে কবি গাইলেন শুধু 'তুমি' আর 'তুমি'—কবীরের ভাষায়—'তু তু করতে তু ভয়া তুঝ মে রহা সমায়।'

গীতার উক্তি 'ততো মাং, তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।'

কবি গাইলেন—'তুমি আমার আপন তুমি আছ আমার কাছে
আমায় এই কথাটি বলতে দাওহে বলতে দাও—
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে—* *
* * আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।'

হে প্রকাশ স্বরূপ! তুমি নিজের দাক্ষিণ্যে আপনাকে প্রকাশিত কর—আবিভূত হও—'আবিরাবির্ম এধি।'

কবির প্রার্থনাও তাই,—'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে—
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।'

সেই দৃষ্টি যখন চোখে লাগল,—তখন পরিপূর্ণ আনন্দে কবি গেয়ে উঠলেন,

আলোয় আলোময় করে হে এলে আলোর আলো—'

তখন সকল আঁধার মিলালো, তখন আনন্দে হাসিতে ভরা জগতের—

'যে দিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো।'

অমৃতের পুত্র হয়ে লাভ করলেন মধুব্রহ্মের মধু।

প্লেটোর Beauty only and alone and separate and eternal' এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিলের 'Hedonism' বা 'সুখাভিলাষ'-বাদ',—মিলে যায় 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর অনুধ্যানে।

বৈষ্ণবের দৈন্য, বিনয়, আকুতি, অনন্যমমতা—রূপ প্রেম,—হরিনামের জয়ধ্বনি,—সবই মহাকবির কবিতায় নূতন ভাবে এবং নূতন ভাষায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সে ভাষার তিনিই স্রষ্টা, প্রবর্ত্তক এবং প্রচারক। সাহিত্যের নব যুগের নব জাতকের ভাষা। তাই বলা চলে যে, তিনি যেন পুকুর কেটে,—তার পরে তাতে স্নান করেছেন। এই ভাষা তিনি দান করেছেন আমাদের, এই ভাষাই—রেনেসাঁসের ভাষা। এই ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করল কবির কবিতায়—বৈষ্ণবের দিব্য প্রেম। 'যার এক বিন্দু জগৎ ডুবায়'—যার এক বিন্দু ভাষান্তরিত হয়ে পাশ্চাত্য বিদগ্ধমণ্ডলীকে মুগ্ধ করল—কবি লাভ করলেন—

'শুক্ল কেশে বরমাল্য রম্যা অরোরার'—অর্জ্জন করলেন নোবেল পুরস্কার, স্থাপন করলেন বঙ্গভারতীর সিংহাসন—বিশ্বভারতীর উচ্চতর মঞ্চে।

বিশ্ব-বৈষ্ণবতা

তিনি প্রচার করলেন উদার এবং ব্যাপকভাবে বৈষ্ণবতা। সব ঠাঁই তাঁর ঘর আছে এবং ঘরে ঘরে তাঁর পরমাত্মীয় আছে। 'ধূলির ধূলি আমি এসেছি ধূলি 'পরে—জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে।' উদার সার্ব্বভৌম প্রীতি এবং জগৎপিতা মহেশ্বরের প্রতীতি—যার ফলে অনুভূত হ'ল—'ভ্রাতরো মানবাঃ সর্ব্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।' গীতার,—'সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্' (১৮।৫৪) 'ধূলার আসনে বসি, ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে, আলোকের অতীত

আলোকে—' সেই আলোকেই দেখেছেন—'One world spiritually aware and psychologically integrated.' শ্রীভাগবতও ঠিক এক কথাই বলেছেন—উত্তম ভক্তের লক্ষণে—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।

'আগুনের পরশমণি'

কাব্যে মিলনের চিত্র অপেক্ষা বিরহের চিত্র অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী। বিরহ ধ্যানগম্ভীর এবং বেদনার অগ্নিসংস্কারে পবিত্র এবং উজ্জ্বল। এই আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠার ছবি বৈষ্ণবকবি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এই অবস্থাকে "উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণঃ।" বিরহিণীর এই অবস্থায়,—"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন, "যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং শূন্যং মন্যে জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।" কালিদাসের যক্ষবধূর "আশাবন্ধঃ কুসুম সদৃশং" মর্মাহত প্রাণটিকে কোনও রূপে—দেহে সংলগ্ন করে রেখেছে মাত্র। জয়দেবের বর্ণনায়—"পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে ··পশ্যতি তব পন্থানম্।"

রবীন্দ্রনাথের ছবি জয়দেবের অনুরূপ হলেও অপরূপ :—

"দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি
তাই চমকিত মন চকিত শ্রবণ তৃষিত আকুল আঁখি।
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই
'কে আসিছে' ব'লে চমকিয়ে চাই কাননে ডাকিলে পাখী।"

কবি 'বৈরাগ্যসাধনের মুক্তি' বর্জ্জন করে অনুরাগকেই বরণ করে নিয়েছেন—

"মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া"

কিন্তু এই অনুরাগই,—বিরহে—পরম বৈরাগ্যের রূপ ধারণ করে, তখন, "যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে" সব নিমেষে অন্তর্হিত হয়। তখন

"অদর্শনে তব মনাক্ কা ধেনবঃ কে বয়ম্
কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিত্যচিরতঃ সর্ব্বং বিপর্যস্যতি।"

ভানুসিংহের পদাবলীতে 'মরণ' কবিতায় বিরহিণী রাধা মৃত্যুকে যখন 'শ্যাম সমান' বলে বিরহিণীকে মৃত্যুরূপ অমৃত দান না করার জন্য তাকেও শ্যামের মত প্রিয় এবং শ্যামের মতই নিষ্ঠুর বলেছেন :—

তখন কবি তাঁকে বুঝিয়ে বলেছেন—

ভানুসিংহ কহে ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি
মাধব পহু মম পিয় সো মরণ সে
অব তুহুঁ দেখ বিচারি।

কবীর প্রেমের রাজ্যে বিরহকেই সুলতান বা সম্রাট বলেছেন।

বিরহ বিনা তন শূন্য হ্যায় বিরহ হ্যায় সুলতান
যো ঘট বিরহ ন সঞ্চারে সো ঘট জন্ম মশান।

মহাকবি এই পরম বিরহের প্রশস্তিপাঠ করেছেন অনন্যকরণীয় ভাষায়—

এই করেছো ভালো নিঠুর এই করেছো ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না যে
বজ্রে তোলো আগুন করে আমার যত কালো।

আগুনে দগ্ধ হয়ে যেমন অগ্নিতাপেই কিছু উপশম মেলে—তেমনি আবার কবি তাঁকেই প্রার্থনা করেছেন—

"তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ লহ—
এবার তুমি ফিরো না হে হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ।

কত কলুষ, কত ফাঁকি, এখনো যে আছে বাকী, মনের গোপনে,—আমায়—তার লাগি আর ফিরায়ো না, তারে আগুন দিয়ে দহ;"—বারংবার দগ্ধ হয়েও কবি এই আগুনকেই আবার বরণ করেছেন—বলেছেন—

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন ধন্য কর এ জীবন পুণ্য কর পরশ দানে—
আমার এই দেহখানি তুলে ধর, তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর
নিশিদিন দহনশিখা জ্বলুক প্রাণে।"

এই অগ্নিসংস্কারই প্রেমের Baptism of Fire.

চরিতামৃতে পাই—

"বাহ্যে বিষজ্বালা হয় অন্তরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত লক্ষণ"
"এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।"
"বিষামৃতে একত্র মিলন।" *** ইত্যাদি।

মীরা বলেন—

উপল বরষি তরজত গরজি ডারত কুলিশ কঠোর
চিত্তক চাতক জলদক তেজয়ি মাঙত আনকি ওর ?

মেঘ কুলিশ করকা বর্ষণ করে, তাকে আহত কি নিহত করলেও চিত্তচাতক সেই মেঘ ছাড়া কি আর কাউকে চায় ?

'পুরুষোত্তম' ও 'পুরুষ'

ভানুসিংহের পদাবলী মহাকবির বৈষ্ণব-কবিতায় প্রথম হাতেখড়ি। তখন তাঁর (গীতার) পুরুষোত্তমের প্রতি বৈষ্ণব ভাবানুরাগের প্রথম সঞ্চার হয়। মনে মনে প্রশ্ন ওঠে,—হে অপরিকল্পিতপূর্ব্ব চিত্তচমৎকারকারী মূর্ত্তিমন্ত মাধুর্য্যস্বরূপ তুমি কে ? কবির মুখেই শুনুন—

কো তুহুঁ বোলবি মোয় ?
হৃদয় মাহ মঝু জাগছি অনুখন আঁখ উপর তুহুঁ রচলহি আসন
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম নিমিখ না অন্তর হোয়।
হৃদয়কমল তব চরণে টলমল, নয়নযুগল মম উছলে ছল ছল
প্রেমপূর্ণ তনু পলকে ঢল ঢল চাহে মিলাইতে তোয়।
বাঁশরী ধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে, হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুলি কাকলি ভুবন ভরল রে উতল প্রাণ উতরোয়।
গোপবধূ জন বিকশিত যৌবন, পুলকিত যমুনা মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ পুলকে প্রাণ মন খোয়—
কো তুহুঁ বোলবি মোয় ?

ইনি যেই হোন, যুগে যুগে পারঙ্গম ঋষিরা বলে গেছেন—'ইত্থম্ভূত'—রূপগুণ-বিশিষ্ট পুরুষ একবার অন্তরে প্রবেশ করলে আর অব্যাহতি নাই তার, আর মুক্তি (?) নাই তার সেই দস্যুর কবল থেকে।

মহাপ্রভু বলেছেন—

"কৃষ্ণের সে ডাকাতিয়া বক্ষ
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা সবার মনোবক্ষ
হরিদাসী করিবারে দক্ষ।"

অথবা—

"কৃষ্ণতনু যেন আম্র আঠা
নারীর মনে পশি যায় যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে সিয়াকুলের কাঁটা।

কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে "কো তুহু", প্রশ্ন করার পরে এই পুরুষকেই তিনি পরিপূর্ণ যৌবনে 'জীবন—দেবতা' রূপে দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করেন। তখন তাঁর সহজাত পৌরুষ ঐ পুরুষের সংস্পর্শে এসে আপন সত্তার পরিবর্তন করছে, তাঁর sex sense ক্রমশঃ mystical sense-এ পরিণত হতে চলেছে।

এজন্যই ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা 'ছাড়িয়া পুরুষদেহ কবে বা প্রকৃতি হব'। এই কথাই মীরা বলে পাঠিয়েছিলেন শ্রীরূপ গোস্বামীকে—যখন তিনি রমণী বলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। মীরা বলেন, "বৃন্দাবনে তো এক জনই পুরুষ আছে জানতাম—শ্রীরূপ কি আরও একজন?" সেই এক পুরুষই পুরুষোত্তম। শ্রুতি তাঁকে বলেছেন. ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" "দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম" "পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ'—তাঁকে ঘিরে তাঁর রাসমণ্ডল ঘিরে—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।' ইনি দশরথতনয় রাম বা বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ কিনা—এ প্রশ্ন, দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে অনর্থক। এঁদের জন্ম-কর্ম্ম দিব্য। সার্থক কথা এই এবং দিব্য তত্ত্ব এই যে, রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-চৈতন্য না হলে এই পুরুষোত্তমের কোনও রূপ-রস-তত্ত্ব আমাদের বোধগম্য হ'ত না। তাই এরাই আমাদের yard-stick বা unit ধ্যান-ধারণার জন্য—সেই অসীম অনন্ত অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের। সকল রূপই তাঁর রূপ, সব কথাই তাঁর স্তোত্র, কারণ,—'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।'

মুসলমান সুফী সাধকের দৃষ্টিতেও দেখি ভগবান 'মাসুক' বা beloved—ভক্ত 'আসিক' বা lover, এই মধুর রসই শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস। তাই 'শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি।' পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।' অনেক ক্রীশ্চান মিষ্টিক এই সম্পর্কে বলেছেন—

এই প্রেমের আদান-প্রদান between Finite and the Infinite—সসীমের সঙ্গে অসীমের, একেই তাঁরা বলেছেন Divine Osmosis.

বৈষ্ণব কবি বলেছেন—'যদি হয় তার যোগ, না হয় কৈছে বিয়োগ'—নারদ বলেছেন,—'প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানম্' 'অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্'।

'জীবনদেবতা'য় দেখি কবি পূর্ব্বরাগ থেকে প্রিয়সঙ্গ লাভ করে অনুরাগের স্তরে উন্নীত হয়েছেন, সর্বস্ব সমর্পণের পর দয়িতকে প্রশ্ন করছেন,

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম ?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায় পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।**
** কি দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি ?

তার পরে আবার নূতন করে আত্মনিবেদন করছেন,

'নূতন করিয়া লহ আর বার চির পুরাতন মোরে
নূতন বিবাহে বাঁধিয়া আমায় নবীন জীবন ডোরে।'

ক্রীশ্চান মিষ্টিকগণ একেই বলেছেন, Betrothal,—এই বিবাহে আত্যন্তিক বিচ্ছেদ নেই। সাময়িক বিরহ আছে। তাই ভক্ত বলেন,

'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে তোমারে দেখিতে পাই না।'

শ্রীভাগবত বলেন,

'যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া।'

অর্থাৎ, দেহের দূরত্ব বাড়লে মনের দূরত্ব কমবে, ধ্যান বাড়লে ভাব গাঢ় হবে বলে।

সুন্দরের সঙ্গ

বিরহের বেদনার পর প্রিয়সঙ্গ লাভ করে উৎফুল্ল হয়ে কবি বলেছেন,

'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর !
ধন্য হ'ল অঙ্গ মম পূর্ণ হ'ল অন্তর।'

কবি অভিনন্দিত করেছেন তাঁকে,

'আমার নয়ন ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে !'
'শিউলি তলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে,—

তিনি 'তাঁর অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে' এসেছেন। আলোছায়ার সুষমায় সৌন্দর্যে তাঁর আবির্ভাব, বনদেবীর শঙ্খধ্বনিতে আকাশবীণার তারে বাজে তাঁর আগমনী,—তাঁর সোনার নূপুরে বেজেছে, তবু কবির সন্দেহ সে বাজনা বুঝি wishful thinking—'বুঝি আমার হিয়ার মাঝে'—কিন্তু যখন সন্দেহ দূর হয়েছে, প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে—তখন বলেছেন সাহস করে—

'তোমায় মোরা করব বরণ, মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ দুহাত দিয়ে ফেল ঠেলে।'

এই মিলন, এই সুন্দরের সঙ্গলাভ—

'মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে অতি সুমধুর',—
'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং' বা 'আনন্দং নন্দনাতীতম্।'

শ্রুতি বলেন,

'তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্
এবময়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন
বেদ নান্তরম্। (বৃহঃ ৪।৩ ২০-২১)

বিরহে কবি আবেদন জানিয়েছেন, 'বঁধু হে ফিরে এসো, আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিতে, নাথ হে ফিরে এসো, হে আমার নিতিসুখ, আমার চিরদুখ, হে আমার সব সুখ-দুখ মন্থন ধন, আমার অন্তরে ফিরে এসো'—ব'লে। তাঁর 'সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে' দিয়ে তাঁর ব্যথার পূজায় বারংবার অর্ঘ্যদান করেছেন।

বর্ষণমুখর শ্রাবণে তাঁর 'ক্ষণিকের অতিথি'র ক্ষণিক আবির্ভাবের পর গাইলেন,

'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।'

স্বপনের মত তাঁর আগমন, যেমন মিলিয়ে যাবার শঙ্কা জাগল, অমনি

'হে একা সখা হে প্রিয়তম রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপন-সম যেও না মোরে হেলায় ঠেলে।'

—বলে মিনতি জানালেন। আশার চেয়ে আশঙ্কাই ত বেশী, কারণ তিনি স্বৈরচারী বহুবল্লভ। 'একশ্চরতি ক্ষেত্রেষু স্বৈরচারী যথা সুখম্'। সময় অসময়ের হিসাব নাই। তাই শুনি

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার!'

যখন সেই স্বৈরচারী বন্ধু আড়াল দিয়ে চলে যান,—বৈষ্ণব কবির ভাষায়—

'আমারি বঁধুয়া. আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া'

— তখন মিনতি করেন কবি,

'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না,
তুমি হৃদয়মাঝে লুকিয়ে বোসো কেউ জানবে না,
কেউ বলবে না।'

তবুও যখন তিনি চলে যান, তখন গভীর বেদনায় কবি প্রশ্ন করেন,

'তুমি কাহার সন্ধানে,
সকল সুখে আগুন জেলে বেড়াও কে জানে!
এমন ব্যাকুল করে কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাসো?'

মহাকবি প্রেমের অগ্নিদাহে গলিত কাঞ্চনের মত পবিত্র এবং উজ্জ্বল হয়ে আমাদের যাত্রাপথে বিশ্বাসের পাথেয় দান করে গেছেন। বৈষ্ণব ভাবধারাকে নূতন রূপদান করে, তাতে নূতন রসসঞ্চার করে গেছেন। তিনি ধন্য হয়ে আমাদেরও ধন্য করে গেছেন :

'এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই,
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলাম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে
পরশ যারে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

—প্রবাসী মাঘ ১৩৬৩

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মাজির উপদেশ

মহাত্মাজির নিকট তাঁর বাণী চাওয়া হলে তিনি বলেন তাঁর জীবনী-ই তাঁর বাণী। অর্থাৎ তিনি যা করবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, নিজের জীবনে স্বয়ং তাই আচরণ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

সমাজের কল্যাণে কোনো বড় রকম পরিবর্তন বা বিপ্লব আনতে হলে তা হিংসার দ্বারা আসতে পারে না,—এই ছিল তাঁর মত; হিংসার দ্বারা যা করা হয়, তার ফলে যে প্রতিহিংসা মনে জাগে,—তাতে সেই হিংসা ও প্রতিহিংসার একটা দুষ্ট চক্র বা রাজনৈতিক চক্রান্ত সৃষ্টি হয়, যার ফলে আরও ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হয়। অথচ শান্তি না হলে কোনো জাতি উন্নতি বা অগ্রগতি সাধন করতে পারে না।

তিনি বলতেন জ্ঞান ও কর্মের মিলন সাধন করতে। যা শিখতে হ'বে, তা মানব সমাজের উপকারে লাগাতে হবে,—নইলে তা যক্ষের ধনের মত বৃথা

হবে। দেশে শতকরা ২০ জন মাত্র শিক্ষিত এবং প্রায় ৮০ জন নিরক্ষর। এই ৮০ জনের শিক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়,—শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই দায়িত্ব,—এই দায়িত্ব গ্রহণ না করলে জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিরাও ধনী অথচ কৃপণ লোকেদের মত ধিক্কৃত ও নিন্দনীয় হবেন। তাঁরা যত্ন ও সাধনার দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করেছেন, তা তাঁদের অজ্ঞান অশিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে দেশের কাছে ও সমাজের কাছে—তাঁদের দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিতে হবে।

গান্ধীজি দেশের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকে গ্রামের দিকে মন দিতে ও দৃষ্টি দিতে বলেছিলেন। গ্রাম যেন দুধ, সহরগুলি যেন তা থেকে তোলা সরের মত। সহর যদি গ্রামের ঋণশোধ করতে যত্নবান না হয় তা হ'লে সহরবাসীরা অকৃতজ্ঞ হবেন, অপরাধী হবেন।

ধনী দরিদ্রের ভেদ,—জ্ঞানী অজ্ঞানীর ভেদ,—বিদ্বান মূর্খের ভেদ,—দূর করে সমগ্র দেশের মধ্যে এক পরিবার-বোধ স্থাপন করা চাই। এক পরিবারের মধ্যে যে প্রীতি সহানুভূতি ও ভালবাসা থাকে,- দেশের মধ্যে তাই স্থাপন করতে হবে। তবেই দেশে শাসন বা শোষণ থাকবে না। পুলিশের দ্বারা জোর পূর্বক তা সম্ভব নয়,—আইনের দ্বারাও তা করা যায় না। কারণ পুলিশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হ'লে তার পিছনে আবার আরও পুলিশ চাই।

মানুষের অন্তর জয় করে—অসুর প্রবৃত্তিকে জয় করে,—আদর্শ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নূতন আণবিক বজ্র নির্মাণ করে এবং এক ঘায়ে লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করে তা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে যে উচ্চতর দেবভাব প্রেমভাব পবিত্র ভাব আছে তাকেই জাগ্রত করে, মানুষকে প্রকৃত 'মানুষ' করে তুলতে হবে। তবেই তা সম্ভব হবে। কোনো মানুষ জন্মগতভাবে বন্দনীয় বা নিন্দনীয় হয় না, তার নিজের অন্তরের মূল্যে, চরিত্রের মূল্যেই, সে গণ্য-মান্য হয়।

বিজ্ঞানকে মানুষ-মারার পথে অপপ্রয়োগ না করে,—মানুষের রোগ ব্যাধি দূর করে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি বিধান করে, তাকে উৎকৃষ্ট যন্ত্র হিসেবে মানুষেরই সেবায় তাকে প্রয়োগ করতে হবে।

দেশের জন্য কোনো বৃহৎ কাজের পরিকল্পনা করতে হলে তিনি বলেছেন তার আগে সমাজের দীনতম দুর্গততম লোকের কথা চিন্তা করতে। যদি

তার দ্বারা তাদের কিছু মাত্র দুঃখের লাঘব হয় বা সুখ শান্তির বৃদ্ধি হয়,— তা হলে সে কল্পনা অবশ্যই সাধু এবং সার্থক হবে।

মানুষকে ভালবাসা,—এবং মানুষকে নারায়ণের মন্দিরের মত দেখা,—এই কথা স্বামী বিবেকানন্দ যেমন জোর দিয়ে বলেছেন, মহাত্মাজি সারা জীবন ধরে তাকেই ব্যবহারিক ভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

মহাকবি উইলিয়্যাম সেক্‌স্‌পীয়র

ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস গগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক উইলিয়াম সেক্‌স্‌পীয়র ২৩শে এপ্রিল ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাচীন ও নবীন ইংরাজী সাহিত্যিকগণের মধ্যে অদ্যাপি তিনি শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। বিস্ময়ের বিস্ময় এই যে এইরূপ শীর্ষণ্য সাহিত্যিকের জীবনী সম্বন্ধে, ও তাঁহার জীবনের নির্ভর যোগ্য ঘটনাবলী সম্বন্ধে, আমরা অল্পই অবগত আছি। ফলে, তাঁহার জীবনী নানাবিধ কবিকল্পনাপূর্ণ কিংবদন্তী ও জনশ্রুতিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে জিজ্ঞাসু গবেষক-গণের কৌতুহলী মন, কিছু কিছু তথ্য বহু পরিশ্রমে আবিষ্কার করিতে পারিলেও বহু বিষয় আজও অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

লর্ড টেনিসন বলিয়াছেন, যে মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রের জীবনী সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র পাঁচটি বিষয় সুনিশ্চিত রূপে অবগত আছি। তাঁহার জন্মদিন,— ১৯ বৎসর বয়সে অ্যানি হ্যাথাওয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ,—গ্লোব এবং ব্ল্যাকফ্রায়ার্স থিয়েটারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক,—নাট্যশালা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ষ্ট্র্যাটফোর্ডে সচ্ছল ভাবে জীবন যাপন,—এবং অবশেষে নিজের জন্মদিনেই মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে ২৩শে এপ্রিল ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন।

যদিও অতীতের গবেষকগণ, বিশেষতঃ বিগত এক শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ, অশেষ পরিশ্রমে তাঁহার জীবনীর অনেক

রহস্যের সুমীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তথাপি এখনও বহু বিষয় সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এমন কি তাঁহার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব,—তাঁহার নামে প্রচলিত লেখাগুলির তিনিই ঠিক লেখক কিম্বা অপর কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁহার নামটি ছদ্ম নাম হিসাবে ব্যবহার করিয়া কোনো বিশেষ কারণে নিজের প্রকৃত নামটি গোপন করিয়াছেন কিনা,—এ বিষয়েও নানা প্রশ্ন ও সংশয় উত্থাপিত হইয়াছে। সেক্‌স্‌পীয়র ৩৭টি নাটক, ১৫৪টি সনেট এবং কয়েকটি দীর্ঘ গাথা কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। গত ২৩শে এপ্রিল তাঁহার জন্মদিন হইতে দীর্ঘ চারি শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘকালে বিধি পাণ্ডুলিপিতে ও সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের দলিল দস্তাবেজ ও ঐতিহাসিক বিবৃতিতে তাঁহার নামের বানান-ই পাওয়া যায় ২৪ প্রকার! সমসাময়িক কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম নীচে উল্লেখ করিতেছি,—কোনো কোনো সংশয়াত্মা সমালোচক বলেন যে তাঁহাদেরই কেহ আসল লেখক, এবং তাঁহাদেরই কেহ সেক্‌স্‌পীয়ারের নামটি, কোন ব্যক্তিগত কারণে, ছদ্ম নাম হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম—

এড্‌ওয়ার্ড ডি ভেরে, অক্সফোর্ডের সপ্তদশতম আর্ল (মৃত্যু—১৬০৪ খৃঃ)। রজার ম্যানার্স,—রুটল্যাণ্ডের আর্ল (মৃত্যু ১৬১২ খৃঃ)। ফ্র্যান্সিস্ বেকন (বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখক মৃত্যু ১৬২৬)। উইলিয়াম্ ষ্ট্যান্‌লি—ডার্বি শায়ারের ষষ্ঠ আর্ল (মৃত্যু ১৬৪০) ইত্যাদি।

আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি নামীর অপেক্ষাও 'নাম'—ই বড়,—ভগবানের চেয়েও ভগবানের নাম বড়। কৌতুকের বিষয়,—নাট্য সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট সেক্‌স্‌পীয়ারের সম্বন্ধেও সেই কথাই সত্য। আজ তাঁহার ব্যক্তিত্বকে identify বা সনাক্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হইলেও যে প্রতিভার প্রতীক এই নামটি,—সে প্রতিভার অস্ত্র কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শাণিত হয় নাই। তাহার তীক্ষ্ণতা জন্মগত অর্থাৎ সহজাত এবং স্বাভাবিক। তাই প্রখ্যাত ইংরেজ কবি মিলটনের সনেটের কয়েকটি পংক্তি এখানে অনুবাদ করিয়া —উদ্ধার করিতেছি,—

"স্মৃতি লোকের, হে অবিস্মরণীয় মহিমান্বিত প্রিয় সন্তান! তোমার স্মৃতি রক্ষার জন্য কি কোন নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর নিদর্শন বা সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে? আমাদের চির বিস্ময় ও চমৎকৃতির চিহ্ন স্বরূপ তুমি নিজেই তোমার শাশ্বতিক

স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া গিয়াছ।” সত্যই তাঁহার সাহিত্যকীর্তিই তাঁহার অক্ষয় অব্যয় স্মৃতিস্তম্ভ।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং, চলজ্জীবন যৌবনম্
চরাচরমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি ॥

সেক্‌স্‌পীয়র তাঁহার ‘অ্যাজ ইউ লাইক ইট্’ গ্রন্থে বলিয়াছেন (২।৭ অঙ্কে):—সমগ্র বিশ্ব সংসার যেন একটী বিশাল রঙ্গমঞ্চ। এবং সেই মঞ্চে—“All the men and women are merely players—They have their exits and entrances, And one man in his time plays many parts.” নিখিল নরনারী যেন নট নটীর মতই মাত্র বিভিন্ন কুশীলবের অংশ অভিনয় করিয়া যাইতেছে—এবং অহরহ বিভিন্ন অঙ্কে তাহাদের প্রবেশ ও নিষ্ক্রান্তি ঘটিতেছে। মহাকবি নিজেও তাঁহার অনতিদীর্ঘ জীবনে,—লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে বহু বিচিত্র অংশের অভিনয় করিয়া গিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে কত ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ অবস্থা হইতে মানুষ স্বীয় তপস্যা ও অধ্যবসায় বলে কত মহৎ, কত বৃহৎ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারে। তিনি থিয়েটারে প্রথম প্রথম ধনী আগন্তুক অভ্যাগত বর্গের ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণ (horse keeper) করিতে নিযুক্ত ছিলেন, পরে,—মঞ্চের দৃশ্যপট পরিবর্তক (scene shifter) হন, তাহার পর অভিনেতাদের বিস্মৃত অভিনয়াংশ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তত্ত্বধারক (prompter),—পরে অভিনেতা (actor), ব্যবস্থাপক (manager) এবং নাট্য প্রণেতা (play-wright) দের উচ্চতম শিখরে উন্নীত এবং প্রতিষ্ঠিত হন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সর্বাধিনায়ক অ্যাব্রাহম লিঙ্কন্ কে যেমন দৈন্যপীড়িত সামান্য ‘কাঠের কুটির’ হইতে রাষ্ট্রের রাজসিংহাসনে সমাসীন (from log cabin to white house) হইতে দেখি, নাট্যকার শিরোমণি সেক্‌স্‌পীয়রের জীবনকেও ঠিক তেমনি তাঁহার পার্শ্বে স্থাপন করিলেও তাঁহাপেক্ষা উজ্জ্বলতর ব্যতীত মলিনতর দেখাইবার কোন কারণ নাই।

সেক্‌স্‌পীয়রের জন্মস্থান ওয়ারউইকশায়ারে অ্যাভন নদী তীরে ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড নামক স্থান। তাহার এক দিকে দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র অন্যদিকে বহু বিটপিসমাকীর্ণ ঘন বনচ্ছায়াময় অরণ্যানী। এইরূপ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁহার শৈশব ও বাল্যকাল কাটে এবং নিসর্গ সৌন্দর্যের সঙ্গে তাঁহার কবিমনের গভীর এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে।

তাঁহার পিতা জন সেক্‌স্‌পীয়র এবং মাতা ছিলেন মেরি আর্ডেন। তাঁহাদের পরিবারে সাধারণ মধ্যবিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি বর্তমান ছিল। পিতার পশম ও চামড়া প্রভৃতির ব্যবসায় ছিল। যৌবনের পূর্বেই তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। বেন জন্‌সন্ বলেন যে তিনি অল্প কিছু ল্যাটিন এবং তাহাপেক্ষাও অল্পতর গ্রীক্ শিখিয়াছিলেন। জন অব্রে (১৬২৫-১৭০০ খৃঃ) বলেন তিনি আরও কিছু অধিক শিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং প্রথম যৌবনে কিছুদিন তত্রত্য স্কুলে শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন। মোট কথা, তাঁহার যে বিদ্যাবত্তার পরিচয় তাঁহার লেখার মধ্যে আজও জগতের মনীষীদের চমৎকৃত করে, তাহার তুলনায় তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিতান্তই নগণ্য ছিল। সে বিদ্যা ও জ্ঞান তিনি লণ্ডনে থাকাকালে, স্বকীয় তপস্যায় অর্জন করিয়াছিলেন।

অনেক দিন পর্যন্ত জনশ্রুতি মূলে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে সেক্‌স্‌পীয়র বালক কালে স্যার টমাস লুইর উদ্যান থেকে একটি হারিণ চুরি করিয়াছিলেন এবং সেজন্য নাকি শাস্তিও পাইয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের বিবৃতিতেও ইহার উল্লেখ আছে। এই জনশ্রুতি সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ সেক্‌স্‌পীয়রের সময়ে সেখানে স্যার টমাস লুইর কোনও উদ্যান বাটিকাই ছিল না। সেক্‌স্‌পীয়রের মৃত্যুর ২ বৎসর পরে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে, স্যার টমাসের পৌত্র প্রথম উক্ত উদ্যান বাটিকা স্থাপনের লাইসেন্স প্রাপ্ত হন, উহা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং কবন্ধের শিরঃপীড়ার মত (!) এই গল্প নিতান্তই গালগল্প বা গুজব মাত্র, ইহার কোন ভিত্তি নাই।

সেক্‌স্‌পীয়রের বিবাহ হয় মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে। তাঁহার স্ত্রী অ্যানি হ্যাথাওয়ে তাঁহাপেক্ষা বয়সে প্রায় আট বৎসরের বড় ছিলেন। বিবাহের ছয় মাস পরেই তাঁহাদের প্রথম কন্যা সুসান্নার জন্ম হয় এবং তাহার নাম গির্জার দীক্ষা তালিকায় পঞ্জীভুক্ত হয়। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের যমজ সন্তান হয়; কন্যা জুডিথ এবং পুত্র হ্যামলেট। সেক্‌স্‌পীয়র মাত্র ২১ বৎসর বয়সে (১৫৮৫ খৃঃ) লণ্ডনে যান এবং সেখানে গিয়া জেম্‌স্ বারবেজের রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। ইহার পর প্রায় দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গ হইতে সুদূরে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিয়া একান্ত একাকী নাট্য সাধনায় নিমজ্জিত হইয়া তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টি ও অভিনয় কলায় অতুলনীয় নৈপুণ্য

লাভ করেন। নট এবং নাট্যকার হিসাবে তিনি প্রভূত যশ এবং অর্থ উপার্জন করেন। তাহার ফলে তিনি ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্র্যাটফোর্ডের তৎকালীন 'বৃহৎ বাটিকা' বা Great House নামক অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন।

তাঁহার নাটকগুলি তাঁহার জীবদ্দশায় মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর সাত বৎসর পরে তাঁহার প্রথম নাটকগুচ্ছ ফার্ষ্ট ফোলিও (First Folio) নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি জীবিত থাকিতে তাহার দুইটি দীর্ঘ কবিতা মাত্র মুদ্রিত হয়। তাঁহার 'ভিনাস্ এ্যাণ্ড্ অ্যাডোনিস' নামক কবিতাটি মুদ্রিত হয় ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে এবং এটিকে বলা হয় তাঁহার সৃজনী প্রতিভার প্রথম ফল,—"the first heir of his invention" ; পর বৎসর তাঁহার Rape of Lucrece বা লুক্রেশের নারীত্ব ধর্ষণ নামক রোমীয় পৌরাণিক কাহিনীর ও তাহাতে কামাতুর কাপুরুষতার শাস্তি বিধানের বিবরণটি দীর্ঘ কবিতায় মুদ্রিত হয়। উভয় কবিতাই সেক্‌স্‌পীয়র আর্ল অভ্ সাউদাম্‌টনকে উৎসর্গ করেন তাঁহার অপরূপ বিনয়মণ্ডিত ভাষায় :—"I know not how I shall offend in dedicating my unpolished lines to your lordship nor how the world will censure me for choosing so strong a prop for so weak a burden" ভাবার্থ এই যে তাঁহার মত সম্মানিত ব্যক্তিকে তাঁহার এই অমসৃণ কবিতা পংক্তিগুলি উৎসর্গ করিবার জন্য বিশ্বনাগরিকগণ হয়তো তাঁহাকে নিন্দা করিবে। তিনি যেন অতিকায় সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর অতি লঘুভার বস্তু স্থাপন করিয়া নিজেকেই সকলের নিন্দা ও উপহাস ভাজন করিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার আশঙ্কা! আজ ইতিহাসের গভীরখাতে, কোথায় সেই আর্ল ও তাঁহার কাঞ্চন-কৌলীন্য তলাইয়া গিয়াছে এবং সেই ইতিহাসের সীমাহীন মহাসমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকদের দিগ্‌দর্শনের জন্য অভ্রভেদী আলোকস্তম্ভের মত সেক্‌স্‌পীয়র দাঁড়াইয়া আছেন তাহা চিন্তা করিলে চাণক্যের অবিস্মরণীয় বিদ্বজ্জন প্রশস্তির শ্লোকটি মনে পড়ে :—

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥

সেক্‌স্‌পীয়রের উল্লিখিত উভয় কবিতাই তৎকালীন সাহিত্য সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং তাঁহার জীবৎকালেই কয়েক সংস্করণ মুদ্রিত ও নিঃশেষিত হয়।

The Sugared Sonnets of Shakespeare বা তাঁহার চিনির পানার মত মধুর সনেটগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর বৎসর অর্থাৎ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। তাঁহার সনেটের সংখ্যা ১৫৪টি।

সেক্স্পীয়রের পারিবারিক ঘটনার কিছু সাল তারিখের প্রমাণ ষ্ট্রাটফোর্ডের গির্জায় রক্ষিত আছে। তাঁহার একমাত্র পুত্র হ্যামনেট ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১১ বৎসর বয়সে মারা যায়। তাহার মৃত্যু জনিত বিষাদের ছায়া মহাকবির 'কিং জন' নামক নাটকে আর্থারের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে।

তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় ১৬০১ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার পিতা বেলিফ (bailiff) ছিলেন। তাহার জন্য সরকারী পদমর্যাদার পারিবারিক প্রতীক বা সম্মান চিহ্নের জন্য তিনি আবেদন করেন ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু তাহা তিনি তাঁহার নিজের চেষ্টায় তখন পান নাই। সেক্স্পীয়রের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বংশ গৌরবের সম্মান চিহ্ন তিনি লাভ করেন ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে। এই চিহ্ন— Coat of arms বা রাজকীয় সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ শস্ত্রাদি চিহ্ন অঙ্কিত আঙ্‌রাখা, উরশ্ছদ বা বর্মবৎ উর্ধ্বাঙ্গের পরিধেয় বিশেষ। এই রাজকীয় পোষাক আজও তাঁহার বাস ভবনের প্রদর্শনীতে সযত্নে রক্ষিত আছে। সেক্সপীয়রের মাতার মৃত্যু হয় ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে।

সেক্স্পীয়র লণ্ডনের নাট্যশালা হইতে অবসর গ্রহণ করেন ১৬১১ খৃষ্টাব্দে। এবং জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি স্বকীয় ক্রীত নূতন প্রাসাদ (New palace) নামক বাসভবনে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করেন। তাঁহার সাফল্য ও সমৃদ্ধি মণ্ডিত জীবনে তিনি প্রভূত যশ ও ধন সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষের কয়েক বৎসর তাহা শান্তিতে উপভোগ করিয়া স্বীয় জন্মস্থানে তাঁহার ৫৩ তম জন্মদিনে ২৩শে এপ্রিল ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুসান্না এবং ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা হ্যামনেটের যমজ ভগ্নী জুডিথের বিবাহ হয়। এই বিবাহের পরে এবং তাঁহার মৃত্যুর একমাস পূর্বে সেক্স্পীয়র উইল করিয়া যান।

তাঁহার বাস গৃহের অনতিদূরে হোলি ট্রিনিটি (Holy Trinity) নামক গির্জায় তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। এই সমাধির উপর যে কবিতাটি উৎকীর্ণ আছে তাহা তাঁহার নিজেরই রচনা বলিয়া শোনা যায়। তাহার মর্মার্থ এইরূপ :—

হে সহৃদয় বন্ধুজন,—যিশুখৃষ্টের দোহাই,—আমার এই শবাধারের মৃত্তিকার আচ্ছাদন খনন করিও না। যে আমার দেহের এই অস্থিগুলিকে পরিহার করিয়া শান্তিতে থাকিতে দিবে তাহার কল্যাণ হইবে। যে এইগুলিকে অন্যত্র সরাইবার চেষ্টা করিবে তাহার জীবন অভিশপ্ত হইবে।

তুলনা করিলে মনে হয় এই রচনা অপেক্ষা মহাকবি মাইকেলের রচনা যাহা তাঁহার শবাধারে উৎকীর্ণ আছে, তাহা অনেক বেশী উদার এবং মর্মস্পর্শী কারণ তাহাতে শুধু বঙ্গবাসী পথিকমাত্রকেই একবার দাঁড়াইয়া ক্ষণকালের জন্য কবিকে স্মরণ করিবার আকুতিপূর্ণ অনুরোধ প্রকাশিত হইয়াছে,—

"দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব,
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে" ইত্যাদি

—ইহাই তাহার মর্মবাণী। "তবুও মনে রেখো, মনে রেখো, রেখো মনে"—এইরূপ মিনতি মিশ্রিত দাবী কবি জানাইতেছেন বঙ্গভাষার দত্ত-কুলোদ্ভব-কবি স্বীয় "শ্রীমধুসূদন" নামের দাবীতে।

মনে হয় সেক্‌স্‌পীয়র ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার শবাধার হয়তো উত্তরকালে উত্তোলিত হইয়া ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার অ্যাবিতে সমানীত হইয়া রাজকীয় সম্মানে সমাহিত হওয়া বিচিত্র নহে। মনে হয় তিনি তাহা হইতে সকলকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্যই ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন। 'Dust thou art, to dust returneth'. এইরূপ ধূলামন্দির দেহকে সমাধি মন্দিরের শান্তিভঙ্গ করিয়া উৎখাত এবং পুনঃ সমাহিত করা তাঁহার একান্ত অনভিপ্রেত ছিল,—সে জন্যই হয় তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে অপর কেহ, এইরূপ কাব্যলিপি উৎকীর্ণ করিয়া থাকিবেন।

তাঁহার এই সমাধি আজ জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের তীর্থভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার জন্মদিনে প্রতি বৎসর সকল দেশের জাতীয় পতাকা উড্ডয়ন পূর্বক তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

সেক্‌স্‌পীয়রের বিভিন্ন নাটকে চরিত্র চিত্রাঙ্কনের এতই বৈচিত্র্য দেখা যায় যে তাহার জন্য কলেরিজ প্রভৃতি সমালোচকগণ তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্বকেও যেন বহু ব্যক্তির একত্র সমাবেশের মত বোধ করিয়াছেন। তাই কেহ তাঁহাকে

hydra-headed (বহুশীর্ষ অনন্ত নাগ) কেহ বা myriad-minded (অসংখ্যমনা পুরুষ) প্রভৃতি নাম দিয়াছেন।

আমিও আমার বিস্ময় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি,—আমার সামান্য কবিতায় ঠিক ঐরূপেই, তাই বলিয়াছি:—"সাহিত্যে সহস্রশীর্ষ লক্ষমন নিযুত অন্তর" নিখিল মানব চিত্তের রহস্য—কবি যেন তাঁহার গুপ্তচর পঞ্চম বাহিনীর মুখে অবগত হইয়া সকলের গুপ্তকথা তাঁহার কুশীলবের মুখে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন,—

"নিখিল মানব চিত্তে গুপ্তচর পঞ্চম বাহিনী
অন্তর মঞ্জুষা হতে ব্যক্ত কর সবার কাহিনী
তোমার কাহিনী মুখে।"

পুরাতন মৃত ইতিহাস, তাঁহার সোনার কাঠির স্পর্শে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে,—এবং নবতর কথা নবীনতর হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার বর্ণনা পারিপাট্যে:—

'তোমার পরশে জাদুবশে
পুরাতত্ত্ব প্রত্ন কথা রমণীয় হয় নানারসে
নবীন নবায়মান।"

তাঁহার নাটক নাটিকা ও কবিতা পড়িয়া মনে হয় যেন তিনি কোন বিশেষ ধর্মের, জাতির, সমাজের বা দেশের লোক নহেন, তিনি যেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বপিতার পুত্র, বিশ্বকর্মার সৃষ্ট এক বিরাট বিশ্বজগতের যাযাবর পরিব্রাজক যেন কোন ভৌগোলিক ভূখণ্ড বা ঐতিহাসিক খণ্ডকালের বহির্ভূত, এই নিত্যপরিচিত জগৎপ্রকৃতির এক অপ্রাকৃত সৃষ্টি, এক অলৌকিক 'সৃষ্টি ছাড়া' মানুষ—যিনি বলিতে পারেন "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে" এবং "দেশে দেশে আছে পরমাত্মীয়।" যিনি গীতার ভাষায় "আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি"—এবং সেজন্যই তিনি হইতে পারিয়াছেন পৃথিবীর কবি 'যেথা তার উঠে যত ধ্বনি' তাঁহার বাঁশীর সুরে—'সাড়া তার জাগিবে অমনি।' তাঁহার ধর্ম, গির্জা-গম্বুজ-মঠ-মিনার-মন্দির-নির্বিশেষে সহজাত 'মানব ধর্ম':—

"সহজ মানব ধর্মী তুমি
তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র মানব-চরিত্র পটভূমি।
কখনো সে সৃষ্টিমাঝে বীরত্বের বিবৃদ্ধ বিক্রম
কখনো পবিত্র প্রেম সৃষ্টি করে স্বর্গ অনুপম

কখনো ঘৃণিত হিংসা ফোঁসে রোষে সর্পসম ক্রূর
সুখস্বর্গ ভেঙে দেয় নারকীয় যন্ত্রণা নিষ্ঠুর
মর্ম ফেটে ভেঙে পড়ে,—তবু তার যন্ত্রণার স্বাদ
পুনরায় আস্বাদিতে চিত্তে লাগে কি এক আহ্লাদ!

'কিং লীয়ার,' 'হ্যামলেট' বা 'ওথেলোর' বিয়োগান্ত নাটকে সত্যই মর্ম ফেটে ভেঙে পড়ে, কিন্তু সেই বেদনাই তাহার শেষ কথা নহে। বেদনার মধ্যেও একটা সাহিত্যরসের অনির্বচনীয় আহ্লাদের ফল্গুধারা অন্তঃসলিলা বহিতেছে। নচেৎ সে বেদনা, একবার পড়িয়া বা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিয়া কেহ আর পুনর্বার পড়িতে বা দেখিতে পারিত না বা চাহিত না। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অনবদ্য ভাষায় আমিও ইহাকে 'তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের' মত বলিয়াছি, যে জন্য—একবার পড়িয়া সাধ মিটে না,—বারংবার পড়িতে ইচ্ছা হয়—একবার দেখিয়াও ফুরায় না বারংবার দেখিতে ইচ্ছা হয়,—

"তাইতো আবার পড়ি,—আবার বেদনা করি বোধ
তপ্ত-ইক্ষু-চর্বণের মিষ্ট রসে তারি কষ্ট শোধ!
এমনি বিচিত্র তুমি তোমার চিত্রের তুলা নাই"—
অধিক কোথায় পাব? সমানের সন্ধান না পাই।

ইংরাজ কবি ও সমালোচক ড্রাইডেন সেক্‌সপীয়রকে,—বর্ণনা করিয়াছেন এই বলিয়া যে তিনি যেন 'একাই একশো'! অর্থাৎ তিনি 'একা' কিন্তু 'একক' নহেন,—তিনি যেন গণিতের ভাষায় সংখ্যায় এক হইলেও দশক-শতক-সহস্রকের সংখ্যায় বিশ্বমানবের প্রতিভূ,—'not one man but an epitome of all mankind'!

তিনি তাঁহার রচনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অভিনয়ের মনোহারিত্বে ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথ ও রাজা প্রথম জেম্‌স্ এর সম্মান, সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে—খৃষ্টমাসের সময় তিনি গ্রীন উইচ্ রাজ প্রাসাদে দুই রাত্রি তাঁহার নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করেন। সেই অভিনয়ে, তাঁহার সহিত, রিচার্ড বারবেজ,—তৎকালীন শোকান্ত নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং উইলিয়াম কেম্প্,—মিলনান্ত বা সুখান্ত নাটকের শ্রেষ্ঠ নটও ছিলেন। ইহারা সকলেই, রাজা প্রথম জেম্‌স্ এর সময় king's players বা রাজার নট বা 'রাজ নট' এইরূপ রাজকীয় সম্মান সূচক পদবী লাভ করেন। সেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণের কয়েকটি অভিমত অতঃপর উদ্ধৃত করিলে মনে হয় তাহা সমীচীন ও সময়োপযোগী হইবে।

সমসাময়িক নাট্যকার বেন জন্‌সন্‌ তাঁহার উদ্দেশে লিখিয়াছেন,—

…Soul of the Age

The applause ! delight ! the wonder of the stage !

My shakespeare arise !

অর্থাৎ যুগের জীবন স্বরূপ রঙ্গমঞ্চের যুগপৎ বাহবা ধ্বনি,—আনন্দ এবং বিস্ময়, আমার সেক্‌সপীয়র তুমি উদিত ও উত্থিত হও। যুগের জীবন বা Soul of the Age বলিয়াও তাঁহার তৃপ্তি না হওয়ায় তিনি পরে বলিলেন,—

"Triumph my Britain, thou hast one to show

To whom all sons of Europe homage owe.

He was not of an age, but for all time

And all the Muses still were in their prime.

অর্থাৎ তিনি ইংলণ্ডকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন—যে তাঁহার জয় হউক। যেহেতু তিনি এমন একটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন যাঁহার নিকট ইউরোপ মহাদেশের সকল প্রতিভাই শ্রদ্ধায় নত হইবে। তিনি শুধু এক যুগের নহেন, তিনি সর্বকালের শাশ্বতী প্রতিভার প্রতীক স্বরূপ ছিলেন,—যখন ইউরোপের অন্য সকল দেশের সাহিত্য-প্রতিভা প্রায় অস্ফুভিন্ন বা অবিকশিত অবস্থায় ছিল।

গ্যেটের বয়স যখন ৭০ বৎসর তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয় যে তাঁহার মানবিক মন এবং কবি মনের গভীরে কাহার প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহার উত্তরে তিনি বলেন,—

"Lidda : Bliss of nearest nearness

Shakespears : star of loftiest height."

অর্থাৎ তাহার প্রথম নামটি 'লিডা', তাঁহার Platonic sweetheart বা কামগন্ধহীন প্রেমের পাত্রী—অন্তরের অন্তরতম আনন্দের উৎস 'লিডা'—এবং দ্বিতীয় নামটি সেক্‌সপীয়র—সাহিত্য গগনের উচ্চতম (বলাবাহুল্য উজ্জ্বলতমও) জ্যোতিষ্ক সেক্‌সপীয়র। সকলেই জানেন গ্যেটে ছিলেন জার্ম্মাণীর কাব্য এবং নাট্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষী।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করি। তিনি বলিয়াছেন :—

"প্রবৃত্তির জটিলতা, মনুষ্য স্বভাবের অস্থিরতা,—পরস্পর বিরোধী ভাব সমূহের যুগপৎ বিকাশ, সেক্‌সপীয়র ভিন্ন আর কেহ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে

পারেন নাই, পারিবেনও না। সেক্‌স্‌পীয়র মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন। তুমি যেমন মানুষ চাও, সেক্‌স্‌পীয়র তেমনি মানুষ তোমায় দিবেন।"

সেক্‌স্‌পীয়রের 'নায়িকা' বা heroines দের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহোদয়ের অভিমত,—তাঁহার নিরপেক্ষ সমালোচনা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় স্বরূপ অদ্যাপি সকলের অনুমোদন লাভ করিবে সন্দেহ নাই :—

"তুমি শকুন্তলার মত সরলা, মুগ্ধ হৃদয়া, সামাজিক কুটিলতানভিজ্ঞা বালিকা চাও,—মিরন্দা, দেশদিমোনা লও। পাকা গিন্নী, ঘরকন্নায় মজবুত,—ভাঙেনা মচকায় না, এমন মেয়ে চাও—আচ্ছা তোমার জন্য ভেম্‌ কুইক্‌লি আছে। জগৎ মোহিত করিবার জন্য মায়াজাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, যে জালে পা দিতেছেন—তাহারই সর্বনাশ করিতেছেন এমন দুর্বুদ্ধিশালিনী ভুবনমোহিনী চাও,—ক্লিওপেট্রা আছে। দুরাকাঙ্ক্ষায় জর্জরিতহৃদয়া, লোকের উপর আধিপত্য করিবার ইচ্ছায় পাষাণবৎ দৃঢ় সংকল্পা পুরুষকে পাপে প্রেরণ করিবার জন্য শয়তানরূপিণী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও,—লেডি ম্যাকবেথ আছে। দেখিবে এগুলি সব মানুষ,—অমন যে পাষাণহৃদয়া ম্যাক্‌বেথ পত্নী যে রাজ্যলোভে ক্রোড়স্থিত স্তন্যপায়ী আপন শিশুকে আছড়াইয়া মারিতেও কুন্ঠ হয় না,—সেও স্ত্রী-লোক। রাজার মুখ, আপন পিতার মত বোধ হওয়াতে স্বহস্তে সে রাজহত্যা করিতে পারিল না।"

কালিদাসের সহিত সেকস্‌পীয়রের তুলনা করিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—"কালিদাস এরূপ মনুষ্য সৃষ্টি করিতে অক্ষম। তিনি মনুষ্য হৃদয়ের সুন্দর অংশ দেখাইতে পারেন।"

সেক্‌স্‌পীয়র যেন মনুষ্য চরিত্র চিত্রাঙ্কণের বৈচিত্র্যে বিধাতা পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী। সুন্দর ও কুৎসিত,—মহৎ ও বীভৎস, দেবতা ও শয়তান বীর ও কাপুরুষ, জ্ঞানী ও বিদূষক, তিনি অবলীলাক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন—পটে আঁকা ছবির মত আঁকিয়া গিয়াছেন, যাহাদের মূর্তি আজ চারিশত বৎসর পরেও আমাদের পরিচিত অনেক চরিত্রের সহিত বা তাহাদের নিত্য প্রত্যক্ষ চিত্রের সহিত হুবহু মিলাইয়া লইতে কষ্ট পাইতে হয় না। তাঁহার সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে বলা চলে—যে "অসারে খলু সংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ" সৃষ্টিশক্তিতে তিনি প্রজাপতির প্রতিদ্বন্দ্বী।

'অরণি', শারদীয় ১৩৭১
ইং—১৯৬৪

বিগত পঁচিশ বৎসরের সামাজিক বিবর্তন

বিগত ১৩৬১ সালের শুভ পয়লা বৈশাখে সাহিত্যতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার প্রথম তীর্থপতি বাংলার বরেণ্য কবি করুণানিধান এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীমান রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। এ বৎসর ২৫ বৎসর পূর্ণ হইল তাই ইহা প্রতিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী বৎসর। এই বৎসর গত ২৫শে মাঘ ১৩৮৫ প্রতিষ্ঠানের তীর্থপতি বাংলার দিক্‌পাল সাহিত্যিক বনফুল ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে হারাইয়া প্রতিষ্ঠানটি শোকাভিভূত ও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন। তথাপি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক বনফুলেরই ইচ্ছাক্রমে বিগত পঁচিশ বৎসরে সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পঞ্জীভূত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

সমাজের চিত্রে ধর্ম, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, শিল্প সংস্কৃতি ও সদাচার সবই অল্প-বিস্তর আসিয়া পড়ে। তাই অতি সংক্ষেপে আমার উদ্দিষ্ট বিষয়গুলি লক্ষ্য করিয়া আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করিব।

গান্ধীজী বলিয়াছেন, যাঁহারা বলেন যে রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নাই তাঁহারা ধর্মের প্রকৃত অর্থ প্রণিধান করেন না। ধর্মই সমাজকে ধরিয়া রাখে, হৃদয়বৃত্তিজাত সহানুভূতির দ্বারা এবং বিবেকবুদ্ধিজাত নৈতিক বিধিবদ্ধ মানবিক আদর্শের দ্বারা। ধর্মের ভিত্তি সত্য ও প্রেম এবং লক্ষ্য ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত কল্যাণ। তাই রাজনীতি ও সমাজনীতির সকল বিধি ব্যবস্থা সত্য ও সততার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তবেই আমরা আমাদের উপেয় বা লক্ষ্য প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিতে পারিব, নচেৎ নহে।

এখন গত পঁচিশ বৎসরে আমাদের অগ্রগতির 'আয়-ব্যয়' পত্রের মত আমাদের বিবেচ্য বিষয়গুলির প্রতি দফায় দফায় দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

সাধারণ দৃষ্টিতে,—দেখিয়া দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে স্বাধীনতার পর হইতে আমরা স্বাধীনতার মদে মত্ত হইয়া স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতেছি, ফলে আমাদের 'দাবি' বাড়িতেছে এবং যোগ্যতা ও 'দায়িত্ব জ্ঞান' কমিতেছে। গত

পঁচিশ বৎসরে তাহার উন্নতি হয় নাই। 'ইকুয়ালিটি' (Equality) বা সাম্যবাদ ভিত্তিক গণতন্ত্র,—দলতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। 'ফ্রেটার্নিটি' Fraternity বা সৌভ্রাত্রবোধ আপনআপন আত্মীয় পোষণ বা 'ভাইপো পোষা' (nepotism) তে পর্যবসিত হইয়াছে। 'লিবার্টি' (Liberty) বা স্বাধীনতা,—পূর্বেই বলিয়াছি, স্বাধিকারপ্রমত্ততা ও স্বৈরাচারে পরিণত হইয়াছে। ফলে ইচ্ছামত খেয়াল খুশির ধর্মঘটে জনজীবন, সামাজিক শান্তি ও অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। শ্লোগ্যান (Slogan) ধ্বনি ও মিছিলবাহিনীর দ্বারা দলীয় চেতনা বাড়িতেছে, জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে এবং ঐক্যবোধ শিথিল হইতেছে।

আজ জাতির চক্ষে দূরদৃষ্টি নাই। দৃষ্টি এখন সঙ্কীর্ণ-ব্যক্তিগত বা দলগত গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং দ্রষ্টাগণও সুবিধাবাদ (Opportunism) এর রঙীন্ চশমায় দিগ্ দর্শন করিতেছেন।

এই আত্মবিস্মৃত জাতিকে যদি মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে ধর্ম, নিষ্ঠা এবং চরিত্র গঠন ছাড়া অন্য পথ নাই। আমাদের দেশে যত অবতার যত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তত আর কোনো দেশে নহে,— তথাপি দেশ আজ 'মাতাল হইয়া পাতাল পানে ধাইতেছে'—অদৃষ্টের কি পরিহাস!

অদৃষ্টের পরিহাস। আমাদের এই বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ চৈতন্য রামানন্দ নানক কবীর তুলসীদাস রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী অরবিন্দ নেতাজী বিজয়কৃষ্ণের দেশে আমরা আদর্শহারা দিশাহারা হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় চরিত্রহীন সমাজবিরোধী জনগণ, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে এবং সরকারী আরক্ষা বিভাগের প্রশ্রয়ে,— সকল সমাজ ব্যবস্থা 'আলু থালু' করিয়া দিয়া 'লুটিয়া পুটিয়া' খাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমান অবস্থা। এখন 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইয়া পড়িয়াছে। দেশে এখন খাদ্যদ্রব্য এমন কি ঔষধপথ্যে পর্যন্ত ভেজাল ঢুকিয়াছে। অল্পদিন আগে এই দমদম অঞ্চলে খাদ্য তৈলের ভেজালে ও তার বিষ ক্রিয়ায় কয়েক শত নিরীহ নরনারীর দুর্গতির অবধি ছিল না, কেহ কেহ মারা গেলেন, কেহ কেহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া সারা জীবন অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেন। ভেজাল বিষাক্ত মদ্যপানে বিভিন্ন প্রদেশে শত শত ব্যক্তি মারা যাওয়ার খবর, খবরের

কাগজের মাধ্যমে প্রায়ই পাওয়া যায় অথচ উপযুক্ত শাস্তির সংবাদ পাওয়া যায় না।

যে ধর্মাধিকরণে লোক স্থায় বিচার আশা করে সেখানেও স্থায় এবং ধর্ম কোথায় গিয়া নামিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। ঘুষ লওয়াও অপরাধ,—ঘুষ দেওয়াও অপরাধ—কিন্তু এই উভয়বিধ অপরাধীদের অপরাধপ্রবণতার ফলে আজ দেশের সকল বড় বড় বিভাগেই দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্যে, স্থায়নীতির সোজা পথে, কোনো কাজ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি হাসপাতালে রোগীদেরও অব্যাহতি নাই, সমাজ বিরোধীদের হস্তের দাবি না মিটাইলে তাঁহারা সময়ে 'বেড্ প্যান' ও পান না। তাঁহাদের ক্রীত বা উপহৃত পেটেন্ট ফুড্ ঔষধাদিও অপহৃত হইয়া কালো বাজারে চলিয়া যায়। কালো বাজারই আজ 'আলো' করিয়া আছে, সাদা বাজার নাই বলিলেই হয়—'লাল বাজারের' সাহায্য কাঞ্চন মূল্যের পরিমাণ মতো পাওয়া যায়।

অপরাধী কে? যখন দেশ পরাধীন ছিল তখন সকল দোষ আমরা বিদেশী শাসক বা শোষকদের উপর চাপাইতাম। এখন যাহারা অপরাধী তাহারা আমাদেরই মাসতুতো বা পিসতুতো ভাই! আমরা প্রায় সকলেই চরিত্রহীন তস্কর প্রবঞ্চক হইয়া পড়িয়াছি! আমাদেরই জাতি-ভাই—কেহ অভাবে কেহ স্বভাবে, চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি কালোবাজারী করিয়া অধঃপাতের পথে ছুটিতেছে।

মানুষের ধর্ম। আমাদের দেশে অনেক প্রকার ধর্ম আছে। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, ইস্লাম, খৃষ্টান প্রভৃতি। সকল ধর্মের সার কথা ও নৈতিক আদর্শ লইয়া যাহা পাই তাহাই 'মানবিক ধর্ম' বা মানুষের ধর্ম। ইহার সার কথা এই যে প্রত্যেকটি মানুষকে ভগবানের জীবন্ত প্রতীক বা চলন্ত মন্দিরের মধ্যে জীবন্ত সচল বিগ্রহ মনে করিতে হইবে। গীতা বলিয়াছেন 'আত্মৌপম্যেন' সর্বত্র সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিবার জন্য (৬/৩২)।

ভাগবতের মতো ভক্তিশাস্ত্রও বলিয়াছেন যে, সর্বভূতে ঈশ্বরের সত্তা যে মানে না বরং তাহাকে অবহেলা করে, বঞ্চনা করে, অত্যাচার অপমান করে তাহার মন্দিরে বা তীর্থে, মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করা, ভস্মে ঘি ঢালিয়া হোম করার মতো হাসির কথা। মানুষকে ঠকাইয়া ঠাকুরকে পূজা দেওয়া—যেন

ঠাকুরকে মানুষ মনে করিয়া তাঁহাকে চাল কলার নৈবেদ্য বা 'মেষ মহিষ আর ছাগলছানা' বলিদান দিয়া তাঁহাকেও ঘুষ খাওয়াইবার অপচেষ্টা মাত্র।

আত্মপ্রবঞ্চনা। পদ্মপত্রে জলের মতোই জীবন চঞ্চল। বেদান্তের উপদেশ ভুলিয়া রাখিলেও নিত্যকার অভিজ্ঞতায় সকলেই জানেন মৃত্যু যে কোনো মুহূর্তে আসিতে পারে। কৃপণতাবশতঃ যিনি যক্ষের ধন সঞ্চয় করিয়া রাখেন তাঁহার ধনের ও প্রাণের আসক্তির টানাটানিতে মৃত্যুকালে যন্ত্রণাও তত অধিক হয়। সবই ফেলিয়া যাইতে হইবে তথাপি এই জীবৎ কালের দাবিকে মোকররী শর্ত মনে করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া চলিতেছি এবং তাহা বিগত পঁচিশ বৎসরে বাড়িয়াই চলিয়াছে ধর্ম বিমুখতা বশতঃ। 'যেন তেন প্রকারেণ'—নিজের কোলে ঝোল টানিবার প্রবৃত্তি বশতঃ অপরাধ প্রবণতাও বাড়িয়া চলিয়াছে।

***কুসংস্কার।** বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল কলেজ প্রভৃতি অনেক বাড়িয়াছে সত্য, তথাপি আমরা বহুবিধ কুসংস্কার এখনও গতানুগতিক মতে প্রশ্রয় দিয়া চলিতেছি। তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি, এবং প্রশ্ন রাখিতেছি :—*

শুদ্ধি ও শুচিতা। এই মহাকাশ যাত্রার যুগেও রন্ধন শালায় গোবরের দ্বারা শুদ্ধ বা পবিত্র হওয়ার প্রথা যেমন হাস্যকর, এই মহানগরীর মতো নোংরা শহরে না ফুটাইয়া গঙ্গাজল পান করাও তেমনি বিপদ্ জনক। যত ফ্যাক্টারির নির্গত বিষাক্ত পদার্থ, বিষ্ঠামূত্র গলিত পচিত শবদেহ গঙ্গায় পড়িতেছে—তাহা জানিয়াও আমরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাধারণ শিক্ষা অবহেলা করিয়া চলিয়াছি—তাহার ফলও ভোগ করিতেছি। পূজার পূর্বে শুচিতা লাভের জন্য স্নান শুচি শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করা উত্তম প্রথা। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি, মন্ত্র স্নান ও ঈশ্বর স্মরণ যে শুচিতালাভের শ্রেষ্ঠ উপায় তাহা ভুলিয়া যাই—তাই—'যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ'—এই মহামন্ত্রটির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া মৃত্যুশয্যাতেও, রোগীদের, বিশেষতঃ রোগিণীদের, মলমূত্রাদির স্পর্শ বশতঃ নিজের ইষ্ট দেবতাকেও স্মরণ করিতে কুণ্ঠা বোধ হয়—যিনি মলে মূত্রে 'অনলে অনিলে—শশী তারকায় তপনে' বিরাজমান।

* Some errors handed down from age to age Plead Custom's force and still possess the stage. Ah that is vile !

Shall we our parents' faults adore, And err because they have erred before ?

অস্পৃশ্যতা। মানবিক নীতিধর্ম অনুসারে সংবিধান রচিত হওয়া সত্ত্বেও,—আজও ধর্ম রয়েছেন ভাতের হাঁড়িতে। 'বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি'-র অভিযোগ গত ২৫ বৎসরে নাগরিক জীবনে কিছু কম হইলেও গ্রামীণ জীবনে বিশেষ কমে নাই। ইহার জন্য আমার মনে হয় স্বর্গত মুকুন্দদাসের স্বদেশীযাত্রার মতো আজ কুসংস্কার মুক্তির জন্য সামাজিক পালাগান রচনার প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন। অদ্যাপি হরিজনদের অনেক প্রদেশে অশেষ গ্লানি অপমান ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে।

যে ভাত আমরা খাই, তাহার জন্য ধান সিদ্ধ করিয়া' তাহাকে ভাতে পরিণত করিয়া—শুকাইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া 'চাল' প্রস্তুত করি। এ কাজ তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিরাই করেন। তথাপি সেই রান্না ভাত ছোঁয়ার বেলায় কি অদ্ভুত 'শুচিবাই' এখনও বর্তমান। রান্না ভাতের থালা,—মশা মাছি পিঁপড়ে পোকা চড়ুই পাখি পোষা বিড়াল প্রভৃতি ছুঁয়ে গেলেও দোষ ধরা হয় না, দোষ ধরা হয় মানুষের স্পর্শে!

অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে জাতি বিচার। যাঁহার যাহা কুল গৌরব, বংশ গৌরব, গোত্র গৌরব বা Distinguished ancestry আছে তাহা থাকুক। কিন্তু আজ পুরাতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব প্রাণিতত্ত্ব ও নরতত্ত্ব (anthropology) প্রভৃতি যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মানুষের আদিম দুর্বলতার কথা জানেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, পরাশর বিশ্বামিত্র প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিদের কথাও সুবিজ্ঞাত। তাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে মাতৃত্ব অনেকটা স্বয়ংপ্রমাণ হইলেও পিতৃত্ব প্রমাণসাপেক্ষ এবং তাহা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও ধারণা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। তাই ইংরাজিতে বলা হয় Paternity is a question of opinion—Maternity is a question of fact.

বাল্যবৈধব্য, কুলীন প্রথা ও বহু বিবাহের ফলে সমাজের কি অধঃপতন হইয়াছিল তাহা কে না জানেন? শরৎচন্দ্র 'বামুনের মেয়ে' লেখার জন্য তাঁহাকে অনেক গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তথাপি গত ২৫ বৎসরে গোঁড়া সমাজ এখনও চক্ষু বুজিয়া অন্ধ সাজিয়া বসিয়া আছে। চণ্ডী বলিয়াছেন—

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথা পরে
কেচিদ্ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্য দৃষ্টয়ঃ।

তাঁহাদের কিবা রাত্রি কিবা দিন। অস্পৃশ্যতা বেদে নাই। দয়ানন্দের আর্য

সমাজ ও রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়াছেন। দলগত প্রাধান্যের ফলে এবং তৎকালীন সমাজের রক্ষণশীলতার কারণে স্মৃতিশাস্ত্র জটিল ও পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান বণিকের পণ্যশালায় পরিণত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমের 'প্রায়শ্চিত্ত' শীর্ষক নিবন্ধটি পাঠ করিলে বর্তমান পাঠকের নিকট এই—'বিত্তের মূল্যে চিত্তশুদ্ধি'—ক্রয় করিবার ব্যবসায়টি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

এইরূপ স্মৃতি সংহিতায় কুসংস্কার বশতঃ আমরা নরবলি দিয়াছি। পূজার নামে পশুবলি আজিও দিতেছি, সতীদাহে কত মাতৃমূর্তিকে চিতায় দগ্ধ করিয়াছি, তুষানলে বা তপ্ত ঘৃত পানে প্রাণত্যাগের বিধান দিয়াছি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু 'নাম-মহামন্ত্র' না দিলে গৌড়ের অধিকারী সুবুদ্ধি রায়কে হয়তো ঐ বিধানেই মরিতে হইত।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ শাস্ত্রী এই নামমন্ত্রের বিধান না দিলে পাকিস্থানের স্পর্শ-দুষ্ট কত নরনারীকেই আমাদের ধর্ম ও সমাজ হইতে হারাইতে হইত। অতীতে এইরূপ নিরপরাধ কত নরনারীকে আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। সমগ্র কাশ্মীর এক সময়ে হিন্দু হইতে চাহিয়াছিল কিন্তু গোঁড়া স্মার্ত পণ্ডিতেরা বিরোধিতা করায় তাহা হইতে পারে নাই এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত আজিও সমগ্র জাতিকে করিতে হইতেছে।

আজ সমাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো রাজা নাই, নির্বাচিত কোনো সমিতি নাই—সমাজ শৃঙ্খলা কালক্রমে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিয়া এবং সন্ধ্যা উপাসনাদি না করিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজ বৈশ্য ও শূদ্রেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা চলিতেছে। তথাপি 'তটস্থ হইয়া' নিরপেক্ষভাবে গুণকর্মের বিচার করিলে পূর্বেকার চতুর্বর্ণের একটি ধারণা পাওয়া যায়।

উদাহরণস্থলে বলা যায়, ঐরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে—গান্ধীজী অরবিন্দ ব্রাহ্মণ, নেতাজী মাষ্টার দা' ক্ষত্রিয়, ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসু আলামোহন দাস বৈশ্য, এবং দাসবৃত্তিপরায়ণ স্বাধ্যায় ও সাধনাহীন বিবেক বিচারে উদাসীন সুবিধাবাদী আত্মকেন্দ্রিক জনগণ শূদ্র শ্রেণীভুক্ত। মানুষের মন মিশ্র প্রকৃতির। তাহার মধ্যে তিন গুণও যেমন অল্প বিস্তর থাকে, চতুর্বর্ণও তেমনি ভাগে কম বেশি সকলের মধ্যেই থাকে। এ জন্য এক বর্ণ বা জাতি অন্য জাতিতে উন্নীত বা অধঃপতিত হইতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবত বলেন—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসাং বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥

অর্থাৎ গুণ ও লক্ষণ দেখিয়াই বর্ণ বিচার করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের ছেলে শূদ্র-ইহা সহজ পন্থায় গতানুগতিকতার ধারার অনুসৃতি মাত্র, যেদিকে বাধা কম—(line of least resistance)—সেদিকে চলিবার জন্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ফল। যে বেদান্তের আমরা গৌরব করি, স্মার্ত গোঁড়ামির প্রভাব সেই বেদান্ত সূত্রেও প্রবেশ করিয়াছে,—জানিনা তাহা পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত সন্নিবেশ বা interpolation কিনা।

বেদান্ত দর্শন ১ম অধ্যায় ৩য় পাদের ৩৪শ সূত্র হইতে ৩৮শ সূত্র পর্যন্ত 'অপশূদ্রাধিকরণ',—ভাষ্য সহ তাহার অনুশীলন করিলে এই প্রশ্ন অবশ্যই মনে জাগিবে। অথচ ভাষ্যকারগণ 'শূদ্র' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন ঃ শুচ্ ধাতুর উত্তর 'রক্' করিয়া 'শূদ্র' হয়। যে শোক করে, শোকে আত্মহারা হয় —সেই শূদ্র। অথচ মহাভারতে পাই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ,—বিশ্বমিত্র তাঁহার শতপুত্র বিনাশ করিলে শোকাভিভূত হইয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য ভৃগুপাতে পতিত হন, তাহাতেও মৃত্যু না হওয়ায় নিজেকে পাশবদ্ধ করিয়া নদীতে নিমগ্ন হন,—নদী তাঁহাকে পাশমুক্ত করিয়া প্রাণ দান করেন,—তাই নদীর নাম হয় 'বিপাশা'।

স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—'শূদ্র বেদ শ্রবণ করিলে—রাঙ্ বা সীসা বা লাক্ষা গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিবে, উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবে, ধারণ করিলে শরীর বিদীর্ণ করিবে, তাহাকে ধর্ম বা ব্রত সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দিবে না।' (বসুমতী-শাস্ত্রপ্রচার কর্তৃক ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শন ভাষ্যানুবাদ পৃঃ ১৩৩) ইহার সঙ্গে তুলনা করুন ঋষি গৌতম, বালক জাবালের সত্যবাদিতায়, সে যে শূদ্র নহে ব্রাহ্মণ, ইহা স্থির করিয়া তাহাকে উপনীত করিয়াছেন। (ঐ পৃঃ ১৩২) ইহাও উপরোক্ত ভাগবত শ্লোকের অনুযায়ী লক্ষণানুযায়ী বর্ণ নির্ণয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এই সঙ্গে চিন্তা করুন শ্রীচৈতন্যের উপদেশ

'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়,—যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়'। 'কুসংস্কার' কঠিন-প্রাণ সহজে মরে না। সেজন্য গত ২৫ বৎসরেও ইহার বিশেষ ক্ষয় ক্ষতি হয় নাই, অধুনা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও ইহার পুনরুজ্জীবনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছেন।

শাস্ত্র ও যুক্তি। ভারতের সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা কোনো গ্রন্থ বিশেষকে শ্রেষ্ঠ স্থান না দিয়া,—ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্রহ্মবিদ—যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। বেদ স্বয়ং চতুর্বেদকে 'অপরা'-বিদ্যা বলিয়াছেন। 'ইয়ন্তু অপরা, অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'। তাহাই পরা বিদ্যা যাহা দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। গীতা বলিয়াছেন সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত হইয়া গেলে সামান্য উদপান অর্থাৎ বাপী কূপ তড়াগাদি যতটুকু প্রয়োজন, ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণেরও সমগ্র বেদে ততটুকু প্রয়োজন। পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, সেই বেদেরও আমরা ভগ্নাংশ মাত্র রক্ষা করিতে পারিয়াছি, অধিকাংশই কাল কবলিত। বর্তমান কুসংস্কারের জন্য সনাতন ধর্মকে দায়ী করা চলে না। বেদ বিরোধী স্বয়ং বুদ্ধদেবও তাঁহার ধম্মপদে পদেপদে সনাতন ধর্মেরই প্রশংসা করিয়াছেন—যজ্ঞে বিহিত পশুহিংসা প্রভৃতির নিন্দা করিয়াছেন। ধম্মপদের শেষ অধ্যায় ২৬তম বগ্গে=(বর্গে) ব্রাহ্মণ বর্গে ব্রাহ্মণকেই তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। যিনি কাম জয়ী, নিষ্কম্প চিত্ত (স্থিত প্রজ্ঞ) ক্লেশ-মল-বিধৌত এবং 'অভিজ্ঞা' (ধর্মের সম্পূর্ণ জ্ঞান) লাভ করিয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াছেন।

অদ্যাপি অভিধানে যিনি 'জাতি ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ কেবল পিতৃ পরিচয়ে ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে ব্রাহ্মণাধম বলা হইয়াছে। 'তপঃ শ্রুতিভ্যাং যো হীনো জাতি-ব্রাহ্মণ এব সঃ'। তিনি কেবল জাতিতেই ব্রাহ্মণ।

যুক্তি বিচার বিহীন ব্যক্তি শাস্ত্রের অর্থ গ্রহণেও সক্ষম হন না। 'যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলং তু বহুশ্রুতঃ। শাস্ত্রার্থং ন বিজানাতি দর্বী সূপরসং যথা।' রান্নার হাতা যেমন পলান্ন পায়সান্নে বার বার ডুবিয়াও তাহার রস গ্রহণ করিতে পারে না সেইরূপ স্বকীয় প্রজ্ঞা না থাকিলে শাস্ত্রার্থের উপলব্ধি হয় না। এবং 'যুক্তি হীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে'। তাই বিদ্যাসাগরের মতো প্রাজ্ঞ মহাপণ্ডিতকে তৎকালীন পণ্ডিত সমাজে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল, এমন কি সমাজে কিছুদিন 'এক ঘরে' হইয়া থাকিতেও হইয়াছিল। তাহার ফলে বিগত ২৫ বৎসরে দৃশ্যপট কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে।

"কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া"? (গীতা ১৬।১৫) এইরূপ অহঙ্কারে যথেচ্ছাচারী হইয়া শাস্ত্র সদাচার যুক্তি মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আমরা কিছুই মানিতেছি না। 'অচ্ছুৎ' বলিয়া মানুষকে পশুর অধম মনে করিতেছি।

শাস্ত্রকে আজ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। শাস্ত্র অর্থে শুধু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'নানা মুনির নানা মত' সংবলিত কয়েকখানি গ্রন্থ মাত্র নহে। 'বেদয়তীতি বেদঃ'—যাহা কিছু জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ, স্বাস্থ্য, নীতি, সমাজ, সংবিধান ব্যবহার বিধি বিষয়ক সামাজিক কল্যাণ ও হিতৈষণামূলক গ্রন্থ—যাহা 'প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্' (গীতা ৯।২)—যাহার দ্বারা আমরা সৎ পথের, এবং অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের নির্দেশ পাই এবং স্বকর্তব্য স্থির করিতে পারি তাহাই শাস্ত্র।

ফলিত জ্যোতিষ বা astrology। গত পঁচিশ বৎসরে আমাদের astronomy বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান যে পরিমাণে বাড়িয়াছে ফলিত জ্যোতিষের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার কিন্তু সে পরিমাণে কমিতেছে না। সকলের বোঝা প্রয়োজন যে অসীম অনন্ত অসংখ্য আলোক বৎসর ব্যাপী মহাকাশে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু ছায়াপথের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী, সবই পরমেশ্বরের দেশ কাল পরিমাপক মাত্রামান ঘড়ির চাকা মাত্র। তাহাদের সাধ্য নাই স্বাধীনতাও নাই যে তাহারা উদয়াস্তের গতিপথে কোথাও একটু ছন্দ ভঙ্গ করে বা স্বীয় গতিবেগে কখনও কিছু দ্রুত চলে বা আস্তে চলে।

উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে হাঁচি টিকটিকি অশ্লেষা মঘা ত্র্যহস্পর্শ বারবেলা কালবেলা অরিষ্ট যোগ দিকশূল, পশ্চিমে যোগিনী আর উত্তরে ডাকিনী প্রভৃতি পেশাদারী পঞ্জিকার বিধি বিধান মানিয়া লইয়া স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় সমগ্র দেশটাকে আমরা 'পাগলা গারদে' পরিণত করিয়া ফেলিয়াছি। 'কিসে কি হয় বলা যায় না' এইরূপ সন্দেহ সংশয় ত্যাগ করিয়া 'জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়' (গীতা ৪.৪২) হইয়া সকলে আপন আপন কুসংস্কার দূর করুন। সমগ্র জাতিটাই অদ্যাপি খঞ্জ ও পঙ্গুর মতো খোঁড়াইয়া ল্যাংচাইয়া কোনোক্রমে হাঁটিতেছে মাত্র। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে গত মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক কোষ্ঠী দেখিয়া মরে নাই এবং মরিয়া 'ত্রিপাদ দোষ' পায় নাই। অর্ধমৃত বিধ্বস্ত জাপান আজ সম্পূর্ণ সুস্থ স্বস্থ ও বলিষ্ঠ হইয়া জগতের প্রথম শ্রেণীর জাতিদের সহিত 'পাল্লা' দিয়া চলিতেছে। কিন্তু হায়! তবুও আজ, কবি হেমচন্দ্রের ভাষায়, 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।' যদিও ভারতের আরণ্যকেই ঋষির মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল প্রথম,—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—এবং 'চরৈবেতি'র উদ্দীপনাময়ী বাণী।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে? ফলিত জ্যোতিষের কুসংস্কার আজও আমাদের দেশের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রগুলি নিত্য নিয়মিতভাবে প্রচার করিয়া চলিয়াছেন। ফলিত জ্যোতিষের কোষ্ঠী ফল সপ্তাহ ফল বর্ষফল জীবনের ফাঁড়া অরিষ্ট যোগ ও পরমায়ু নির্ণয় এক অত্যন্ত অনিষ্টকর অন্ধ কুসংস্কার। যোটক বিচারের দায়ে বহু সুনির্বাচিত বিবাহ-প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। ব্যর্থ প্রেমের ফলে বহু যুবক যুবতীর জীবন অতি অসঙ্গত কারণে নষ্ট হইতেছে। যখন দেশ স্বাধীন ছিল, জাতি বলিষ্ঠ ছিল তখন বীর্যশুল্কে ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতির দ্বারা বিবাহ হইত। মাল্য বিনিময়ের দ্বারা,—অথবা কন্যা স্বয়ম্বরা হইয়া স্বয়ং বরের কণ্ঠে মাল্যদান করিয়াও বিবাহ হইত—কোষ্ঠী বিচারের দ্বারা নহে।

এই কুসংস্কার প্রচার পূর্বক সমগ্র জাতিকে বিড়ম্বিত করিবার জন্য অধিকাংশ সংবাদ পত্রই দায়ী।

পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে আজ আইন করিয়া ভ্রূণ হত্যা চালানো হইতেছে। ইহা নীতি-বিরুদ্ধ ধর্ম-বিরুদ্ধ বর্বরতা বা পাশবিকতার পরিচয়। 'ভ্রূণ'কে হত্যা করিয়া যদি সমাজে অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতির সুবিধা হয়, তাহা হইলে সেই সুবিধাবাদের জন্য নরহত্যা নারীহত্যাই বা আইন বহির্ভূত হইবে কেন? নিরপেক্ষ বিচার ও বিশ্লেষণ অভাবে আজ আমরা অধঃপাতের পথে চলিয়াছি। এ বিষয়ে দেশের সরকার দায়ী, ততোধিক দায়ী দেশের চিকিৎসক সমাজ—তাঁহারা অর্থের লোভে চরক সুশ্রুত হিপোক্র্যাটিস্ প্রমুখ ঋষি ও মনীষীদের প্রণীত চিকিৎসা নীতির অবমাননা করিয়া আত্মবিক্রয় করিতেছেন।

গোরক্ষা ও পিঁজরাপোল। বন্যায় এবং বন্যার পর গোমড়কে অসংখ্য গবাদি পশু মারা গিয়াছে। অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও অবিলম্বে সংবিধান মতে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে আমাদের সরকারের গোহত্যা বন্ধের জন্য আইন প্রণয়ন করা কর্তব্য ছিল, তাহা অদ্যাপি করা হয় নাই। মাতৃদুগ্ধের চেয়েও আমরা গোদুগ্ধ অধিক পান করিয়া থাকি তাই ভারতীয় ঐতিহ্যে গাভীকে 'গোমাতা' বলা হয়। গরুর ক্ষুর হইতে শৃঙ্গ এমন কি মলমূত্র পর্যন্ত সমস্তই আমাদের প্রয়োজনে লাগে। নিঃসহায় জরাতুর বৃদ্ধবৃদ্ধা নরনারীর জন্য যেমন আতুরাশ্রম প্রয়োজন,—গরু-মহিষের জন্যও তেমনি পিঁজরাপোল প্রয়োজন।

সেকিউলার (secular) সংবিধান। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন secular শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'—তাহার পর হইতে ভ্রূণহত্যা অথবা গো-হত্যা ও রাজনৈতিক দলাদলির ফলে যেরূপ বেপরোয়া নরহত্যা চলিতেছে তাহাতে secular অর্থে 'ধর্মহীনতা'ই দাঁড়াইয়া গিয়াছে!

শিক্ষাক্ষেত্র। প্রাথমিক মাধ্যমিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিবিধ প্রযুক্তি-বিদ্যালয়—সর্বত্রই নৈরাজ্য। সংঘর্ষ ঘেরাও ভাঙচুর দলাদলি গণ-টোকাটুকি রূপ পরীক্ষা প্রহসন, পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব, শিক্ষক নিয়োগে পক্ষপাত প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিধির সম্মান ও মাত্রা মানকে গত ২৫ বৎসরে উত্তরোত্তর অবনমিত করিতেছে। সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক শিক্ষাক্ষেত্র আজ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। গোষ্ঠীগত চক্রান্তের দূষিত বাষ্পে সেখানকার আবহাওয়া বিষাইয়া উঠিয়াছে। বহুসংখ্যক উচ্চপদ খালি পড়িয়া রহিয়াছে অথচ বিশিষ্ট গুণবান ছাত্রগণ বিদেশে গিয়া চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান দেখা যাইতেছে। ইঙ্গ বঙ্গ মাতৃভাষা দেবভাষা সবই অবহেলিত হইতেছে।

উন্নতি ও অগ্রগতি। আমি প্রথমেই আমাদের দোষ দুর্বলতা স্বৈরাচার সুবিধাবাদ দুর্নীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি কারণ জাতির উন্নতির জন্য তাহাই প্রয়োজন। এবার উন্নতির কথা বলিব। বিজ্ঞান, আণবিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, চিকিৎসা বিশেষতঃ শল্য চিকিৎসাবিদ্যা (surgery), কৃষি ও সার বিজ্ঞান শিল্পজাত দ্রব্য সম্ভারের বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, দেশের সর্বত্র সড়ক সেতু নির্মাণ, ইঞ্জিন বিমান ও বাষ্পপোত নির্মাণ, সামরিক শিক্ষা ও সরঞ্জাম বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভাগে আমাদের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। গড় পরমায়ু বৃদ্ধি পাইয়াছে, বসন্ত কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যাধি দেশ হইতে দূর হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহা আমাদের আত্মতৃপ্তির কারণ হইতেছে না—যতদিন না দেশের মানুষের মনুষ্যত্বের মান উন্নীত হয়, মানুষ সচ্চরিত্র ও সুনীতি পরায়ণ হয় এবং দেশের অগ্রগতির গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। ধনীরা ধনবত্তর হইলেও দরিদ্রেরা অধিকতর দরিদ্র হয় নাই, যদিও সামগ্রিক হিসাবে আমরা এখনও দরিদ্র জাতির মধ্যেই গণিত,—কারণ এখনও দেশের অসংখ্য নরনারী দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, অনাহারে অচিকিৎসায় মারা যায়, বর্ষায় ভাসিয়া যায়,

শীতের শৈত্যে ও গ্রীষ্মের তাপে প্রাণ হারায়। আমাদের পরিমিতি জ্ঞান আজও হয় নাই। আমরা কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করিয়া জনগণের উপর অযথা কর-ভার চাপাইতেছি। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহস্থের সংসার যাত্রা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। মদ্যপান-নিবারণের প্রতিশ্রুতি সত্বেও মহানগরীগুলিতে মদ্যের বন্যা বহিতেছে। সার্বজনীন পূজায়, পূজা সর্বজনীন হইয়াছে এবং সকল সন্তানকে মাতৃপূজার মণ্ডপে আনিয়া মিলাইতেছে সত্য,—কিন্তু পূজার হুল্লোড়ে মাতৃভক্তি সাধনা আরাধনার ভাবমূর্তি মলিন হইতেছে। নৃত্যের নামে বেহায়া 'বেলেল্লাপনা ও গীতের নামে মাইকে কুৎসিত গানের বীভৎস চিৎকার, পল্লীর শান্তি ও ভক্তচিত্তের ভক্তি দুইই বিনষ্ট করিতেছে।

সামাজিক ব্যবহার। সাজসজ্জায় বিদেশী প্রভাব যথাপূর্ব প্রতিষ্ঠা পাইতেছে। প্রসাধনে বিলাস সামগ্রীতে স্বদেশী দ্রব্য অপেক্ষা বিদেশী দ্রব্য অধিক আদর পাইতেছে—ফলে স্বদেশী শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না। দেশের বেকার সমস্যাও ক্রমশঃ সমাধানের অতীত হইয়া পড়িতেছে। সমাজের উচ্চতন শ্রেণীর 'বাবু সাহেবদের'—এই সদ্য-স্বাধীন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অদ্যাপি 'কণ্ঠ বন্ধনী' পরিতে দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা দীর্ঘকালের দাসত্ব স্মরণ করিয়া এখনও গৌরব বোধ করিতেছেন। বিদায়ের কালে 'টা-টা বাই-বাই' বলিয়া এবং তাঁহাদের শিশুদেরও বলিতে শিখাইয়া,—এখনও ধন্য বোধ করিতেছেন। প্রমোদ উদ্যানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় না করিয়া তাঁহারা সর্বাগ্রে দরিদ্রের ভরণ পোষণে এবং চিকিৎসা ও শিক্ষাদানে দৃষ্টিপাত করুন।

প্রতীকার কি। যে ধর্মকে আমরা মূঢ়তাবশতঃ কদর্থ করিয়া সংবিধান হইতে বিদায় দিয়াছি-সেই ধর্মকেই সংবিধানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করা। কোনো বিশেষ ধর্মকে নহে—সকল ধর্মকেই সমান সম্মান দিতে হইবে নিরপেক্ষ ভাবে। যে অর্থে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন secular শব্দটিকে গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন সেই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। এ-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি—

'In India Religious life forms the centre—the key-note of the whole music of national life...Social Reform...and Politics have to be preached through the vitality of religion. India is a Ganges of spirituality. What then is the spirit of

India? That eternal grand idea of the spiritual oneness of of the whole Universe,—the only infinite reality that exists in you and me and in all—in the self and in the soul.'

সে দিনও চম্বল প্রদেশের শক্তিশালী দস্যুগণ—ধর্মের প্রভাবে বিবেকের বশবর্তী হইয়া অনুশোচনায় আত্মসমর্পণ করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড গ্রহণ করিয়াছে।

'যতো ধর্ম স্ততো জয়:'—বলিয়া এখানেই ছেদ টানিতেছি।

সাহিত্যতীর্থ রজত জয়ন্তী বর্ষ স্মরণিকা ১৩৮৫ হইতে।

নটরাজ শিশিরকুমার

আমি তখন নিজগ্রাম উথরায় (অণ্ডালের নিকট) চিকিৎসা করি। সেখানে ১৯২০ সালের ২৬ নভেম্বর বন্ধুবর কবি ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় একটি টেলিগ্রাম পেলেন, কলিকাতা হইতে সুধাদা' (সুধাংশু ভূষণ মুখোপাধ্যায়) জানিয়েছেন—শিশিরদা'সহ তিনি উখরায় আসছেন।

নির্ধারিত দিনে শিশিরদা' ও সুধাদা' এলেন। সুধাদা' ও ধরণীর মধ্যে ছিল ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব এবং সুধাদা' ও শিশিরদা'র মধ্যেও ছিল একান্ত একাত্মতা। বন্ধুত্বের এই স্বতঃসিদ্ধ সূত্র অনুসারেই আমারও বন্ধুত্ব হয় সুধাদা' ও শিশিরদা'র সঙ্গে। এই দলের মধ্যে কনিষ্ঠতম এবং সকলেরই অনুজপ্রতিম প্রীতিভাজন শ্রীমান শৈলবিহারী সিংহ উথরা এস্টেট জমিন্দারিজ লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন।

অতঃপর এই সুদূরের পিয়াসীর দল উথরায় কয়েকদিন ক্রমাগত রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তি, খণ্ড খণ্ড অভিনয় ও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভৃতিতে নিরবুচ্ছিন্ন ভাবে যাপন করেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শিশিরদা'র আবৃত্তি শুনি। পরে একদিন সকলে মিলে মোটরে পানাগড়ে শৈলবিহারীদের শালবন 'চক গোপালে' যাওয়া হয়। সেখানে চারিদিক খোলা খড়ের ছাউনি দেওয়া কাছারি বাড়িতে সমস্ত দিন এবং রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত শিকার, বনভোজন ও মজলিসি আনন্দে কাটে।

তখন শিশিরদা'র বয়স ৩০।৩১ বৎসর, তিনি মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশনে পূর্ণ উদ্যমে ইংরাজির অধ্যাপনা করছেন। স্বশক্তিতে আস্থাবান হলেও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে তখনও যেন কুয়াসাচ্ছন্ন ভাব। কয়েকদিন মজলিসের পর একটু শান্ত পরিবেশ পাওয়া গেলে প্রধান আলোচনার বিষয় হয়—শিশিরদা'র ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে। তিনি যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিরত থেকে প্রাচীনপন্থী আচার্য ধর্ম পালন করবেন না, এ বিষয়ে আমাদের সকলের মধ্যেই ঐকতান বেজে উঠলো।

শিশিরদা'র মনের অবস্থা তখনো—"যাবো কি যাবো না, মিছে এ ভাবনা মিছে মরি লোকলাজে" রূপ,—প্রথম অভিসারিকার মত,—'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি',—এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে মনটা ছটফট কচ্ছে। নিত্যই তাঁর মনের

সংকল্প-বিকল্পের দোলায় আমরা সকলে মিলেই দোল খেতে লাগলাম। সমস্যাটির একপ্রান্তে হ'ল,—কলেজে প্রতিষ্ঠিত থেকে মধ্যে মধ্যে এমেচার অভিনয় করে গতানুগতিক জীবন যাপন করা, আর অপর প্রান্তে হ'ল—সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে নাট্যশিল্পে আত্মনিয়োগ বা আত্মসমর্পণ করা। শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধানে

"The desire of the moth for the star
Of the night for the morrow,
The devotion of something afar
From the sphere of our sorrow."

—Shelley

এই দিব্য ভাবটিই জয়ী হল—অর্থাৎ সুদূরের পিয়াসী দলের সুদূরের পিপাসাই চরিতার্থ হল। সকলে মিলে শিশিরদা' ও সুধাদা'-কে অণ্ডালে ট্রেন ধরিয়ে দেওয়া হল। ট্রেন ছাড়লে শিশিরদা' রুমাল নেড়ে তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত জানালেন—'স্টেজ'।

এর পর কলিকাতায় ফিরে গিয়ে কয়েক মাস পরেই তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করে জে. এফ. ম্যাডানের রঙ্গালয়ে যোগ দেন,—সে ইতিহাস সকলেই জানেন। (শ্রীমণি বাগচি লিখিত শিশিরকুমারের জীবনীতে আমার লিখিত অংশ হইতে সঙ্কলিত)